টমাস বাটার আত্মজীবনী

জান বাওোস কৃত ইংরেজী হইতে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক অনূলিখিত

আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কে-টি, ডি-এস্‌ সি

লিখিত ভূমিকা সংবলিত



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য : চার টাকা

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

টমাস বাটা পৃথিবীর প্রধান শিল্পপতিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অসামান্য কর্মপ্রতিভা, অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সবল আদর্শনিষ্ঠার জোরে নগণ্য এক চর্মব্যবসায়ীর পুত্র আজ সমগ্র পৃথিবীতে যে সৌভাগ্য ও যশের অধিকারী হইয়াছেন তাহার সম্যক আলোচনা বিশেষ করিয়া এই অভিশপ্ত বাংলা দেশে হওয়া প্রয়োজন। টমাস বাটা যে আত্মচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবুও যতটুকু তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন তথ্যবহুল অন্য দিকে তেমনই মনোরম। বাটার আত্মজীবনীর ইংরাজী অনুবাদ *How I Began* পড়িতে পড়িতে বারংবার আমার এই কথাই মনে হইয়াছে বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ কেন হয় না, বাঙ্গালী কেন নিজের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া এই অদ্ভুত মণীষীর কর্মপ্রতিভার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায় না?

আজ এই দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় টমাস বাটার আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ শেষ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বাংলা দেশের পাঠক সমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে কোন ভূমিকা লেখার প্রয়োজন নাই। আবার টমাস বাটার জীবনীর সহিত যথেষ্ট পরিচয় না থাকিলেও বাংলা দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁহার নাম জানে। এক্ষেত্রে বাটার জীবনী জানিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতে যে বিশেষ কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করার প্রয়োজন আছে ইহাও মনে করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলা দেশের সকলেই, বিশেষ করিয়া যুব সমাজ এই পুস্তক আগ্রহ সহকারেই পাঠ করিবেন।

টমাস বাটা কর্মজীবনের প্রারম্ভেই স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়া তুলিতে তিনি আপ্রাণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং সে সাধনায় শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। বাটার জীবনী পাঠ করিয়া মাত্র এইটুকুই লক্ষ্য করিলেই চলিবে না। ইহার বাহিরেও অনেক কিছুই লক্ষ্য করিবার মত রহিয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে টমাস বাটা পিতার কারখানায় শিক্ষানবিশী শেষ করিয়া আপনার নিজের ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে সংকল্প করেন। তার পর হইতেই অসামান্য দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার পথ চলিতে হইয়াছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তাঁহার আদর্শকে ম্লান হইতে দেন নাই। ধোঁয়াটে আদর্শবাদ সম্বল করিয়া কতকগুলি চোখা চোখা বাঁধাবুলি আওড়াইয়াই তিনি কর্তব্য শেষ করিতে চান নাই এবং তাহা চান নাই বলিয়াই তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বাটা কোন দিন দুঃখ ও বাধাকে ভয় করেন নাই। দুঃখ ও বাধাকে জয় করিয়া চলাই ছিল তাঁহার সহজাত প্রেরণা। এই প্রেরণার পশ্চাতে তাঁহার এই বিশ্বাস চিরকালই বলবৎ ছিল যে "Bigger the impediments and difficulties, greater are the opportunities for men of strong hearts" অর্থাৎ বাধাবিপত্তি যতই প্রচণ্ড হইবে, শক্তিমানের কাজ করিবার ততই সুযোগ আসিবে।

বাটা শিল্পপতিগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেও তাঁহার জীবনযাত্রায় কোনদিন অনাবশ্যক আড়ম্বর প্রকাশ পায় নাই, অথবা পুঁজিবাদের ছোঁয়াচে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য কলঙ্কিত হয়

নাই। এ সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবনীতে ইহাই লিখিয়া গিয়াছেন যে:—"Capitalist Society as now constituted was regarded by me as fit for bad people only, such as exploiters at one end and sluggards at the other I kept on dreaming about the simple life as preached by Tolstoi" অর্থাৎ 'পুঁজিবাদী সমাজ আজ যে ভাবে গঠিত তাতে আমি মনে করি উহা বদ লোকের একটা আড্ডা হওয়ারই যোগ্য এর একদিকে অপহারক আর অন্য দিকে অপদার্থের দল। টলষ্টয় যে সরল জীবনযাত্রা প্রণালীর কথা বলিয়া গিয়াছেন আমি সেই জীবনযাপন প্রণালীর স্বপ্নই ক্রমাগত দেখিতাম।"

টমাস বাটার জীবনী ও কার্যকলাপ সমগ্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই তাঁহার দৃষ্টি ভঙ্গীর নূতনত্ব লক্ষ্য করিবেন।

আধুনিক জগতে যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প লইয়া একটা গুরুতর সমস্যা ক্রমশঃই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গতিবেগ ও প্রয়োজনের দিক হইতে বর্তমান সমাজ যন্ত্রকে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিবে না ইহা নিশ্চিত কিন্তু অন্যদিকে যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কুটিরশিল্পও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে বহুলোক বেকার হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতেছে। যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ পুঁজিবাদীগণের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় এই যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বেকার হইয়া যাইতেছে ইহার প্রতিকার কি ভাবে হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিত্ত আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে নিত্য নূতন নূতন ইজম এর আবির্ভাব ঘটিতেছে কিন্তু সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান মিলিতেছে না। এলা বাহুল্য বাটার ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এই সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি আপন কারখানায় একটি নূতন পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি কারখানার প্রত্যেকটি unitকে এক একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন। এই সকল unit এর কর্মিগণ প্রথমতঃ অন্য unit হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ কাজ করেন তারপর তাহাদের তৈরী মাল নির্ধারিত unit এ যোগ্যমূল্যে বিক্রয় করেন। ইহার ফলে প্রত্যেকটি unit স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিতে ও লাভ করিতে পারে। সমষ্টিগত ভাবে বাটার কারখানাকে ধরা যাইতে পারে একই ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কুটিরশিল্পের যৌথ প্রতিষ্ঠান যাহা finished product বাজারে বিক্রয় করে। দেশের সমস্ত কুটিরশিল্প যদি এই পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে পারা যাইত তাহা হইলে হয়ত অন্ততঃ যাহারা কুটিরশিল্পগুলির উপর জীবনধারণের জন্য নির্ভরশীল তাহাদের অনেকখানি উপকার হইত। এই দিক হইতে গোটা সমস্যাটা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অধিক উদাহরণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। টমাস বাটার আত্মজীবনী যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে বড় বড় সমস্যার সহজ সমাধান, অন্ততঃপক্ষে নিরুদ্বেগে কাজ চলিবার মত সমাধান করিয়া লইয়া সুকৌশলে আগাইয়া যাইতে না পারিলে কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য না থাকিলে সাফল্য কোনদিন করতলগত হইতে পারে না।

আমি আশা করি বাংলা দেশের পাঠক সমাজে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট সমাদর পাইবে এবং বাংলা দেশের যুবকগণ ইহা হইতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রেরণা লাভ করিবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়



জন্ম—৩-৪-১৮৭৬]　　　　টমাস বাটা　　　　[মৃত্যু—১২-৭-১৯৩২

আমার শৈশব

যতদূর আমার স্মরণ হয় আমার প্রথম শিক্ষা প্রার্থনা আবৃত্তি করা। আমার শৈশবাবস্থাতেই আমার ধর্মপরায়ণা মাতা রোমান ক্যাথলিক ধর্মানুযায়ী প্রার্থনা আমাকে মুখস্থ করান। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই তাঁদের সামনে আমাকে আমার বিদ্যা জাহির করতে হ'ত এবং প্রায়ই একটি পেনি দ্বারা তাঁরা আমায় পুরস্কৃত করতেন।

ছ'বছর বয়সে আমি চামড়ার অকেজো টুকরো টাকরা জোড়াতালি দিয়ে জুতো তৈরি করতাম তাদের ছাঁচগুলির পরিকল্পনাও আমি নিজেই করতাম। অবশ্য এই সব টুকরো দিয়ে মানুষের বুড়ো আঙুলের চেয়ে বড় জুতো তৈরি করা সম্ভব ছিল না কিন্তু তা সত্যিকার জুতোর মতই হ'ত। আমার মত শিশুর হাতের কাজ বলেই সেগুলির চাহিদাও ছিল মন্দ নয়। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই ধরণের এক জোড়া জুতো তৈরি হ'তে পারত। চার থেকে দশ ক্রিউজার ছিল এর মূল্য। মজুরি হিসেবে নিতান্ত নগণ্য নয় কারণ চার ক্রিউজার সে সময়ে বিলিতি পেনির সমান বড় মুদ্রা ছিল অবিমিশ্র তামার তৈরী। দশ ক্রিউজার ছিল বিলিতি ছ' পেনির সমান আকারের একটি রৌপ্য মুদ্রা।

ইস্টারের সময় আমরা একটা মজার খেলা করতাম। সব ছেলে এক জায়গায় জড় হয়ে খেলাটা সুরু করে দেওয়া হ'ত ছেলেদের ভেতর থেকে একজনকে করা হ'ত সর্দার। খেলার মাঠে দেরিতে পৌঁছালে জরিমানা দেওয়ার নিয়ম ছিল। জরিমানা এড়াবার জন্যে আমি আর আমার ভাই রাত চারটের সময় উঠে খেলার মাঠে যেতাম। তবুও দেখতাম আমাদের আগে প্রায় সব ছেলেই সেখানে জড় হয়েছে। অতএব আমাদের জরিমানা দিতেই হ'ত।

জরিমানার টাকা এক জায়গায় জড় করে আমাদের মধ্যেই সেটা ভাগ হ'ত। আমি কত টাকা জরিমানা উঠল এবং সে হিসেবে প্রত্যেক ছেলের ভাগে কত পড়া উচিত তার একটা হিসেব রাখতাম। কিন্তু সর্দার ও ক্যাশিয়ারের হিসেবের সঙ্গে তার মিল হ'ত না। আমার হিসেব অনুযায়ী যার যেটা ন্যায্য পাওনা তারা প্রকৃত পক্ষে পেত তার অর্ধেক। মানুষের এই অবিচারে আমার মনে যে ক্রোধ, বিরক্তি ও চাঞ্চল্যের আলোড়ন তুললো তা অসীম এবং আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ যুবক বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তখনি আমার পিতাকে সব খুলে বলে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তিনি আমায় বললেন জগতের নিয়মই এই। এ নিয়ে তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবেন না, এবং আমার যে ক্ষতি হয়েছে তিনি নিজের পকেট থেকেই সেটা দিয়ে দেবেন।

এই সময় থেকে আমি সাপ্তাহিক মেলায় যেতে সুরু করেছি, বাবার সঙ্গে। বাবার খরিদ্দারদের জুতো পরানো, জুতো খোলা প্রভৃতি কাজ করে দিতাম তারা আমায় কিছু কিছু বখশিস দিত, সে বখশিসের অঙ্ক শূন্য থেকে আরম্ভ করে এক পেনি পর্যন্ত এক একবার জমিয়েছি। ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমার এ আয় জমিয়ে রাখতাম। পাঁচ ক্রিউজারের ডাক টিকিট কিনে একটা কার্ডে আঠা দিয়ে এঁটে রাখতে হ'ত। দশটা স্ট্যাম্প আঁটা কার্ড পোস্টমাস্টারকে দিলে টাকাটা যার কার্ড তার নামে জমা হয়ে যেত।

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমার মা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মা যে যত্নে আমাদের লালন পালন করে এসেছিলেন, তার অবসান ঘটলো। এই সময় জিল্‌ন্ ছেড়ে আমরা নিকটবর্তী আর একটি সহরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করি।

আমার বাবা আজন্ম দুঃসাহসী ও নতুন কিছু করবার চেষ্টায় উন্মুখ ছিলেন। দুঃসাহসের যে কোনো কাজ তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত, কিন্তু তিনি কোন কাজে বেশি দিন লেগে থাকতে পারতেন না। একবার কোন কাজে বাধা পেলেই সেটা ছেড়ে আবার নতুনের পেছনে ধাওয়া করতেন।

বাবা নিজে ধূমপান করতেন এবং নিকটবর্তী একটা মদের দোকানে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে সন্ধ্যাবেলা আড্ডা দিতেন বটে (কারণ তখন এটা করা পৌরুষের লক্ষণ বলে বিবেচিত হ'ত), কিন্তু আমাদের কখনো এসব করতে তিনি উৎসাহ দিতেন না।

মৌখিক উপদেশ অনেক সময় মানুষের দুর্দান্ত রিপুসমূহকে বশীভূত রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয় বাবা খুব ভাল করেই এটা জানতেন এবং পরিশ্রম ও উৎসাহের দ্বারা নব নব কর্মপথে আমাদের মনকে চালিত করতে সর্বদাই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমে তিনি আমাদিগকে অর্থ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দিতেন—তারপর আমাদের অর্জিত অর্থ আমাদেরই যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করতেন। সে টাকা নিজে আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তি মনে জাগলেও তিনি দমন করতেন এবং সঞ্চিত অর্থ সম্বন্ধে সাবধান হতে শিক্ষা দিতেন।

আমার ও আমার ভ্রাতার জীবন বাবার ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোতঃ ভাবে জড়িত ছিল আমাদের বাল্যাবস্থায়। বাবার ব্যবসা যদি ভাল চলত, আমরা ভাল খেতে পেতাম যদি না চলত আধপেটা খেয়ে থাকতে হ'ত—উপায় ছিল না।

বারো বছর বয়সে আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের অনাহার থেকে বাঁচবার প্রকৃত পথ কি। চৌদ্দ বছর বয়সে বাবার ব্যবসার বিক্রীর দিকটার ভার আমার হাতে পড়ল তখন থেকে অন্নসংস্থান সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো উদ্বেগ রইল না।

জিল্‌নে থাকবার সময় আমি স্কুলে চার বছর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করি। কিন্তু যখন আমরা জিল্‌ন্ ছেড়ে নিকটবর্তী অন্য এক সহরে উঠে গেলাম, সেখানে আমি একটি জার্মান মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে ভর্তি হই, কারণ অন্য স্কুল সে সহরে ছিল না। কোন ছাত্রই জার্মান ভাষা ভাল জানত না-আমি তো একেবারে না। জিল্‌ন্ স্কুলে আমাদের চেক্ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এদিকে এই সময় আমার বাবা ফলের বাগান ইজারা নিয়ে ফলের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সুতরাং ফলের বাগান চৌকি দিতে গিয়ে আমার প্রায়ই স্কুল কামাই হ'তে লাগল।

প্রথম দু'মাস স্কুলে যেতে না পারার দরুন, পরবর্তী সময়ে স্কুলের পড়ায় আমি তেমন সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। আমার ভাই আন্তোনিন লেখাপড়াতে বেশ ভাল হয়ে উঠলো। আমি এখানে তো কিছু শিখলামই না, বরং জিল্‌ন্ স্কুল থেকে যা কিছু শিখে এসেছিলাম, তাও গেলাম ভুলে।

ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর দিকে বাবার যে ঝোঁক ছিল না তা নয়, কিন্তু বাবার ব্যবসায় আমাদের সর্বদা সাহায্য করতে হ'ত বলে স্কুলে নিয়মমত আমাদের যাওয়া ঘটত না। আমাদের বাড়িতে না ছিল বা না আসতো একখানা খবরের কাগজ। ছাপার অক্ষরের পুঁথির ভেতরে ছিল কেবল একখানা ক্যালেণ্ডার, তাতে পল্লীগ্রামে কখন কোন মেলা বসবে, তার তারিখ ছাপা ছিল।

জেদ করে অল্প বয়সে আমি স্কুল ছেড়ে বাবার জুতোর কারখানায় শিক্ষানবিশি করতে আরম্ভ করি।

এই সময় আমি একখানি বইয়ের সন্ধান পাই, যাতে আমাদের বাড়ির যে পাঁজির কথা বলছিলাম, তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জিনিস আছে।

আমাদের দোকানের অন্যতম ভৃত্য সিরোকার ছেলে একখানা বই নিয়ে এল। বইখানার নাম 'সচিত্র চেক্ জাতির ইতিহাস.' জিল্‌নের কোনো স্কুল থেকে সে প্রাইজ পেয়েছিল বইখানা। বইখানা পড়তে আরম্ভ করলাম কিন্তু বড় শক্ত বলে মনে হ'ল প্রথম প্রথম। জিল্‌ন্ স্কুলে আমি প্রাইমারী জাতীয় বই পড়তাম চেক্ ভাষায়, হ্যাদিস্ত্ স্কুলে পড়ানো হ'ত জার্মান ভাষা। সুতরাং ভাষা শিক্ষা আমার অদৃষ্টে ঘটেনি কখন ভালভাবে—তার ওপর এ বইয়ের ভাষা ছিল সাহিত্যের ভাষা আমাদের অঞ্চলে সে ভাষার চলন ছিল খুব কম।

বইখানা আমাকে মুগ্ধ করলে। তার জ্বালাময়ী ভাষা ক্রমে আমি বুঝতে পারছিলাম। এ ধরণের ভাষায় আমার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি এ পর্যন্ত। এই প্রথম এমন একটি লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো যে পরে আমাকে সত্যিকার কিছু বলতে চেয়েছে এবং আমি যাতে তার কথার অর্থ বুঝতে পারি, সে সম্বন্ধেও সচেষ্ট। যখন লেখক তাঁর অনবদ্য ভাষায় জাতীয়তা ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করবেন, আমায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, তখন তিনি যেন আমাকে বিদ্যাবুদ্ধিতে সমকক্ষ বলে ধরে নিয়েচেন।

বই পড়তে পড়তে কখনো কাঁদলাম, কখনও হাসলাম। জলযোগের ছুটিতে আমি যখন নিকটবর্তী মাঠে বইখানা নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তাম, তখন আমার চারিপাশে ক্রীড়ারত আমার ভ্রাতা এবং দোকানের অপর ভৃত্যটির অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যেতাম।

বই পড়তে যতই ভালবাসি, জীবনের যুদ্ধে তৈরি হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান আমি সংগ্রহ করতাম বাবার ব্যবসায়ে লেগে থেকে। যখন বাবা দেখলেন পল্লীগ্রামের মেলায় এবং নিকটবর্তী সহরগুলিতে কেনা-বেচার কার্যে আমি বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছি, তখন তিনি তাঁর কারখানা বাড়াতে সুরু করলেন। আমাদের সংসারের অবস্থা এখন থেকে বেশ সচ্ছল হয়ে উঠলো, দু' পয়সা আয়ও হতে লাগলো।

ভিয়েনার একটি আড়ত থেকে বাবা আমাদের কারখানার জন্যে চামড়া ইত্যাদি খরিদ করতেন এবং জিনিসের দাম শোধ করতেন হুণ্ডিদ্বারা। এ থেকে যা লাভ হ'ত তা ফ্লোরিন নামক রৌপ্য মুদ্রার আকারে একটা ব্যাঙ্কে রেখে দিতেন।

আমার কাজ যখন বেশ ভালভাবে চলেছে, তখন আমার মনে হ'ল আমার কর্মক্ষমতার আসলে দোকানের কর্মচারী বা বাবা কেউ সুবিচার করবেন না। দোকানের কর্মচারীরা তখনও আমাকে ঘুসিটা কিলটা দিতে ছাড়ে না বা আমার বাবাও আমার মূল্য ঠিক বোঝেন না। তখনি ঠিক করে ফেললাম আমি এখান থেকে চলে গিয়ে অন্যত্র নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করব।

মাতার মৃত্যুকালে তিনি দুশো ফ্লোরিন আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি সেটা বাবার কাছে চাইলাম-বাবা সেটা আমাদের সাংসারিক অনটনের সময় 'অনাথ ভাণ্ডার' থেকে নিজের খরচের জন্যে তুলে নিয়ে খরচ করে ফেলেছিলেন। আমার বাবা সে টাকা এখন দিতে চাইলেন না এবং তাঁর পক্ষে নিজের মত কাজই হয়েছিল। আমি কপর্দকশূন্য অবস্থায় ভিয়েনা সহরে পৌছলাম, আমার বোন আনা সেখানে লোকের বাড়িতে দাসীর কাজ করত। আনা আমার সামান্য কিছু সাহায্য করলে এবং পনেরো বৎসরের তারুণ্যের সজীব উৎসাহ-উত্তেজনা নিয়ে আমি নিজেই তখন এক ব্যবসা খুলে বসলাম সেখানে। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ির এক অংশে খুললাম, ভিয়েনার উপকণ্ঠে ডিবলিং নামে জায়গায়।

প্রথম প্রথম আমি 'মিকাডো' নামে এক ধরণের চটিজুতো তৈরি করে বেচতে আরম্ভ করি—কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। বাবাই প্রথমে এ ধরণের চটিজুতো প্রথম তৈরি করতে আরম্ভ করেন এবং এ ধরণের জুতোর ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট উচ্চ ধারণা ছিল—কিন্তু বাবার অভিজ্ঞতা এ কাজে বেশি দূরে অগ্রসর হয় নি। আমি বাবার উচ্চাশা এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই নিয়ে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হলাম। তার চেয়েও খারাপ, আমি ব্যবসাতে নেমে গোড়াতেই ভুল করে বসলাম এই যে, তৈরি মাল কাটাবার চেষ্টা না করে আমি পুঁজির সবটা মাল তৈরির কাজেই ব্যয় করতে প্রবৃত্ত হলাম। ফলে দোকানের তৈরি মাল স্তূপাকার হয়ে জমতে লাগলো, এদিকে বিক্রী নেই।

প্রথম অসুবিধা, আমি দেশের ভাষা জানতাম না, বাজারে কি জিনিস দরকার তার খোঁজও রাখতাম না। বাজারের চাহিদা না বুঝে মাল তৈরি করার ফলে মাল তৈরি হলেও অবিক্রীত রইল। পুঁজিও দিন দিন এল ফুরিয়ে।

সৌভাগ্যের বিষয় এ সময় আমার বাবা আমাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সর্বত্র, কারণ তাঁর ব্যবসাতে এ সময় আমার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আরও এক ব্যাপার ঘটলো, বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা করবার জন্যে পুলিশ আমার পিছু লেগে ছিল। সুতরাং আমি ঠিক করলাম হ্রাদিস্ত্ থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট আনতে হবে আমার। তদনুসারে হ্রাদিস্ত্ গিয়ে সেখানেই রয়ে গেলাম।

বাবার ব্যবসায়ে ঢুকে কেনাবেচার কাজ আবার আমার হাতে পড়লো। তবে পাড়াগাঁয়ের মেলায় ঘুরে ঘুরে জিনিস বিক্রীর ওপর আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। দেখলাম যে ও ধরণের ব্যবসার দোষ অনেক। বাজারে ঘুরে ঘুরে শুনলাম ব্যবসাদারেরা প্রাহা সহরে মাল চালান সম্বন্ধে বলাবলি করছে। তখন আমি একখানা ম্যাপ কিনে প্রাহা সহর কোথায় তা বের করবার চেষ্টা করলাম।

বাবা যখন শুনলেন যে আমি ম্যাপ ও টাইম্‌টেব্‌ল্ পড়তে পারি, তখন তিনি আমায় পঞ্চাশ ফ্লোরিন দিয়ে ভ্রমণের অনুমতি দিলেন। ভ্রমণকালে আমি বান্ নামক পিষ্টক আহার করে জীবন ধারণ করতাম এবং রেলওয়ে ওয়েটিং রুমে রাত্রি কাটাতাম। লেখার অক্ষমতা আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত। একটু আধটু লিখতে যে না পারতাম এমন নয়, কিন্তু কেউ আমার হস্তাক্ষর পড়তে পারতো না। ব্যবসাদারদের নিজের হাতে লেখা চুক্তিপত্র দিতে আমার লজ্জা করত।

আমার অসুবিধা ছিল বিবিধ। প্রথমত আমার খারাপ হস্তাক্ষর ও বানানের ভুল, আমার পোষাক পরিচ্ছদের অপরিচ্ছন্নতা, ভদ্রশ্রেণীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা, সকলের ওপর অসুবিধা ছিল এই যে, আমি মাত্র ষোল বৎসরের বালক, সে সম্বন্ধে আমি সদাসর্বদা অচেতন ছিলাম। দোকানদারেরা এসব কারণে আমায় ভাল চোখে দেখতো না। ষোল বছরের এতটুকু একটা ছেলে বড় বড় দোকানের এজেন্ট্‌দের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করবে এটা ছিল তাদের চক্ষুশূল। আমায় সব সময় তারা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

কিন্তু অন্য একশ্রেণীর লোক ছিল, যারা তরুণের বন্ধু ছিল প্রকৃতপক্ষেই। আমার যৌবন-সুলভ আশা আকাঙ্ক্ষাকে তারা সহানুভূতির চোখে দেখত। একজন মোরোভিয়ান বালক তাদের দোকানে এসেছে নতুন ব্যবসার প্রস্তাব নিয়ে, এতে তারা আনন্দিত হ'ত। এক পক্ষকাল ভ্রমণের পর অনেকগুলো নতুন অর্ডার এবং পিতৃদত্ত পঞ্চাশ ফ্লোরিনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ ফ্লোরিন নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।

আমাদের প্রাহা আবিষ্কারের সঙ্গে স্পেনের আমেরিকা আবিষ্কারের তুলনা করা যায়, কারণ প্রাহার

সঙ্গে আমরা নতুন ধরণের বিক্রয়-পদ্ধতির আবিষ্কারও করে ফেলি। আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে স্পেনের যে আর্থিক উন্নতি ঘটেছিল আমাদেরও ঠিক তাই ঘটলো। সেই সময় থেকে আমাদের ব্যবসাও উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ল। বিক্রয়ের বাজার বিস্তৃততর হওয়াতে আমরা যথেষ্ট মাল তৈরি করতে লাগলাম। আমার পিতার দুঃসাহসিক স্বপ্নসমূহ এবার বাস্তবে পরিণত হ'তে চললো।

তাঁর চরিত্রের একটা দিক ছিল বড় অদ্ভুত। তাঁর পকেট যত খালি থাকবে তাঁর স্বপ্নও ততই আকাশে উঠতে চাইবে। এক্ষেত্রে একটা ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে এই ঘটনা থেকে তাঁর চরিত্র ও ব্যবসা পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

তখন হ্রাদিস্ত সহরে মেলা।

জুতোর বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বসে গল্প করতে করতে যে চিনির কারখানার চিমনি দেখিয়ে বাবা বলে উঠলেন আমার ছেলেরা একদিন ঐ রকম চিমনি গড়বে তাদের নিজেদের কারখানাতে।"

সে মেলাতে সেবার কারো বিক্রীসিক্রি সুবিধামত হয়নি ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল না টাকা। তারা খুশি হ'ত যদি কেউ তাদের মদের দোকানে নিয়ে গিয়ে মদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করত এ অবস্থায় বাবার খামখেয়ালী কথাবার্তায় তারা চটে গেল। তাদের মনে হ'ল বাবা এ কথাটা যেন তাদের দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করেই বললেন।

মুচিরা বাবাকে ঘিরে বসে গালাগালি করতে লাগলো কেউ বা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলো। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম, বাবার অবস্থা দেখে আমার ভয় হ'ল, বুঝি বা ক্রুদ্ধ মুচির দলের হাতে বাবাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওপর রাগও হোল, অমন অসতর্ক ধরণের কথাবার্তা বলবার দরকার কি? বাবা কিন্তু বিপদের মধ্যেও ধীর স্থির রইলেন জনতা তখন নিজেদের মধ্যে বিড় বিড় করে বকতে বকতে সরে পড়লো।

সে সময় কারখানার চিমনি আমাদের অঞ্চলে বেশি ছিল না। মেলার মুচিদের কাছে দু'টি মাত্র চিমনি পরিচিত ছিল হ্রাদিস্ত ও নাপাজেডলা কারখানার চিমনি দু'টি। প্রথম কারখানা ছিল মে নামক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবারের দ্বিতীয়টি ছিল কাউন্ট বাল তাৎসির সম্পত্তি। সুতরাং এ অবস্থায় চেক জাতীয় জনৈক সাধারণ শ্রেণীর লোক এ ধরণের গর্ব করে বেড়াবে যেখানে সেখানে যে গর্ব করা শুধু সাজে ধনী ব্যক্তিদের-বাবার সমব্যবসায়ীদের এটা নিতান্তই ধৃষ্টতা মনে হ'ল। সে কালে এরকম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। অনেক দিন পর্যন্ত ওরা বাবার ওপর বিরক্ত হয়ে ছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার ভাই বোনেরা বাবার ব্যবসা ত্যাগ করে স্বাধীন বৃত্তির দিকে পা বাড়ালাম। বাবা কোন দ্বিধা না করে মায়ের সমস্ত সম্পত্তি সুদসমেত আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এর পরিমাণ প্রায় আটশো ফ্লোরিন আন্দাজ হবে। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে বাবাকে যথেষ্ট সৎসাহস দেখাতে হয়েছিল। কারণ এক দমকা হাওয়ায় বাবার ব্যবসার তিনজন কর্মদক্ষ নবীনবয়স্ক অংশীদার এবং তাঁর মূলধনের বেশ মোটা কিছু অংশ বেরিয়ে চলে গেল। তবে সন্তানের স্বার্থ সর্বাগ্রে রক্ষা করতে বাবার দৃঢ়তা, সাহস ও সদিচ্ছার অভাব কোন দিন হয় নি।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমার দাদা আন্তোনিন্ জিলন্ সহরে তার নিজের নামে একটা জুতোর কারখানা খোলবার লাইসেন্স নেবার দরখাস্ত করলে। এ অবস্থায় আইনানুসারে আমি দাদার দোকানে

কর্মচারী মাত্র, কিন্তু আমাদের মধ্যে ঠিক রইল যে ব্যবসার লভ্যাংশ আমাদের তিনজনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হবে।

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাতে ব্যবসার উন্নতি করা যায় অবস্থা আরও সচ্ছল করে তুলতে পারা যায়—এই ছিল আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

আমাদের কারখানাকে আধুনিক প্রণালীতে আমরা চালাতে আরম্ভ করলাম, কাজ করবার সময় নির্দিষ্ট হ'ল সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, মধ্যে এক ঘণ্টা জলযোগের ছুটি। সপ্তাহান্তে দোকানের মজুর কর্মচারীদের সঙ্গে আমরাও আমাদের মাইনে পেতাম। ছোট কারখানায় পূর্বে এসব নিয়ম অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হ'ত।

পূর্বে কারখানাতে কর্মচারী ও কারিকরদের মাইনে দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট দিন ছিল না। বেচাকেনার সুবিধার উপর তাদের মাইনে দেওয়া নির্ভর করত। কাজেরও কোনো বাঁধাধরা সময় ছিল না—সকাল থেকে সুরু হয়ে রাত দশটা পর্যন্ত চলতো কাজ। শনিবার এবং মেলার আগের দিনগুলিতে সারারাত কাজ চলতো। কেবলমাত্র সোমবার ছুটি ছিল। কাজকে গৌরবের আসন দান করা হয়নি কোনোদিনই।

আঠারো কিংবা কুড়ি বছর বয়সের তরুণ-তরুণীদের সুখ ও আনন্দের জন্যে অনেক টাকার দরকার হয় না। তারা অল্প পেয়েই ভাবে অনেক কিছু পেলাম কাজেই আমরা আমাদের কারখানার যা কিছু সামান্য লভ্যাংশ পেতাম তা'তেই খুশি।

বাবার কাছে আমরা কথা দিয়েছিলাম জীবনে আমরা কোনোদিন ধূমপান করবো না বা মদ খাবো না। এ পর্যন্ত আমাদের প্রতিজ্ঞা বজায় ছিল, তবে হাতে দু'পয়সা আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য দোষ দেখা দিল। আমরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলাম। ক্রমে নিজেদের সামান্য জুতো তৈরি করা মুচি ভেবে আমাদের মনে লজ্জা ও সংকোচ দেখা দিলে। নিজেদের ব্যবসার ওপরেই যেন অশ্রদ্ধা এসে পড়তে লাগলো।

কারখানার মালমসলা ও কাঁচামাল আমরা ছ'মাসের মধ্যে পরিশোধের অঙ্গীকারে ধারে কিনে আনতাম ছ'মাস উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ধার শোধ দিতে না পেরে বিলের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে লাগলাম।

একবৎসর পরে, যখন আমাদের উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে জীবনযাত্রা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে, তখন আমাদের পাওনাদারেরা অনবরত বিলের মেয়াদ বাড়াতে বাড়াতে বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা স্পষ্টই জানিয়ে দিলে যে এরকম করা আমাদের আর চলবে না।

ঠিক এই সময়ে আমার দাদা আন্তোনিনের ডাক এল সৈন্যদলে যোগ দেবার। যাবার সময় দাদা বলে গেল আমাদের ব্যবসা টিঁকবার নয়, এর শেষ পরিণতি দাঁড়াবে দেউলে-আদালত।

সুতরাং ব্যাপারটা মোটামুটি এই দাঁড়াল। এক বৎসরের স্বাধীন ব্যবসার ফলে আমাদের তিন ভাইবোনের সম্মিলিত পুঁজি ৮০০ ফ্লোরিন তো উড়ে গেলই, আরও গেল আমাদের মহাজনদের প্রায় ৮০০০ ফ্লোরিন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও, কঠোর ও নির্মম সত্যকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না।

এই ঘটনার পূর্বে দেউলে হওয়ার প্রকৃত অর্থ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। দেনা না শোধ করলে ক্রমশ যে ব্যবসা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়, একথা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু কখনো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিনি। আজ যখন সত্যই নিজেরা দেউলে হতে চলেছি, তখন দুর্ভাবনার আর অজানা ভয়ে আমার

মাথার চুল সাদা হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। এভাবে অপমানিত হওয়া যে মৃত্যুর সমান, সে জিনিসটা উপলব্ধি করলাম। কিন্তু তখন আমি মরতে চাইনি, নবীন যৌবনের সকল আগ্রহ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই। বেঁচে থাকবার আগ্রহ আমার মধ্যে যত বেশি সুনাম রক্ষা করবার আগ্রহও তার চেয়ে কম ছিল না।

সুতরাং আমি আমার নিজের দেহ ও মনের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলাম। সে শাস্তির রূপ হচ্ছে কঠিন পরিশ্রম ও সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন। এই কঠোর সংযম আমার মন থেকে প্রথম বৎসরের শৈথিল্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে দূর করে দিয়ে এমন একটি দৃঢ়তা ক্রমশ আনয়ন করলে, যার ফলে আমার মন তৈরি হয়ে উঠলো। আর যাতে এমন প্রলোভনে না পড়ি এজন্য আমি সতর্ক হয়ে রইলাম।

দেউলে হওয়াটা এড়িয়ে গেলাম সৌভাগ্যক্রমে। যখন পাওনাদারেরা দেখলে আমরা আমাদের চালচলন বদলে ফেলেছি তখন তারা পাওনার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে না এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের বিপদের বন্ধু হয়ে দাঁড়ালো। দু'বছরের মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গেল।

জিলিন শহরের অনেক জুতা ব্যবসায়ী আমাদের মত বিপদে অনেকবার পড়েছে কিন্তু বিপদ তাদের মধ্যে ধৈর্য ও সাহস এনে দেয়নি। তারা দেউলে হওয়াটাকে দৈহিক মৃত্যুর সামিল মনে করত। আমার খুড়ো ফ্র্যান্টিসেক বাটা ছিলেন ওদের মধ্যে বড় দাবিদ্র। আমার পরামর্শে তিনি স্বাধীন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন কারণ তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালানো মানে ছিল দেউলে হওয়া।

ব্যাপারটা খুলে বলি।

আমি স্বাধীনভাবে জুতোর দোকান খোলবার কিছুকাল পরে কাকার বাড়ি একবার দেখা করতে গেলাম। তিনি বিছানায় পুরু করে খড় পেতে রংচংগুলো পুরানো কাপড় ও কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছেন। সময়টা যদিও বৈকাল তবুও তাঁর ঘরের মধ্যে তখনও অন্ধকার কারণ জানালা ও ঘুলঘুলিতে শীতের ঠাণ্ডা বাতাস আটকাবার জন্যে ছেঁড়া নেকড়া গোজা ছিল। দিনটাও ছিল বেজায় ঠাণ্ডা। আমি ঘরের চারিধারে চেয়ে দেখলাম যে তাঁর ঘরে কোন রকম জ্বালানি বা খাবার আছে কিনা। কিন্তু ঘরের মধ্যে মরচে পড়া লোহার স্টোভের জন্য কোন জ্বালানিই আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হ'ল স্টোভটা অনেক দিন জ্বালান হয় নি তাঁর বিছানা থেকে কিছুদূরে একখানা শক্ত পাউরুটি পড়ে আছে, যেটাকে সবদিক থেকে চিবোনো হয়েছে। আমার ঘরে ঢুকবার সময় খুড়োমশায় তাঁর মুখের নেকড়াগুলো সরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন কে ঘরে ঢুকছে।

তিনি আমায় চিনতে পারলেন তক্ষুনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাঁর কোন অসুখ হয়েছে কিনা। বল্লেন তাঁর সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে ঘরের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা তাঁকে আমার সামনে লজ্জিত করে তুলেছে—মনে হ'ল।

আমি প্রস্তাব করলাম তাঁকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তিনি আমার সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাঁর কিছু দরকার নেই আপাততঃ। চিবোনো রুটিখানা দেখিয়ে আমায় বললেন, এখনও জুতোর চামড়া কিনবার জন্যে ৪ ফ্লোরিন তাঁর কাছে আছে। তাঁর আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল প্রবল, উপবাসী থাকবেন তাও স্বীকার তবু অপরের কাছে খাদ্য গ্রহণ করবেন না এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কারবারী হিসেবে তাঁর কোন নাম ছিল না

মেলার দোকানে দেখতাম আরও জনকুড়ি কারিকরের সঙ্গে তিনি দোকান খুলে বসেছেন। তাঁর ছোট্ট দোকানে চার জোড়ার বেশি জুতো কোন সময়ই থাকত না। তিনি বড় জোর এর মধ্যে দু'জোড়া বিক্রী করেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করতেন, যার মোট দাম তিন ফ্লোরিন। তিনি ধীর কর্মী ছিলেন বটে কিন্তু অলস ছিলেন না। বিছানায় শুয়ে থাকতেন যখন, তখনও নিতান্ত বিনা কারণে নয়। ফেব্রুয়ারী মাস যায় যায়, জুতোর ব্যবসার অবস্থা সে সময় মন্দা।

শুধু আমার খুড়ো মশায় নয়, আমাদের অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই শীতকালে শয্যা আশ্রয় করত, কারণ ব্যবসা মন্দা পড়াতে সে সময় তারা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ত—আগুন জ্বালান, পোষাক পরিচ্ছদ কেনার খরচ বাঁচাবার এই ছিল তাদের প্রকৃষ্ট পন্থা। শুধু শুয়ে শুয়ে থাকলে খাবার দরকারও হবে কম—পরিশ্রম করলেই বেশি খাবার দরকার হয়। এমন লোকও দেখেছি যারা সারা শীতকালের মধ্যে আলো জ্বালত না আদৌ—সে খরচও তাদের জুটত না।

আমার খুড়ো প্রাণপণে পরিশ্রম করতেন এবং কাজে লেগেও থাকতেন, কিন্তু শুধু ঐ দু'টি গুণে পেটের ভাত হয় না। আমাদের অঞ্চলে তখন ভাল রেলপথ ছিল না এবং মাল আমদানী রপ্তানীর সুযোগ সুবিধা না থাকার দরুণ ব্যবস্থার অবস্থা ছিল খারাপ।

খুড়ো মশায়কে আমি ছেলেদের চটিজুতো তৈরি করতে শেখাই। ক্রমে তিনি এক সপ্তাহে বিশ জোড়া এ ধরণের ছোট চটি গড়তে পারতেন। এই ব্যবসায়লব্ধ সামান্য অর্থে তিনি ক্রমশ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেলেন, যে কাশ রোগে অনেক দিন থেকে ভুগছিলেন, তাও চলে গেল। জানালায় ঠাণ্ডা আটকাবার জন্যে আর ছেঁড়া নেকড়া গুঁজবার আবশ্যক রইল না, বিছানায় ফর্সা চাদর দেখা দিলে, ঘরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা হ'ল।

আমার বড় হবার স্বপ্ন

বিদ্যালয় ছেড়ে যখন বাবার কারখানায় শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হই, তখনও আমার ধারণা মনুষ্য সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ভদ্র ও সাধারণ শ্রেণী।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ ছিল। ছেলেদের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ত তারা ছাত্র-জীবনেই তরুণ সম্ভ্রান্তবংশীয় ছাত্রের খাতির পেত, আর যারা আমার মত কোন কারখানার শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হ'ত তাদের অদৃষ্টে জুটতো জীবনব্যাপী দাসত্ব ও দারিদ্র্য।

গ্রামার স্কুলের তরুণ ছাত্রেরা ভদ্রবংশের চালচলনে চলবার চেষ্টা করত এবং বিকেল চারটার সময় সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে তাদের শিক্ষকদের অনুসরণে সহরের রাস্তায় সগর্বে পাদচারণা করত। আমাদের মত গরীব শিক্ষানবিশিরা কারখানার বেঞ্চিতে বা কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে রাত দশটা পর্যন্ত হাড়ভাংগা খাটুনি খাটত। এই অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিত সবাই, ছাত্রের অভিভাবকেরা তো বটেই, এমনকি ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য ভ্রাতারাও। হয়তো তাদের ছাত্রভ্রাতা যে সময়ে সৌখীন চালে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সে বেচারীরা সে সময়টা গাধার খাটুনি খাটচে—কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের কোন নালিশ ছিল না।

আমি ব্যবসাতে শিক্ষানবিশ করতে ঢুকেচি নিজের ইচ্ছায়, কিন্তু আমার মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমি ভদ্রশ্রেণীর লোক বলে গণ্য হই, শিক্ষিত সমাজে বেড়াই, সভাসমিতিতে যাতায়াত করি যেখানে আমার অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ থাকে সর্বদা। এই কারণেই

আমি স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করতাম এবং আমার উচ্চশ্রেণীতে মিশতে চেষ্টা করাটাকে যারা ধৃষ্টতা বলে ভাবত, তাদের কাছে আমাকে যথেষ্ট অপমান ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হ'ত। এজন্য কত মারামারি করতে হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই।

জলযোগের ও নৈশ ভোজনের পর অবসর সময়ে আমি বই পড়ে ভদ্রসমাজের বুলি শিখবার চেষ্টা করতাম এবং নিজের যা কিছু ভাল পোষাক আছে তাই পরে স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে যেতাম। একজন দড়ির কারিকরের ছেলে দড়ির কারখানায় শিক্ষানবিশ ছিল সে ছাত্রদের দলে সমানে সমানে মিশত কারণ সে ধনী বাপের সন্তান—সে কিন্তু আমার প্রত্যেকটি চালচলন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করত। আমিও যে তার দলে সমানে সমানে মিশি, এটা তার পছন্দসই ছিল না।

ওদের ভদ্রধরণের বাক্যবিন্যাসরীতি শিখে নেবার চেষ্টায় মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতাম। হয়তো তারা আলোচনা করছে যে পর্যন্ত বেড়াতে আসা হয়েছে এখান থেকেই তারা ফিরবে—না আরও এগিয়ে যাবে আমি হয়তো ওদের সঙ্গে শুধু ছুটেই কথা বলবার বিপুল আগ্রহে বলে উঠলাম, এখান থেকেই ফেরা উচিৎ কারণ ঝড় আসতে পারে।

অমনি দড়ির কারিকরের ছেলেটা বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল ঝড় উঠবে কিনা সে খবর একজন মুচির দোকানের শিক্ষানবিশ অপেক্ষা সে ও তার ছাত্র বন্ধুরা ভালই জানে। আমার কান লাল হয়ে উঠল। এই বক্রোক্তির পরে কি ঘটেছিল তা আমার ঠিক স্মরণ হয় না, তবে এটুকু মনে হয় যে সকলে হঠাৎ চুপ করে গেল। বহুবৎসর পর্যন্ত আমার মনে অনুশোচনা হ'ত যে তখন কেন সে অসভ্য ছোকরাকে তার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তিস্বরূপ প্রহার দিই নি যদিও সেকালে সাহসিকতা ও বর্বরতার মধ্যে কোন প্রভেদ করা হ'ত না। যদি মার দিতাম তবে সবাই আমাকে অসভ্য চোয়াড় বলেই ধারণা করত।

আমার বাবা যদিও জানতেন যে আমি ভদ্রসমাজে মেলামেশা করি, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে কাজের সময়ে আমার সৌখীন হওয়ার চেষ্টাকে প্রশ্রয় দিতেন না। আঠারো বছর বয়সে পদার্পণ করে শিক্ষানবিশি সাঙ্গ হ'ল এবং তখন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সংকল্প করলাম মনে মনে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আমার দাদা ও বোনকে জপাতে লাগলাম যে তিনজনে একটা কারখানা খুলে কারখানার মালিক হয়ে বসা যাক, তা হ'লে উচ্চশ্রেণীতে মিশবার পথে আমাদের কোন বাধা থাকবে না। আমার বাবা জানতেন আমরা যদি তাঁর কারখানা ছেড়ে চলে যাই তবে তাঁর ব্যবসার মূলধন থেকে আটশো ফ্লোরিন বেরিয়ে যাবে কারণ এ টাকাটা আমার মায়ের টাকা আইনসংগত অধিকারী আমরাই।

বাবা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমার ভ্রমণের ফলে যে অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায় বুদ্ধি জন্মেছিল, মূলধনস্বরূপ তাও আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমায় মনে করিয়ে দিলেন এর জন্যে তিনি অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এ কথা বলার মূলে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ ছিল না—এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে তাঁর প্রদত্ত এই সব মূলধনকে যেন আমি হীনচক্ষে না দেখি। তিনি ঠিকই বলেছিলেন।

ব্যবসারের স্থান নির্বাচন নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয় নি। ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা ছিল এ বিষয়ে প্রধান কার্যকরী শক্তি। জিলিন্ সহরে আমরা জগতের আলো প্রথম দর্শন করি, সুতরাং এখানেই ব্যবসা খুলতে হবে। কিন্তু তখন আমাদের একথা ভাবা উচিত ছিল যে জিলিন্ রেলপথ এবং বড় ব্যবসাকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত, ব্যবসার তেমন কোন সুবিধা এখানে নেই।

কারিকরের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করা হ'ল আমার বড় ভাই আন্তোনিনের নামে, কারণ

আমার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর থাকায় আইনানুসারে আমি দাদার সহকারী মাত্র হ'তে পারি, আমার নামে লাইসেন্স নেওয়া যায় না। দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা যন্ত্রপাতি ও মালমসলা কিনে ঘর বোঝাই করলাম, জিনিসগুলো ধারেই কেনা হ'ল। মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের কড়ারে আমরা যন্ত্রপাতি কিনলাম, মালের জন্যে হুণ্ডি লিখে দিলাম। সুরু থেকেই বড় ফ্যাক্টরীর অনুকরণে আমরা তৈরি মাল নিয়ন্ত্রিত করছিলাম, যদিও আমাদের ফ্যাক্টরীতে মাত্র দু'টি জানালা ছিল।

কাজের সময় বেঁধে দিলাম—সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা—মধ্যে এক ঘণ্টা জলযোগের ছুটি। ছ্লাদিস্ত্ সহরে বাবার কারখানায় কিন্তু এ নিয়ম ছিল না। সেখানে ঘুম ভেঙে কাজ আরম্ভ করা হ'ত আর যতক্ষণ রাত্রে শোবার সময় উপস্থিত না হয়—অর্থাৎ প্রায় রাত দশটা—ততক্ষণ পর্যন্ত খাটুনির বিরাম ছিল না।

আমাদের মজুরদের খাবার দিতাম না আমরা। প্রত্যেক শনিবারে সপ্তাহের মজুরী চুকিয়ে দেবার নিয়ম আমরা করলাম, পূর্বে কোথাও এ নিয়ম ছিল না—বছরে দু'বার তাদের মজুরির হিসাব হ'ত, একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তকালে। কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ব্যতিরেকে তাদের পুরো খাটুনির মজুরি কখনই শোধ হ'ত না। আমাদের ব্যবস্থা ছিল এদিক দিয়ে খুব ভাল। আমার বাবা যখন নতুন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে আমাকে কোনো কারখানায় পাঠাতেন কিছুদিন মজুরি করবার জন্যে, তখনি এধরণের মজুরী দেবার নিয়ম আমি জেনেছিলাম। সেটা এখন কাজে লাগান গেল।

আমি আর আমার দাদা যে কাজ নিজেদের করবার জন্যে রেখেছিলাম, তার অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। যদিও কি শীত কি গ্রীষ্ম, ভোর ছ'টার সময়ে উঠে আমরা কাজ আরম্ভ করতাম, কিন্তু এগুতো না। কারণ হাতের কাজ করতে আমরা লজ্জা বোধ করতাম মনে মনে। আমরা কারখানার মালিক, আমাদের কি হাতের কাজ সাজে? আমরা সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে কারখানায় যেতাম, নিকটবর্তী কোনো কাফেতে ঘণ্টাখানেক বিলিয়ার্ড খেলতাম, রাত্রে আমরা উচ্চশ্রেণীর সমাজে মিশতে চেষ্টা করতাম, বিয়ার টেনে খোসগল্প জুড়তাম সেখানে। দিনমানে আমি আর আমার ভাইয়ের মধ্যে তর্ক হ'ত কে হাতের কাজ করবে, আর কে অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবের কাজটা করবে। তর্কের ফল এই দাঁড়াত, না হ'ত হাতের কাজ, না হ'ত অন্য কাজ। কাজের মধ্যে দাঁড়াল শুধু হুণ্ডি আর হ্যাণ্ডনোট সই করা—সেটা আমার দাদাকে করতে হ'ত কারণ দাদাই আইনত দায়ী ছিলেন ফার্মের দেনার জন্যে। সই করার কাজটা খুব ঘটা করে করা হ'ত।

শরৎকাল থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত এভাবেই চলল। বসন্তকালে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল——বিশেষ করে এই কারণে যে, বাজারে আমাদের ক্রেডিট্ নষ্ট হওয়ায় দাদাকে আর হ্যাণ্ডনোট সই করতে হ'ত না। তার বদলে তাকে আমাদের পূর্বপ্রদত্ত হ্যাণ্ডনোটগুলির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ত, কারণ বিল শোধ করবার পয়সা ছিল না। গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই পাওনাদারেরা আমাদের উপর সকল শ্রদ্ধা হারাল। নালিশ করবার ভয় দেখাতে লাগল। ভয় দেখানো কার্যে পরিণত করে শেষ পর্যন্ত তারা নালিশ করলে, আমাদের সম্পত্তির উপর ডিস্ট্রেণ্ট জারি করবার চেষ্টাও হ'ল।

যখন দেখা গেল আমাদের সম্মুখে সর্বনাশ ওৎ পেতে বসে, তখন কারখানার মালগুলো ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়ে আটশো ফ্লোরিন ধার করলাম এবং সেই টাকা পাওনাদারদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি কলরব তুলেচে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ'ল—নতুবা তারা আমাদের সর্বস্ব নষ্ট না করে ছাড়ত না।

হায়! পুঁজিবাদীদের আত্মা কি নির্মম, সংসারের কি অবিচার! ভদ্রশ্রেণীর অপেক্ষা কত বেশি খাটুনি খাটতাম আমরা, ছ'টার সময়ে আমরা কাজ সুরু করতাম আর তারা আটটা ন'টার কমে বিছানা ছেড়েই ওঠে না। তারা যে পরিমাণে টাকা ওড়ায় তার সিকিও আমরা ব্যয় করতাম না। কাফে বা রেস্তরাঁতে গিয়ে আমরা দু' ভাই মোট একটি ছোট গ্লাস বিয়ারের অর্ডার দিতাম--তাতে লোকে আমাদের ব্যঙ্গ করতে ছাড়ত না, কাফের মালিক আমরা ঢুকলেই বক্রদৃষ্টিতে চাইত। ধূমপান তো করতামই না। তবুও ভদ্রসমাজে মিশবার ধৃষ্টতার মধ্যে আমাদের শাস্তিভোগ করতে হ'ল—এবং কারখানার মালিক হওয়ার আশাও ছাড়তে হ'ল।

আমার দাদাকে এ সময় তিন বৎসরের মেয়াদে সৈন্যদলে যোগ দিতে আহ্বান করা হ'ল। হিসাব করে দেখা গেল, বাজারে আমাদের সইকরা ৮০০০ ফ্লোরিনের হ্যাণ্ডনোট ছড়িয়ে রয়েচে, এ ছাড়া খুচরো দেনাও দাঁড়িয়েচে কয়েক হাজার ফ্লোরিন-- অথচ আমাদের কারখানার মালমসলা ও যন্ত্রপাতির দাম একশো ফ্লোরিনও হবে না। তখন দাদা আমায় পরামর্শ দিলেন কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে দেউলে হবার প্রার্থনা জানাতে।

বিলের দেনা শোধ হওয়ার কোন উপায় রইল না। আমাদের পাওনাদারেরা কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগল। আমাদের সম্বন্ধে তারা কিরকম ধারণা পোষণ করে সে কথা জানালে। আমাদের উপদেশ দেওয়ার কাজে তারা যে অধ্যবসায় প্রদর্শন করলে, গির্জায় পাদ্রী নীতিসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময়ে বা আমার বাল্যের গুরুমহাশয় আমাকে হাতের লেখা শেখাতে তদপেক্ষা অধিক অধ্যবসায় দেখান নি। ক্রমে ক্রমে আমার মনে হ'ল পাওনাদারদের কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। আমরা যে ধরণের ভদ্রজীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম তা করতে হ'লে স্টেটের বা সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর ধনভাণ্ডার হাতে থাকা দরকার।

সেই থেকে আমি ভদ্রসমাজে মিশবার দুরাশা ত্যাগ করলাম। পান ভোজনের আড্ডাও ছাড়লাম। সব সময় জীবনের সুনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে আবিষ্কার করলাম যে, সময় নষ্ট না করে সে সময়টা অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যয় করাই কর্তব্য, হাতের কাজ করলেও কোন দোষ নেই--যদিও তাকে এতদিন অভদ্রোচিত বলে মনে মনে ঘৃণা করে এসেচি।

কিন্তু একখণ্ড বরফ জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলে দেবার মুহূর্তেই যেমন সে গলে যায় না--তেমনি আমার ভদ্রশ্রেণীতে মিশবার প্রবৃত্তিকে তখনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। দোকানের এক অন্ধকার কোণে আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে বসতাম, যেখান থেকে আমায় কেউ দেখতে পায় না অথচ কেউ ঢুকলে আমি দেখতে পাই। আমার অবস্থা যে অত খারাপ হয়ে গিয়েচে, আমি যে নিজের হাতে জুতো সেলাই করচি—এটা কেউ না দেখে। ক্রমশ এ লজ্জা আমার চলে গেল। কাজে সবটুকু মন চলে গেল। মনে হ'ল, অলস লোকদের অনুকরণ করে- তা তারা ভদ্র বা অভদ্র যে শ্রেণীরই কেন হোক না - আমি কি নির্বুদ্ধিতার কাজই না করেচি! ক্রমে কর্মই আমার চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপায় হয়ে উঠল- দেখলাম কঠোর পরিশ্রমই মনকে তৃপ্তি দেবার প্রকৃষ্ট উপায়।

নিজের হাতে মজুরের কাজ করে আমি মিতব্যয়িতার সঙ্গে মালমসলা ব্যয় করবার ও বিভিন্ন কাজ সহজ উপায়ে করবার নানা রকম উপায় আবিষ্কার করলাম। এই সময় থেকে মূলধন বা ক্রেডিটের দুশ্চিন্তা আমায় বাধা দিতে পারে নি কখনো। তৈরি মাল ভিয়েনাতে বিক্রী করে নগদ পয়সা ঘরে আনতাম, তবে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে তাদের মতেই মত দিতে হ'ত আমায়।

ভিয়েনার প্রদত্ত অর্ডার দেখিয়ে আমরা মহাজনের কাছ থেকে এক সপ্তাহের মেয়াদে কাঁচামাল কিনে আনি। প্রথম প্রথম মহাজনেরা অবিশ্বাসের হাসি হাসতো—পরে তারা এ ধরণের বেচাকেনাতে রাজি হয়ে গেল। রাতদুপুরে যে ট্রেন অট্রোকোভিচ্ স্টেশনে আসে, সেই ট্রেন থেকে কাঁচামাল নামিয়ে নিয়ে পিঠে বয়ে কারখানায় আনতাম--জিল্‌ন্ থেকে এই স্টেশনের দূরত্ব ছিল বারো মাইল। রাত্রে ফিরে সারা রাত খেটে–মালপত্র বিভিন্ন মজুরদের জন্যে ভাগ করে দিতাম—যাতে সকাল থেকেই তারা কাজ আরম্ভ করতে পারে--এতটুকু সময় নষ্ট না হয়। মজুরেরা দিনরাত খেটে মাল তৈরি করত। মাল তৈরি হয়ে গেলে তারা বিশ্রাম করত আমি সেই সব তৈরি মাল সহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে আরও কাঁচামাল আনতাম, মজুরদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতাম।

কোন কোন সময় এমন হ'ত যে পাওনাদার বা মহাজনদের টাকা যা দেবো বলে আগে ঠিক করেছিলাম, তাদের কড়া তাগাদার ফলে তার চেয়ে বেশি দিয়ে দিতে হ'ত- মজুরদের দেওয়ার পয়সা থাকত না। তখন তাদের সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হ'ত তাদের খাদ্য কিনবার জন্যে -তাও অনেক সময় তাদের আধপেট খেয়ে থাকতে হ'ত--কারণ পুরো খাবার যোগাবার পয়সা হাতে থাকত না।

মজুরদের মধ্যে যারা স্থানীয় দোকানে ধার পেত, তারা তাদের অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য ভ্রাতাদের উপকারের জন্যে নিজেদের খাবার কেনার পয়সার দাবি ছেড়ে দিত। কিন্তু অর্থ বিতরণ করতে করতে যখন টেবিলে অবশিষ্ট আছে মাত্র একমুঠো খুচরো নিকেলের মুদ্রা তখন অধিকতর গরীব মজুরেরা ঘরে ঢুকে এমন কাতর চোখে চাইতো যে অবশিষ্ট সামান্য কিছু খুচরো যা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রেখেছিলাম--সেগুলো তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হ'ত। আমাদের সংসার খরচের জন্য এক পয়সাও অবশিষ্ট থাকত না।

আমার ভগ্নী কান্নাকাটি জুড়ে দিত কারণ সামনের পুরো সপ্তাহটি ধরে আমাদের খাবার কিছু নেই। রুটিওয়ালা ধার দিতে নারাজ, কারণ এর আগে কয়েকবার তার দেনা ঠিক সময়ে শোধ করা হয় নি। পাওনাদারদের টাকা কিস্তি অনুযায়ী শোধ করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের এতটুকু শান্তি দিত না—এবং এই সদাজাগ্রত অশান্তির মধ্যেই আমাকে কারখানার কাজ চালাতে হ'ত।

আমার ইহুদি মহাজনেরা তবুও কিছু বুঝত। জিল্‌ন্ সহরের ইহুদি ব্যবসাদারেরা তাদের বুঝিয়েছিল যে আমার অবস্থা এমন যে নিংড়ালেও একফোঁটা রক্ত বেরুবে না। বেশি পীড়াপীড়ি করে কোন ফল হবে না। কিন্তু তাদের জানা উচিত ছিল যে আমি তাদের দেনা শোধ করছি আমার শরীরের রক্ত জল করে আমার কঠোর কর্মক্ষমতা ও পরিশ্রম দিয়ে। সে পুঁজি আমার কাছ থেকে কোন আদালতের পেয়াদা এসে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

খৃস্টমাস পর্ব এসে গেল, আমাদের মজুরদের মধ্যে এবার বেশি টাকা দেওয়ার প্রয়োজন। আমি সারা অস্ট্রিয়া ঘুরে ঘুরে আমার খরিদ্দারের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে লাগলাম। বর্ষার দিন, আমার পায়ে জুতো ছিল না। আমার ভগ্নীকে লিখলাম আমার একজোড়া বুট তৈরি করবার জন্যে কারণ সে সময় বুট জুতো আমাদের কারখানায় তৈরি হ'ত না। জিল্‌নে ফিরবার পথে আমার জুতোর গোড়ালি একদম খসে গেল, সে অবস্থাতেই আমি বাড়ি পৌঁছলাম—পথে একদল নরনারীকে অতিক্রম করে আসতে হ'ল এ অবস্থায়, তারা নিশীথ রাত্রির ভজনার জন্য গির্জায় চলেছে।

পরদিন আমার শয্যাত্যাগ করতে বিলম্ব হয়ে গেল, কারণ আমার ভ্রমণের সময়ে আদৌ ঘুম হয় নি, থার্ড ক্লাশ কামরার কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে সামান্যমাত্র ঘুমুতাম। বিছানা ছেড়ে উঠেই বিছানার

পাশে নতুন বুটজোড়া দেখতে পেলাম। তাড়াতাড়ি জুতো জোড়াটা পরলাম. উদ্দেশ্য এই যে নিকটবর্তী রেস্তরাঁতে গিয়ে ভদ্রশ্রেণীর লোকের সংগে আড্ডা দেওয়া।

কিন্তু হায়! সবে মাত্র কিউ ধরেচি একহাত বিলিয়ার্ড খেলবার জন্যে, এমন সময় বিলিয়ার্ড রুমে এসে ঢুকলো জনৈক মুচি সে এসেচে পাশের মদের দোকান থেকে। আমার পায়ের নতুন বুটজোড়া দেখে সে আমায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল। বললে, "ওহে চালবাজ ছোকরা এ নতুন বুটজোড়ার দাম জুটবে কোথা থেকে জিগ্যেস করি?"

এই বলে সে আমার পায়ের নতুন জুতো জোড়ার প্রতি বিলিয়ার্ড রুমের ভদ্রশ্রেণীর জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

এই অপমানে আমার কিন্তু যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। এরপর আমি এমন কোন সুট পরিনি, যার দাম শোধ হয়ে না গিয়েছিল। ধারে হাতী চড়ার অভ্যাস একেবারেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শত্রুদের কাছে তখনও আমাকে যথেষ্ট উপদেশ পাবার ছিল তারা প্রাণপণে চেষ্টা না করলে আমার সাংসারিক নীতির জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

বছরের প্রথমে আমি আমার দেনা পাওনা হিসেব করে ব্যবসার অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। স্থানীয় ট্রেড স্কুলের শিক্ষক বুক কিপিং এর নিয়ম অনুযায়ী আমার ব্যালান্স শিট তৈরি করে দিলেন। যদিও আমার ব্যালান্স-শিট করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না কারণ আমার কারখানার প্রত্যেক টুকরো চামড়া সম্বন্ধে আমি খবর রাখতাম ব্যবসার মোটামুটি অবস্থা কি তাও জানতাম। তবুও নিয়মানুযায়ী হিসাব রাখা আমার পক্ষে বড়ই ভাল ছিল ব্যবসার বিভিন্ন সংখ্যাগুলিকে অংকশাস্ত্রের সুশৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা।

দেখা গেল আমার জমাখরচ ঠিক আছে। দেনায় একেবারে ডুবে যাই নি দেখে লোকে যতটা আশ্চর্য হ'ল, আমি ততটা আশ্চর্য হই নি ব্যবসার অবস্থা আমার অজ্ঞাত ছিল না। লোকের কাছে এটা একটা অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে প্রতীয়মান হ'ল।

আসলে দৈব বা অতিপ্রাকৃত কিছু নয় আমি নিজেকে দেউলে হবার শোচনীয় অধঃপতনের মুখ থেকে সামলে নিয়েছিলাম সময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতে শিখে। সময়ের সদ্ব্যবহার ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ব্যবসার মোড় ঘুরে যাওয়াতে নগদ দাম দিয়ে কাঁচামাল খরিদ করতে পারা গেল তার ফলে সেগুলো পূর্বাপেক্ষা সস্তায় পেতে লাগলাম।

আমার শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সমব্যবসায়ীদের চেয়ে অনেক অংশে আমার ব্যবসার অবস্থা ভাল ছিল। আমি নিজে কাঁচামাল কিনতাম, নিজের হাতে সেগুলো কেটে ভাগ করে দিতাম বিভিন্ন কারিকরদের মধ্যে প্রত্যেক জোড়া তৈরি জুতো নিজে পরীক্ষা করতাম মজুরদের বেতন নিজে দিতাম খাতাপত্র নিজে রাখতাম। এই নিয়মে আমার অনেক সময়, অর্থ ও মাল বেঁচে যেত। চুরি হওয়ার উপায় ছিল না। আমার কর্মকুশলতা এত বেড়ে গেল যে আমি এক সপ্তাহের কাজের উপযুক্ত সব কাঁচামাল একশ' কারিকরদের মধ্যে এক সপ্তাহ পূর্বে থেকে নিজের হাতে বণ্টন করে দিতাম। তার ফলে আমি জানতে পারতাম তারা কেমন মাল তৈরি করচে, প্রত্যেক জুতো জোড়ার খবর ছিল আমার নখদর্পণে প্রত্যেক কারিকরের নামে পৃথক পৃথক খাতায় তাদের সপ্তাহের খাটুনির মজুরী, তৈরী মাল, দেনা-পাওনার হিসেব রাখা হ'ত, কে কত মাল নিলে তার বদলে কত জোড়া তৈরি জুতো দিলে এসবের সংবাদ রাখা হ'ত, খরিদ্দার ও পাওনাদারদের সম্বন্ধেও অনেক খবর আমি খাতায় লিখে রাখতাম -

মোটের উপর ব্যবসার সব দিকে বিশেষত মাল তৈরি ও মাল কাটানোর দিকটাতে সতর্ক দৃষ্টি থাকত সর্বদা—এসব করেও আমি সপ্তাহের মধ্যে শনিবার ছাড়া অন্য দিনে কারখানার কাজে হাত দিতে পারতাম।

আমার হিসেবের খাতা অনুযায়ী আমার জমার ঘরে কোন বড় অঙ্ক ছিল না বটে কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল যে ব্যবসা ক্রমশ উন্নতির পথে চলবে, এবং এমন দিন দূরবর্তী নয়, যেদিন পাওনাদারের বিভীষিকা অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে এবং আমার অধিকার জন্মাবে যে কোন লোকের সামনাসামনি সমদক্ষ হয়ে দাঁড়াবার।

১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি আমার এই বহুদিনের অভীপ্সিত স্বাধীনতা হাতের মুঠোর মধ্যে যখন পেয়েছি, তখন হঠাৎ একদিন আমার এক ভিয়েনাস্থিত মহাজনের আর্থিক সর্বনাশের কথা শোনা গেল। প্রথম দিনটা এ কথায় আমি কান দিই নি, কেবল বাবার কথা মনে পড়ে দুঃখ হ'ল, তিনি আমাব ভাইয়ের মত এই ফার্মের কাছে অনেক হ্যান্ডনোট লিখেছেন কাঁচামালের জন্য।

এই ফার্মের কাছে আমার দেনা এক পয়সাও ছিল না। একদিন আমার ভাই বল্লে এই ফার্মের নামে কিছু হ্যান্ডনোট সই করে দিতে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে বিলের টাকা তারা নিজেরাই শোধ করে নেবে। আমি বারণ করলাম এ রকম বিল সই করতে, বিশেষ করে যখন এ ফার্মের কাছে আমরা কিছু নিই না।

পরদিন আমার ভাইয়ের নিকট থেকে এক চিঠি এল। তাতে সে লিখেচে আমার বারণ সত্বেও তাকে বিল সই করতে হ'ল, কারণ সই ফার্মের অংশীদারেরা তাকে পীড়াপীড়ি করচে, আমার বাবাকে তারা বিপদের সময় কত দয়া করেচে সে সবের দীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল করেচে এবং একথাও ভাইকে বলেচে যে ব্যাপারটা গোপনীয় রাখলেই হবে। মিঃ টমাসের (অর্থাৎ আমার) কানে কথাটা ওঠাবার দরকার কি? পত্রের শেষে আমার ভাই স্বীকার করেচে যে বিশ হাজার ফ্লোরিন্ মূল্যের বিল তাকে সই করতে হয়েচে।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা উড়ে গেল। সর্বনাশ একেবারে সামনে, কল্পনাচক্ষে স্পষ্ট দেখলাম আদালতের পেয়াদা দোরে এসে ধাক্কা দিচ্চে। দেয়ালের গায়ে সাইকেলখানা হেলান ছিল, সেখানা বের করে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে হ্রাদিস্ত্-এর দিকে ছুটলাম।

পথের লোকজন অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল, তাতে আমার মনে পড়ল টুপি মাথায় না দিয়েই পথে বেরিয়ে পড়েচি। সেকালে এধরণের ব্যবহার খেপামির চূড়ান্ত বলে গণ্য হ'ত—সুতরাং বাড়ি ফিরে টুপিটা নিয়ে এলাম। সেখানে পেঁাছে তখনি এটর্নির বাড়ি গিয়ে তাকে আমাদের দুর্দশার কথা খুলে বলি। রাত্রের খাবার না খেয়ে আলো না জেলে সারারাত টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসে চিন্তা করতে লাগলাম। সেই রাত্রের ট্রেনেই ভিয়েনা রওনা হই। আইনানুসারে হ্যান্ডনোটের টাকা যে আমি পরিশোধ করতে বাধ্য এ আমি ভালই জানি।

এই বিলের পরিবর্তে আমরা লাভবান হইনি একথা আইনে খাটবে না। ফার্মের কাছে এ দাবি হয়তো খাটতে পারত, কিন্তু এ বিল যারা তাদের কাছ থেকে কিনবে, তারা একথা শুনবে না। তাদের টাকা শোধ করে দিতেই হবে—আমরা আমাদের টাকা দেউলে ফার্মের কাছে বলে আদায় করবার চেষ্টা করতে পারি। আইনের একটি ধারা অনুসারে সমর বিভাগে নিয়োজিত কোন সৈনিকের সই করা বিল আইনত অসিদ্ধ, কিন্তু দেখতে হবে এই ফার্মের মালিক আমার ভাই, তারই নামে লাইসেন্স নিয়ে ফার্ম খোলা হয়েছিল।

উক্ত ফার্মের পাওনাদারদের কাছে আমাকে এই মর্মে লিখে দিতে হ'ল যে, আমার প্রতারিত ভ্রাতার প্রদত্ত হ্যান্ডনোট আমি অগ্রাহ্য করব না, তবে ঐ বিলের টাকার অঙ্ক আমার ক্ষুদ্র ফার্মের পুঁজির অঙ্ক অপেক্ষা অনেক বেশি।

ভগবানের ইচ্ছায় এ নতুন বিপদও কাটিয়ে উঠলাম। প্রথমবারের বিপদ অপেক্ষাও এ বিপদে টাকার অঙ্ক অনেক বেশি ছিল একথা সত্য বটে, কিন্তু আর্থিক পুঁজির চেয়েও মহত্তর যে নৈতিক পুঁজি, অর্থাৎ কর্মে দৃঢ়তা, মহাজন ও খরিদ্দারের সদিচ্ছা এবং আমার কারখানার মজুরদের প্রভুভক্তি প্রভৃতি আমাকে নিরাপদে কূলে পৌঁছিয়ে দিলে। ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ।

আমাদের পরিবারে একটি নৈতিক দুর্ঘটনা ঘটল এর পরেই। বাবার ফার্ম দেউলে হয়ে গেল। তাঁর ব্যবসা বাঁচাতে পারলাম না বটে, তবে অনেক পরে আমি তাঁর পাওনাদারদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম।

যন্ত্রের সংগে আমার প্রথম পরিচয়

একদিন আমি দেখলাম ভিয়েনা সহরের একটি নামজাদা ফার্মের কাছে মাল সরবরাহের যে চুক্তিতে আবদ্ধ আছি, তদনুযায়ী মাল সরবরাহ করা অসম্ভব। চুক্তি অনুযায়ী আমি তাদের চামড়ার সোলওয়ালা ক্যানভাসের জুতো সরবরাহ করতে বাধ্য ছিলাম, সে ধরণের জুতো আমাদের অঞ্চলে তখনও কিন্তু কোন কারখানাতেই তৈরি হ'ত না।

ভেবেছিলাম আমার স্বল্প অবকাশে কারখানার মজুরদের শিখিয়ে দেব এধরণের জুতো তৈরি করতে। কিন্তু অতখানি শিক্ষকতার শক্তি আমার মধ্যে যে নেই, সেটাই আমি বুঝি নি।

আমার সুনাম পুনরায় যায় যায় হয়ে উঠল—এবার বিপদ আরও বেশি, খরিদ্দারকে চুক্তিমত মাল সরবরাহ করতে না পারা যে কোন ফার্মের পক্ষেই অপযশের কারণ। অসম্ভব কোন ঘটনা ব্যতীত এবার উদ্ধারের উপায় ছিল না। অবশেষে কি যন্ত্রের শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে? টলস্টয়ের রচনাবলী আমাকে এ সময় সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপণে অনুপ্রাণিত করে দিল। আমার প্রতিবেশী ব্যবসায়িগণ এ সময় যন্ত্রের মহিমা কীর্তন করে যেত, যেমন অস্ট্রিয়ান সেনাপতিরা বিজয়গর্বে যুদ্ধজয়ের গল্প করে।

জুতো তৈরির একটা অত্যন্ত শক্ত অংশ ছিল জুতোর তলার দিকে আবশ্যকমত চামড়া কেটে নেওয়া। আমি একটা দপ্তরীর কাগজ-ছাঁটাইয়ের কল কিনবার মনস্থ করলাম, ঠিকমত ফলা পরিয়ে নিলে এই যন্ত্রদ্বারা আমি আশানুরূপ পরিমাণে চামড়া কেটে নিতে পারবো, হাতে ওরকম করার খরচও বেশি, সময়ও নেয় অনেক। কিন্তু সে কল চললো না। যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে গড়ে নিতে হবে দেখা গেল।

কিন্তু এ জিনিসটা যত সহজ ভেবেছিলাম, ততটা সহজ হয়ে উঠল না। আমাদের কারখানার বৈদ্যুতিক শক্তির যন্ত্রপাতি বসানোর চেয়েও এতে অধিকতর কৌশল ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। আমাদের অঞ্চলে সে সময় উপযুক্ত যন্ত্রজ্ঞ মিস্ত্রীর বড়ই অভাব ছিল, তার কারণ সভ্যতার কেন্দ্র থেকে জিলুন্ ছিল বহুদূরে।

নতুন যন্ত্রের সাফল্য আমার মন থেকে যন্ত্রের প্রতি বিরুদ্ধ ধারণা দূর করে দিলে। জুতোর সোল তৈরি সমস্যার সুসমাধান এখনও করে উঠতে পারি নি। প্রাহা সহরের ভিনোরাদি উপকণ্ঠে জনৈক

জুতো ব্যবসায়ীর ফার্ম ছিল, সে একখানা জুতা ব্যবসা সংক্রান্ত পত্রিকাও প্রকাশ করত। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার সমস্যা তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে আমায় কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ দিল এবং জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তার যেটুকু জানা ছিল আমায় বললে।

কিন্তু সে উপদেশের সংক্ষিপ্তার্থ যেটুকু, তা আমাদের অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও জানত। অনেকবার তাদের মুখে সে সব কথা শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েচে। জার্মানিতে কে নাকি জুতো তৈরির কল আবিষ্কার করেচে এবং সে কলে জুতো তৈরি চলছিলও সেখানে। তবে ব্যাপার এই, কলের তৈরি জুতো অপেক্ষা হাতে সেলাই জুতোর চাহিদা বাজারে অনেক বেশি, সুতরাং বর্তমানে সে কল অচল অবস্থায় এসে পেঁছেচে।

প্রাহা রওনা হওয়ার সময়ে আমার পরণে ছিল একটা আলপাকার সুট। পায়ে ছিল ক্যানভাসের জুতো। সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ পর্যন্ত ছিল না। লোকের কথা অগ্রাহ্য করে প্রাহা থেকে গেলাম ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মেনে। এখানকার এক ফার্ম থেকে কিছুদিন পূর্বে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম যে তারা জুতো তৈরির কল বিক্রী করবে। তাদের ঠিকানা না জানায় একজন সহৃদয় পুলিশম্যানকে জিগ্যেস করতেই সে ব্যক্তি আমায় মোয়েলস এ, জি, কোম্পানীর বাড়িটা দেখিয়ে দিলে। স্পন্দমান দুরু দুরু বক্ষে এই ধনী ব্যবসায়ীদের প্রাসাদোপম আপিসে প্রবেশ করলাম বিশেষ সংকোচ বোধ হ'ল এই ভেবে যে আমার পোষাক পরিচ্ছদ পারিপাট্যহীন এবং জার্মান ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যৎসামান্য।

যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো তাতে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি মাত্র সেলাইয়ের ও ছিদ্র করবার কল খুঁজতে এসেছিলাম, এখানে এসে দেখি বহুবিধ প্রকারের জটিল যন্ত্রপাতির অপার সমারোহ। জুতো তৈরির সবরকম বিভাগীয় কার্যের যন্ত্র এখানে রয়েচে, তুচ্ছতম কোন কার্যের কথাও যন্ত্রনির্মাতার মন থেকে বাদ পড়ে নি। কিন্তু হায়! এসব যন্ত্র বাষ্পশক্তির দ্বারা চালিত। আমার কারখানায় বাষ্পচালিত এঞ্জিনের কোন বন্দোবস্ত নেই বা অদূর ভবিষ্যতে তা কারখানায় বসাবার ধারণাও করতে পারি নে। যন্ত্রের মূল্যও ছিল আমার ক্রয় করবার ক্ষমতার বহির্ভূত।

সুতরাং ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে আমি সামান্য কয়েকটি হাতে চালান কল, যেমন একটি ভাল সাঁড়াশি, এক জোড়া চামড়া পাঞ্চ্ করবার কল ও একটি ম্যাগনেটিক হাতুড়ি ক্রয় করি।

ফিরবার পথে ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল, কিন্তু খরিদ্দারের সঙ্গে চুক্তি বজায় রাখবার ভাবনায় নয়। সে ভাবনা আমার কাছে এমন নিতান্ত হাস্যকর ও সামান্য বলে মনে হচ্ছিল— আসল ভাবনার বিষয় ছিল ফ্রাঙ্কফোর্টের কারখানার বিরাটকায় ইস্পাতের দৈত্যগুলি। স্বচক্ষে এ বিরাটকায় দৈত্যদের প্রত্যক্ষ করে এসেচি, যারা প্রত্যেকে আমার চুক্তির পরিমাণের হাজারগুণ বেশি মাল সরবরাহ করতে সমর্থ। জগতে যে এই বিরাট শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেচি, আমার কাছে এই ছিল একটা গর্বের বস্তু, একটা কাজের মত কাজ, যদিও ভালভাবেই জানতাম এ দৈত্যকে আমার কারখানায় নিয়ে গিয়ে কাজে লাগান বর্তমানে অসম্ভব।

আমি সে সময় মানুষের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতাম, সেই মতবাদ আমার চিন্তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার বিশ বৎসরের তরুণ জীবনে এ মতবাদ গড়ে উঠেছিল টলস্টয়ের রচনাবলীর ও স্বাতোপ্লুক্ চেকের কবিতার প্রভাবে (এ সব কবিতার অনেকগুলি আমার মুখস্থ ছিল), চেকজাতির ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকগুলির দ্বারা কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি, আমার চতুষ্পার্শ্বের প্রতিবেশীদের মুখর আলোচনা দ্বারা।

আমি সে সময় উগ্রসমাজতান্ত্রিক মত পোষণ করতাম, তার সঙ্গে কম্যুনিজম্-এর একটু ছোঁয়াচ ছিল। বর্তমান সময়ের ধনতান্ত্রিক সমাজ শুধু স্বার্থান্বেষী দুষ্ট লোকদের উপযোগী—সে সমাজের একদিকে শোষণকারীর দল, অন্যদিকে অলসের ভিড়। টলস্টয়ের প্রচারিত সরল জীবনযাপন প্রণালী হয়ে দাঁড়াল আমার জীবনের স্বপ্ন।

আমার দৈনিক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, যেদিন আমার সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যাবে এবং আমি নিজে দু'পয়সা উপার্জন করতে পারব—একটু জমি নিয়ে চাষবাস করব, নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই চাষ থেকে উৎপন্ন হবে।

আমার মতে কৃষকদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্যেই সহরগুলির সৃষ্টি এবং মজুরদের ক্রীতদাস করে রাখবার জন্যে কারখানাগুলির সৃষ্টি—পুঁজিবাদীরা সমগ্র সমাজের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর দ্বারা নিজেরা উপকৃত হচ্ছে।

যদি আমার কোন কোদাল বা কৃষির যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তবে ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার "টয়েল" পুস্তকের নির্দেশানুযায়ী সেটা কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট কারখানায় তৈরি হওয়া উচিত।

নানারকম চিন্তা করতে করতে ট্রেনে চলেছি জার্মানী থেকে ফিরবার পথে। রেলগাড়ির জানালা দিয়ে রাইন নদীর তীরবর্তী অপরূপ ভূমিভাগ তার সৌন্দর্যময় দৃশ্যপট আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েচে, যে দিকে চাই শুধু কলকারখানা, তার মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় জুতোর কারখানা। চারিধারে মজবুত করে তৈরী বাসভবন, একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, উন্নতিশীল জাতির কর্মরত হস্তের চিহ্ন সর্বত্র বিদ্যমান।

রাইন নদীর বক্ষে বড় বড় স্টীম-লঞ্চগুলি মাল বোঝাই বজরা টেনে নিয়ে চলেচে, আমি মনে ভাবছিলাম জীবনযাত্রার কত ধরণের উপকরণ ওরা বইচে। এই অসীম ঐশ্বর্য ও প্রগতির মূলে আছে ঐ ইস্পাতের দৈত্যগুলির শক্তি, যারা মানুষের আদেশে সভ্য ও প্রগতিশীল জীবনযাত্রার উপকরণ চোখের নিমেষে যোগাচ্চে। রাইন বক্ষের জাহাজগুলি সমুদ্রাভিমুখে বহন করে চলেচে সেই সব দ্রব্যের বাড়তি অংশ, দেশের অধিবাসিবর্গের তাবৎ অভাব মিটিয়ে যা উদ্বৃত্ত রয়েচে—বিদেশের সেই সব দ্রব্যের সঙ্গে ওদের বিনিময় ঘটবে, যা এদেশে পাওয়া যায় না। স্তূপাকার দ্রব্যজাত প্রত্যেক জাহাজের খোলে সঞ্চিত, আর সেই জাহাজের সারি চলেচে রাইন নদী বেয়ে মুক্ত সমুদ্রের পানে।

তখনই সেই রেলগাড়িতে বসে আমার পিতার ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল কারখানার চিমনি সম্বন্ধে—আমি যেন দেখতে পেলাম বড় বড় কারখানার ইস্পাতের যন্ত্র-দৈত্যদের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে, আমার আদেশে তাদের প্রত্যেকটি আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করা চলেচে, আমি তাদের উৎসাহিত করচি পরিশ্রমের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

কিন্তু আমার মধ্যের সোস্যালিস্ট মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ধনতান্ত্রিক মনোভাব তখনই দূরে করে দিলে, আমার বর্তমান মনোভাবকে পুঁজিবাদী ও ক্রীতদাসের মালিকের মনোভাব বলে নিন্দা করলে। না, আমি ঘৃণিত ধনতান্ত্রিক হতে চাই না, সামান্য কিছু আয় করে আমায় চাষের জমি কিনতে হবে, চাষবাস করতে হবে।

কিন্তু সোস্যালিস্টকে তাড়ালেন আমার খুড়োমহাশয় এবং আমার কারখানার অগণিত মজুরেরা। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম এবং প্রতিদিনের সামান্য অথচ বিধিবদ্ধ উপার্জন তাদের ক্ষুদ্র গৃহগুলিতে যে শ্রীছাঁদ এবং পারিপাট্য আনয়ন করেচে তা লক্ষ্য করতাম।

যখনি আমার অসাফল্য বা অক্ষমতার বিষয় নিয়ে বাজারে গুজব উঠতো তখন এই সমস্ত লোক আমার মুখের দিকে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে সংকুচিতভাবে চলে যেত, তাদের মুখে চোখে স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠত, বাটা কি ব্যবসা চালাতে পারবে? সব মাটি করে ফেলবে না তো? ওদের সুখসম্পদ এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত আমার সাফল্যের উপর নির্ভর করচে—শুধু আমার একার স্বার্থই যে এর মধ্যে জড়িত তা নয়।

এই সব হতভাগ্যদের বর্জন করা কি সংগত হবে? অনাগত ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আশাপথ চেয়ে কি খেয়ে বেঁচে বসে থাকবে এরা?

আমি কিভাবে কারখানার মালিক হলাম সে ঘটনা এবার বলব। বাড়ি এসে মেসার্স কিট্‌স্ কোম্পানীর প্রেরিত কতকগুলি পুস্তিকা হাতে পড়ল। বরাবরই ভেবে এসেচি, এই যন্ত্রদৈত্যদের জগতে নিশ্চয় কোথাও কোন বামনের অস্তিত্ব বর্তমান, যে আমার পরিত্রাণ আনয়ন করতে পারে। কিট্‌স্ কোম্পানীর ক্যাটালগের মধ্যে সেই বামনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হ'ল—সে বামন অন্য কিছু নয়, ছিদ্র করবার একটি যন্ত্র যেটি আমার মজুরদের তৈরি মালের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে আমার চুক্তিমত মাল সরবরাহের পথ সুগম করে দিলে।

এই সব ক্ষুদ্র যন্ত্রের ব্যবহার আমি নিজে ভাল করে অভ্যাস করে আমার মজুরদের শিক্ষা দিলাম। মজুরদের সংঘবদ্ধভাবে এসব বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করলাম। এই শিক্ষা এবং যান্ত্রিক-জ্ঞান-সম্পন্ন উন্নত ধরণের মিস্ত্রির নিয়োগ দ্বারা আমার কারখানার পেছনে বিপুল মূলধন বর্তমান, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হ'ল আমার এই ক্ষুদ্র কারখানাটি।

আমার হিসাবের খাতায় খরচ ও দেনার অঙ্কের অপেক্ষা জমার অঙ্ক হু হু করে বেড়ে চললো। আমার তরুণ বয়সের স্বপ্ন যে ক্ষুদ্র কৃষিকার্যোপযোগী জমি, তা কিনেও অনেক টাকা জমার অঙ্কে বাঁচে, এমন কি আমার এবং আমার ভাইবোনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা হাতে জমতে সুরু করল।

আমার এ পরিশ্রম অর্জিত সঞ্চয়ের স্বপক্ষে আমার অধীত জ্ঞান ও লোকমুখের আলোচনা আমাকে প্রেরণা দান করত, পুঁজিবাদীদের বিপুল মূলধনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার ক্ষুদ্র কারখানার অস্তিত্বটুকু বজায় রাখতে হবে। আমার ভ্রাতা-ভগ্নীর সুনাম বজায় রাখতে হবে। আমার পরিশ্রমের ওপর আমার ও তাদের খাদ্যগ্রাস নির্ভর করছিল যতক্ষণ, ততক্ষণ আমার বিবেক ছিল দোষমুক্ত নির্মল।

কিন্তু এখন আমার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে ওজর কেটে গেল। কোন্ দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমি নিজের ধনতান্ত্রিক মালিকানা সমর্থন করবো? তবে যতক্ষণ অবশ্য আমি নিজে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটি, অলসের মত বসে অপরকে না খাটাই, যতক্ষণ আমি বেকার লোকদের কাজ দিই, সমাজের প্রয়োজনানুযায়ী জিনিস সস্তায় সরবরাহ করি এবং যখন আমার খরিদ্দারেরা জিনিস কিনে সন্তুষ্ট হচ্চে—ততক্ষণ আমি আমার মালিকানা সমর্থন করতে না পারি এমন নয়। সমাজের সেবা কি আমিও করচি না?

কিন্তু অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত তখন, যখন কাজের অবকাশে আমি শিক্ষিত ও সভ্যসমাজে বক্তৃতা দেবার জন্য যেতাম, যখনই বই বা খবরের কাগজ হাতে করতাম। যেন চারিদিক থেকে রব উঠতো—ঘৃণ্য পুঁজিবাদী, ক্রীতদাসের মালিক!

ঠিক যে আমার নামই তারা উচ্চারণ করতো তা নয়। আমার মনের এ একটা আইডিয়াল মাত্র—

আমার মনের মন্দিরে এ একটা আদর্শবাদ ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করছিল। আমার কর্মের নবতর ভিত্তি এই আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত--যদিও আমার পুরানো সোস্যালিস্ট মনোভাবের সঙ্গে বর্তমান আদর্শবাদকে যথেষ্ট লড়তে হয়েছিল।

আমার বন্ধুরা বলতেন আমার কারখানা ছোট, সুতরাং দুষ্ট পুঁজিবাদী ও শোষকের দলে আমি পড়ি না। ওদের মত নরপিশাচ নই আমি। আখ্যায় অভিহিত করলে আমি মোটেই সুখী হতাম না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবসায় সম্বন্ধে আমি পড়াশুনো ও চিন্তা যথেষ্ট করেচি। যখনই এ নিয়ে ভেবেচি, তখনই আমার মনে পড়তো আমার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে ব্যবসা করার কথা। যখন সব রকম কাজের আলোচনাই হ'ত শুধু--কিন্তু হ'ত না কোন কাজ।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবসার বহু দোষ আমি প্রত্যক্ষ করেচি--বেশি লোক নিয়ে তো দূরের কথা--দুই ভাইয়ের সম্মিলিত ব্যবসায়ের মধ্যেও অনেক গলদ আছে। আমার দ্বারা অন্তত, ওভাবে ব্যবসা সম্ভব নয়। যদি আমার কথা শেষ পর্যন্ত না দাঁড়ায়, এক্ষুনো আমি আমার ভাইকে নিয়েও ব্যবসায় নামতে রাজি নই। আমি এই মর্মে আমার ভাইয়ের সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট করলাম--তাতে এই সর্ত রইল যে আমার হুকুম এ ফার্মে সকলকে মেনে চলতে হবে। আমার ভাইয়েরও সম্মতি পাওয়া গেল।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, কোম্পানীতে অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত, সে কোম্পানীর ব্যবসা কিভাবে চলে।

কিন্তু এ অবস্থায় আমি জার্মান ও আমেরিকান বিরাট যন্ত্রগুলি ক্রয় করে কারখানায় নিয়োগ করবার অর্থ কোথা থেকে পাই' এ সমস্যার কোন সমাধান করে উঠতে পারলাম না। এর একমাত্র উপায়, আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকা। অর্থাৎ আমার পূর্বেকার অনভিজ্ঞতার ফলে যে অবস্থাকে শোষক ও পুঁজিবাদীর অবস্থা বলে ঘৃণা করে এসেচি--আমায় যদি আমার দেশ ও জাতিকে সেবা করতে হয়--তবে আমাকে সেই কারখানার মালিকই হতে হবে। এ ছাড়া অন্য উপায়, সমস্যার অন্যবিধ সুসমাধান আমার নজরে পড়ল না।

মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পরেই এল আট ঘোড়ার জোরের স্টীম-এঞ্জিন ইস্পাতের কাঠামোতে গড়া, শূন্য সব মজুর এবং আমার প্রথম কারখানা ঘর ও চিমনি, বহুদিন আগে বাবা যার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও সে চিমনি পাতলোহার তৈরি মাত্র, তবুও গোড়াতে এই যথেষ্ট।

১৯০৪ সালে কারখানার তিনটি লোহার চিমনি ধূম্র উদ্গীরণ করতো। প্রথম প্রথম আমি ছোট, পুরোনো স্টীম-এঞ্জিন কিনতাম, তার দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যেত না--এবং শীঘ্রই উন্নততর স্টীম-এঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। আরও বড় একটা কারখানা ঘরের এবং যন্ত্রপাতির দরকার হয়ে পড়ল।

সম্মুখে বহু নবতর সমস্যা, যার সমাধান হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন--এ অবস্থায় আমি শুধু আমার নিজের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে থাকতে পারলাম না। ইউরোপের দেশসমূহ ভ্রমণের পরে আমার অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট বলে মনে হ'ল না। সুতরাং সেই বৎসরে আমি আমেরিকায় রওনা হই, সঙ্গে নিলাম কারখানার তিনজন তরুণ মজুর।

আমেরিকায় অনেক নতুন জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম এবং সাধারণ মার্কিন নাগরিকের ব্যবহার ও চালচলন আমাকে মুগ্ধ করলে। যে কাজই সে করুক না কেন, তার আভিজাত্য নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এ ধরণের তুচ্ছ সামাজিক সমস্যার সমাধান করে রেখেছেন দু'পুরুষ আগে তাদের পিতামহেরা।

আফিসের মোটা বেতনের কর্মচারীর পুত্র নির্বিকারভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র বিক্রী করছে, অনেক সময় লক্ষপতির পুত্রও। খোলার ঘরের ভাড়াটের ছেলের একচেটে নয় এ কাজটা। সৌখীন চালচলনের ভদ্রলোক ছাত্র রাস্তাঘাটে চোখেই পড়ে না।

সব লোকের সার্টের আস্তিন গুটানো এবং সদা প্রফুল্লমুখে কর্মঠ ব্যক্তির হাস্য। ছেলের বয়স ছ' বছর হ'লেই সে নিজের উপার্জন নিজে করে নেবার অধিকারী হয় এবং সে যে কাজে নামবে, তার মতই চরম বলে মেনে নেওয়া হয়। এই স্বাধীনতা বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয় বলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, বাল্যকাল থেকেই আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তার পিতার ঐশ্বর্য তার স্বাধীন বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে না, প্রথম থেকেই দেশের যে কোন নাগরিকের সমকক্ষ।

আমি ব্যবসাদার, তুমিও ব্যবসাদার, আমাদের পরস্পরের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ নির্ভর করবে আমরা ব্যবসায়ে কি রকম উন্নতি করতে পারি তার ওপর।

পিতার মুখে আনন্দের হাসি দেখা দেয় যখন ছেলে যে কোন উপায়েই হোক একটি ডলার যেদিন উপার্জন করে ঘরে আনে, পুত্রও তার নিজের উপার্জনে গৌরব অনুভব করে। প্রত্যেক পরিবারগত এই মনোভাব সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে।

মিঃ মাইল্স্ একদিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কারখানা দেখিয়ে আমায় বললেন—"ভেবে দেখ লোকটা কেমন তুখোড়; এত টাকা রোজগার করে যে প্রতি বছরে ট্রেজারিতে দশলক্ষ ডলার ট্যাক্স দিয়ে থাকে।" ঐ উক্তির মর্ম আরও ভাল করে বোঝা যাবে একথা জানলে যে এই মিঃ মাইলসের নিজের ব্যবসায়ে লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক ছিল অনেক বেশি এবং দেনায় তিনি ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলেন। তবুও তিনি পাশের কারখানার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত তো ছিলেনই না বরং আনন্দিতই হয়েছিলেন, অর্থ উপার্জনের ও ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের ন্যায্য অধিকার যে প্রত্যেকেরই আছে, এ সম্বন্ধে কোন মার্কিন নাগরিক বিরুদ্ধমত পোষণ করে না।

এ ধরণের সন্দেহ আমাদের দেশের সমাজে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বিদ্যমান ছিল, এর মূলে ছিল পুরাতন স্লাভোনিক আইন, যাকে দূর করতে রোমান আইনের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। স্লাভোনিক আইনানুসারে প্রত্যেকে তার পরিশ্রমলব্ধ শস্য সাধারণ শস্য ভাণ্ডারে জমা করতে বাধ্য ছিল। সাধারণ শস্যভাণ্ডার থেকে জনৈক গ্রামবৃদ্ধ প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী শস্য বণ্টন করে দিতেন, পরিবারের মর্যাদা বা গুণের উপর এর পরিমাণ নির্ভর করতো না, বরং গ্রামবৃদ্ধের খেয়াল-খুশি বা বিবেচনার উপর নির্ভর করত অনেকখানি। এই হচ্ছে পুরাতন পারিবারিক সমাজতন্ত্র। এই নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে অন্তরে বিদ্যমান, এই শ্রদ্ধা জাগ্রত রেখেছিল রুশীয় লেখকদের রচনা, বিশেষত টলস্টয়ের। এই উর্বরা মাটি কার্ল্ মার্ক্সে প্রবর্তিত নব্যসমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও পরিবর্ধনের সহায়ক ছিল। কার্ল্ মার্ক্সের নব্যসমাজতন্ত্রবাদ পুরাতন স্লাভোনিক সমাজতন্ত্রেরই বিস্তৃততর সংস্করণ মাত্র।

যন্ত্রপাতি ও কর্মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে কোন নতুনতর ব্যাপার আমি আমেরিকায় লক্ষ্য করি নি। এ ব্যাপারে আমার বিস্ময়ের কারণ ছিল না, কারণ মার্কিন যন্ত্রনির্মাতাদের বড় বড় ফার্মের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে আমি সর্বদা খোঁজ রাখতাম কে কোন নতুনেতর যন্ত্র নির্মাণ করছে। ওরা নতুনের মধ্যে করেছিল এই যে বিভিন্ন যন্ত্রাদি কারখানায় বসাবার প্রণালী সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ও সুসংহত ছিল।

আমি এক বছরের মধ্যে বহুবার যন্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা বদলে শেষে একই প্রণালী আবিষ্কার করেছিলাম নিজে থেকেই।

আমেরিকার শ্রমজীবীদের কর্মকুশলতা বিস্ময়কর। যন্ত্র কিনলেই হয় না, যন্ত্র কাজে লাগাবার মত শক্তি ও কৌশল জানা চাই। আমরা যে কলে যে পরিমাণ কাজ আদায় করে নিতাম তার চেয়ে অনেক বেশিগুণ জিনিস উৎপাদন করে নিত আমেরিকার মজুরেরা।

যন্ত্রের কাজ ভাল করে শিখে নেওয়ার জন্যে আমি কারখানায় মিস্ত্রির কাজে ভর্তি হ'লাম। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম মুখে মজুরদের বিভিন্ন কলকব্জার কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিতে যাওয়ার চেয়ে হাতে কলমে কাজ করে দেখিয়ে দেওয়ার উপকারিতা কত বেশি। তা ছাড়া আমি আর একটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলাম এই ধরণের বিরাট যন্ত্রচালনায় মনুষ্যদেহ কি পরিমাণে পরিশ্রান্ত হয়। আমার বিশ্বাস ছিল আমি একজন পাকা কাজের লোক যে কোন ধরণের জুতো তৈরির কল আমার হাতে নিপুণভাবে চলবে, নিজের কর্মক্ষমতায় এই অগাধ বিশ্বাস আমেরিকায় আমার যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

যখন ওরা আমায় জিগ্যেস করলে কোন কাজ আমি ভাল করতে পারি তখন আমি সগর্বে বললাম আমি সবজান্তা লোক, সব কলই ভালভাবে চালাতে পারি। কারখানার ম্যানেজারের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল এবং তিনি আমায় জানালেন আমাকে তাঁর দরকার হবে না। বহুদিন পর্যন্ত ম্যানেজারের এ ব্যবহারের অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু কয়েকবার মিস্ত্রির কাজের প্রার্থী হয়ে হতাশ হবার পরে এবং দু'একটি কারখানায় কল চালানোর পরীক্ষায় অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়ার পরে বুঝেছিলাম জীবনে আমি কোন দিনই সে ধরণের কর্মক্ষম ও কুশলী মিস্ত্রি হয়ে উঠতে পারবো না - আমেরিকার কারখানাসমূহে যে দরের কর্মকুশলতা পরিণতি প্রাপ্ত হয়েচে। এখন আমি বুঝতে পারি আমার সদম্ভ উক্তিতে কারখানার ম্যানেজার কেন ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন।

বাট্টা বলে জনৈক মজুরের সঙ্গে একত্র বাস করতাম। সে লিন্ সহরে একটা ছোট ও বাজে কারখানায় আমায় একটি কাজ জুটিয়ে দিলে, তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আমার ইচ্ছা যে নিজের পায়ে দাঁড়াই, কিন্তু কাজ কিছুতেই জোটে না। যাদের চাকরী ছিল, তারা উঠতো সকাল সাতটায়, কিন্তু বেকারের দল ভোর পাঁচটায় উঠে কারখানার ফটকে হাজির হ'ত, যাদের বাড়ি কারখানা থেকে দূরে, তাদের উঠতে হ'ত আরও সকালে।

যখন আমি জামার আস্তিন গুটিয়ে (মার্কিন আভিজাত্যের চিহ্ন) অন্য সব মজুরদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে মেসিনে কাজ করতাম, তখন আমি নিজেকে কতই ভাগ্যবান না বিবেচনা করতাম। পাশেই কারখানার সর্দারমিস্ত্রি দাঁড়িয়ে আমার হাতের কাজ পরীক্ষা করত, আমি সে কাজের উপযুক্ত কিনা দেখত। আমার ভাগ্যে কি আছে তা জানবার জন্যে সর্দারের মুখের দিকে চাইবার পর্যন্ত সাহস হ'ত না আমার।

হঠাৎ অন্যান্য কর্মপ্রার্থীদের কলহাস্য শুনতে পেতাম। তারা আমার পেছনেই আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আমি বাতিল হ'লেই তারা নিজেদের পরীক্ষা দেবে। অবিশ্যি তাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার হ'ত না।

দিনের মধ্যে কখন কখন কুড়িবার আমায় এ ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়েচে, সমস্ত সপ্তাহে তার ছ'গুণ বেশি। মনে ক্রমশ অবসাদ দেখা দিল। শ্রমিকের মনোবৃত্তি আমার আয়ত্ত হ'ল।

আমেরিকা থেকে টাকা রোজগার করে আমি ইউরোপে আমদানি করতে চাইনে—আমি চাই মার্কিন শ্রমিকদের সমকক্ষ হ'তে।

চাকরির সন্ধানে ফিরবার সময় একদিন প্রতিজ্ঞা করলাম, চাকরি না জোগাড় করা পর্যন্ত আমি উপবাসে থাকবো। তখন আমি চাকরি পেয়ে গেলাম।

ভবঘুরে থেকে হয়ে গেলাম বড় লোক এক মুহূর্তে। কারণ আমেরিকায় কর্মই আভিজাত্যের চিহ্ন। আমার হাত দু'খানাতে ফোস্কা পড়ে গেল বটে কল চালাতে চালাতে, কিন্তু নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস আবার ফিরে এল।

> [টমাস বাটা এইখানেই কর্মারম্ভ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী শেষ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁর চিন্তা ও বক্তৃতা প্রকাশ করলাম. এগুলির মধ্যেই কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর আদর্শের স্বরূপটি নিহিত রয়েছে।]

টমাস বাটার জীবনের গভীরতম স্তর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মানুষ হিসাবেই কি বা ব্যবসাদার হিসাবেই কি এই ব্যক্তি বিপদ ও বাধাকে জয় করেই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি. উনিশ বছর মাত্র বয়সে টমাস বাটা কি ভাবে ব্যবসার বিপদ এবং নিজের জীবনের ব্যক্তিগত বিপদকে জয় করেছিলেন। এই পরিবর্তনের মূল কথাটি কি? মূল কথাটি এই যে ব্যবসা সাদাসিদে ঘরোয়া ব্যাপার নয়, সমাজের সেবার ওপর এর প্রকৃত সাফল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করচে। বাটা কথার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন প্রচার করেন নি; করেছিলেন কার্যের মধ্যে, চিরদিনই কথার চেয়ে কাজ বড় ছিল তাঁর কাছে। সে সময় তাঁর কারখানায় 'বাটোভকি' নামে এক ধরণের সস্তা, হাল্কা. নেকড়ার জুতো তৈরি হ'ত, সে জুতো ধনী দরিদ্র সকলেই কিনতে পারতো· এত সস্তা।

জীবনের সে সময়ে টমাস বাটার মনোভাব কিরূপ ছিল. এবিষয়ে তিনি কোথাও কিছু বলেন নি। এই জ্ঞানপ্রবণ, প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ যুবকের মন সে সময় আত্মার সমস্যা সমাধানে বিনিদ্র রজনী যাপনে ব্যস্ত। তাঁর মৃত্যুর পরে সে বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তবে কি ভাবে সমস্যার সমাধান ঘটেছিল তা আমরা জানি না। কিসে তাঁকে রাশিয়ান দর্শনবাদের অনাড়ম্বর জীবনযাপনের ভক্ত থেকে দৃঢ়চেতা কর্মবীরে পরিণত করেছিল? সামান্য কৃষকের ভূমিখণ্ডের স্বপ্ন থেকে কিসে তাঁকে দুনিয়া জোড়া ব্যবসার মালিক করে তুলেছিল, এ সবের উত্তর আজ কে দেবে? আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর যে চিন্তাধারা ও রচনা প্রকাশ করব, তাতে দেখা যাবে পরিণতবুদ্ধি পাকা ব্যবসাদার টমাস বাটাকে, কর্মকুশল ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে যিনি সব রকম বিপদের সঙ্গে যুঝেছিলেন।

টমাস বাটার মনে কর্মের স্বয়ং পরিচালনার আদর্শ এল কোথা থেকে? তাঁর বক্তৃতাবলীর মধ্যে আমরা আংশিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর পাই। "আমেরিকাতে আমি সর্বাপেক্ষা পছন্দ করতাম ধনী ও শ্রমিকের সম্বন্ধটি। আমিও মনিব, তোমরাও মনিব; আমি ব্যবসাদার, তোমরাও ব্যবসাদার। আমি চাই এই আদর্শ সম্বন্ধটি জিল্‌ন্‌ সহরের ধনী ও শ্রমিকদের মধ্যেও স্থাপিত হোক। আমি চাই, আমাদের মধ্যে কেউ ছোট বড় থাকবে না।"

কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধু সদিচ্ছা ও ভাবপ্রবণতা নিয়ে কাজ চলে না। এ সকল গুণে প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে গুরুতর বাধাবিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিপদ সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত হয়েছিল ১৯০৮ সালে তাঁর দাদার মৃত্যুর পরে। তরুণ টমাস বাটার হাতে কারখানার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও পরিচালনার ভার এসে পড়ল এসময়ে।

সঙ্গে সঙ্গে এল মহাযুদ্ধ। পরে আমরা দেখতে পাব, বাটার সম্পত্তি মহাযুদ্ধের পরে কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরেই এই সৎ ও কর্মী ব্যক্তি সর্বনাশ ও অসাফল্যের মুখে এগিয়ে আসেন, যুদ্ধেরই দরুন। যুদ্ধের পূর্বে বাটার কারখানার ছিল দু'টি বাড়ি, যুদ্ধের পরে দাঁড়াল চারখানা বাড়ি, যন্ত্রপাতি যা ছিল, শান্তির সময়ে দেশের জুতো সরবরাহ সে সব দিয়ে হয় না। আর একটি বিপদ দাঁড়াল, যে দেশ যুদ্ধে বিজিত, তাদের যে জুতো সরবরাহ করা হয়েছিল, সেগুলির মূল্য দেওয়ার শক্তি রইল না। এর ওপর চাপলো নবনির্মিত রাষ্ট্র প্রবর্তিত বিপুল করভার। জমার অঙ্কে রইল কেবল কতকগুলি সৎ ও কর্মকুশল ব্যক্তি, যুদ্ধের সময়ে যাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখা হয়েচে খাদ্য ও অর্থ দ্বারা। এই মাত্র মূলধন নিয়ে টমাস বাটা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে গেলেন। দুঃখ বাধার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান আবার সুরু হ'ল এবং অবশেষে কর্মের স্বয়ংপরিচালনত্ব সম্বন্ধে তাঁর যৌবনের স্বপ্ন সাফল্যের পথে পা বাড়াল, কিন্তু এই সংগ্রামের ফলে মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়তর হয়ে উঠল। এখন দেখা যাক বাটার রচনা ও বক্তৃতাবলীর মধ্যে এই অভিযানের কি সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পথের সন্ধানে

জ্লিন্ সহরে প্রথম সামরিক অর্ডার কিভাবে এল। মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সহরের প্রধান শিল্প ছিল ঘরোয়া ব্যবহারের উপযোগী চটি বা পাৎলা ক্যানভাসের জুতো তৈরি। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে ব্যবসায়ীরা বুঝলে এ শিল্প আর কার্যকরী হবে না, সুতরাং জেলার প্রধান সহর হ্রাদিস্ত্ থেকে যে মুহূর্তে খবরটা আমি আনলাম, তখন থেকে সব কারখানা কাজ বন্ধ করে দিলে।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জানুস্টিক যখন যুদ্ধে যোগদানের আদেশ ঊর্দ্ধতন কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হন, আমি সেখানে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম। তখনি মোটর ভাড়া করে জ্লিন্ সহরে এসে পোঁছলাম। এই আদেশ ছিল অত্যন্ত কড়া, প্রত্যেক নির্বাচিত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে।

পরদিন আমি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অট্রোকোভিচ্ যাত্রা করি। হুলিন স্টেশনে আমি এই ট্রেন বদলে ভিয়েনাগামী এক্সপ্রেস ধরবার ইচ্ছা করলাম, সেখানে পোঁছে সৈন্যদের ব্যবহারোপযোগী সামরিক বুটের অর্ডার আমায় যোগাড় করতেই হবে, আমাদের সহরের অর্থনৈতিক উন্নতি এমন কি সহরবাসীর জীবিকা নির্বাহের উপায় নির্ভর করচে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত এ সময়ে মূল্যবান।

দুর্ভাগ্যক্রমে অট্রোকোভিচ্ স্টেশনে ট্রেন ধরতে পারলাম না। আমি ঘোড়ার গাড়ি দ্রুতবেগে চালিয়ে হুলিন্ স্টেশনে রওনা হই এক্সপ্রেস ধরতে। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ছিল হুবাসেক বলে একজন শক্ত, মজবুত যুবক। তার ঘোড়া দু'টি ছিল ভাল, ঘোড়ার যত্ন করে তাদের সক্রিয় অবস্থায় কি করে রাখতে হয় সে ভালই জানতো। ঘোড়া যায় আর থাকে, ট্রেন ধরতেই হবে আমাকে। সমস্ত রাস্তা রাশ টেনে চাবুক হাতে গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গাড়ি চালাতে লাগলাম আমরা, আমার দৃষ্টি

নিবন্ধ রইল হাতের ঘড়ির দিকে এবং রাস্তার মাইল-স্টোনের দিকে, ঘোড়া দু'টি অশক্ত হয়ে পড়বার আগে আমাদের হুন্লিন স্টেশনে পৌঁছতে হবে। গাড়ির গাড়োয়ান হুবাসেকও ব্যাপারটি বুঝেছিল। হুন্লিনের চিনির কারখানার কাছে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ধরবার শেষ আশাটুকুও বুঝি বিলুপ্ত হয়। বোধ হয় ঘোড়া দু'টিও বুঝলে তাদের আত্মবলি দেওয়ার সময় এসে গিয়েচে, যার হাতে খেয়ে তারা বেঁচে আছে, এবার তারই কাজে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। অসম্ভব সম্ভব হ'ল তাদের দ্বারা। স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনবার সময় ছিল না। রেলের তারের বেড়া ডিঙিয়ে একটা মালগাড়ির পাশ কাটিয়ে আমি ছুটে গিয়ে এক্সপ্রেস ধরলাম, গাড়িখানা তখন একটু একটু চলতে সুরু করেচে।

ভিয়েনাতে আমি কিছু কাজের ঠিক করতে পারলাম না, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। অন্য অন্য উমেদারেরা যে জবাব পেয়েছিল, আমিও সেই একই জবাব পেলাম। ওরা বললে, দু'টি কোম্পানী যুদ্ধের মাল সরবরাহ করে থাকে, যুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাদের সামরিক বুট সরবরাহের জন্য পনের বছরের কন্ট্রাক্ট করা হয়েচে।

কি মনোদুঃখ নিয়েই ভিয়েনা থেকে জিল্‌ন্ সহরে ফিরলাম! এদিকে বাড়ির ও পাড়ার লোক উদ্বিগ্নচিত্তে আমার আগমন প্রতীক্ষা করচে, তাদের অপেক্ষমান হৃদয়ে এ প্রশ্ন জাগচে, কোথায় তাদের কাজ করতে হবে, কারখানায় না ফ্রণ্টে? বর্তমান কালের যান্ত্রিক যুদ্ধের বিভীষিকা ও সৈন্যদলে যোগদানের আদেশ তাদের মনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায়। আমি সেই থেকে আমার পুরাণো মোটর গাড়ি এল্‌কাতে বা ট্রেনে চেপে প্রায়ই ভিয়েনায় যেতে লাগলাম।

খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে হ'ল আমাকে। আমাদের সহরের কনস্টেবল কার্ভাপিল অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, সে ইতিমধ্যে সহরের লোকদের জরুরী তাগিদ দিতে আরম্ভ করেচে যুদ্ধে যোগদান করতে, ভিয়েনাতে লোকজনের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সৈন্যদলে ঢুকিয়ে নিতে। এ অবস্থায় আশ্চর্য নয় যে আমার সহরের লোকেরা স্টেশনে দুরু দুরু বক্ষে আমার টেলিগ্রামের প্রত্যাশায় থাকবে।

তৃতীয় দিনে আমি ৫০,০০০ হাজার সামরিক বুট সরবরাহ করবার অর্ডার অতি কষ্টে যোগাড় করলাম, কিন্তু তারা যে দর দিলে, তাতে আমার লাভ বিশেষ কিছুই থাকবার কথা নয়। তখন দুপুর বেলা, কয়েক মিনিট পরে ভিয়েনা থেকে এক্সপ্রেস ছাড়বে। সামরিক দপ্তরখানার আশেপাশে একখানাও ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। সুতরাং আমি সার্কুলার রোডের দিকে ছুটলাম। আমি তখন নবীন যুবক, ছুটতেও পারতাম খুব। সার্কুলার রোডে অনেকগুলি ট্যাক্সি ছিল, কিন্তু সবগুলি মিলিটারি অফিসারেরা দখল করে বসে আছে। তখনকার দিনে কারো ক্ষমতা ছিল না সামরিক বিভাগের লোকের অধিকারে মাথা ঢোকাতে যায়। বিপরীত দিকে একখানা খালি গাড়ি যাচ্ছিল, অনেক তর্কাতর্কির পরে সেই গাড়ির গাড়োয়ান আমায় নর্থ স্টেশনে নামিয়ে দিতে রাজি হ'ল। ট্রেন তখন হুইস্‌ল্ দিয়েচে। গাড়ির গাড়োয়ান যে ভাড়া আদায় করলে, সে পয়সায় একটা ভাল ঘোড়া কেনা যেত।

জিল্‌ন্ সহরে সেদিনই আমি মেয়র স্টেপানেকের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানাই, আমি যে অর্ডার এনেচি, স্থানীয় সমস্ত কারখানার মধ্যে তা ভাগ করে দিতে চাই।

সুতরাং এভাবে ৫০,০০০ হাজার সামরিক বুটের অর্ডার, যা মাত্র টি এণ্ড এ বাটা কোম্পানীর নামে হয়েছিল, জিল্‌ন্‌স্থিত সমস্ত জুতোর কারখানার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। প্রত্যেকের

কারখানা লাস্ট্ তৈরি করবার যন্ত্রের পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ পেল। কেননা জুতোর লাস্ট্ তৈরির কল যে কারখানায় কম আছে, তাদের বেশি পরিমাণে জুতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড়ে দেওয়া অসম্ভব। জিলনের লোক এতে ভয়ানক উৎসাহিত হ'ল—এবং তা খুবই স্বাভাবিক। চারিদিক থেকে আমার প্রতি ধন্যবাদ বর্ষিত হতে লাগল, যদিও আমি সে সবের উপযুক্ত ছিলাম না। কেননা, মহাযুদ্ধ তখন সুরু হয়েছে, সামরিক অর্ডার যোগাড় করা কিছু কঠিন কাজ ছিল না—তবে অলসের মত হাত পা কোলে করে বাড়ি বসে থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

এই সব কারখানার মালিকেরা সকলেই তরুণ বয়স্ক ও স্বাস্থ্যবান। সমরক্ষেত্রে কার্যের উপযুক্ত ছিল সকলেই। কারখানার মজুরেরাও সৈন্যদলে যোগ দেবার আদেশ পেয়েছিল। আমিই একমাত্র বে-সামরিক লোক ছিলাম তাদের মধ্যে। সৌভাগ্যক্রমে তারা সকলেই নিরাপদে বিনা দুর্ঘটনায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, এবং দৈবক্রমে আমিই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা যাক্। মহাযুদ্ধ আমার সে ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য দায়ী নয়। আমার নিজের তাড়াতাড়ি করবার ফলেই সে দুর্ঘটনা ঘটে। পরে বুঝেছিলাম, অতখানি ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন ছিল না।

লোকজন আমার প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিল, তাদের কাছে যখন আমি কণ্ট্রাক্ট্ যোগাড় করবার সুসংবাদ জ্ঞাপন করলাম তাদের আনন্দের সীমা রইল না।

যুদ্ধের সময় কাজ সামরিক বিভাগের পরিচালনায় চলছিল। জুতো তৈরির সংখ্যা ১৯১৭ সালে হয়েছিল দৈনিক দশহাজার জোড়া এবং কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ছিল পাঁচহাজার। কিন্তু কাঁচামাল বিশেষত চামড়ার অভাবে আমরা কাঠের জুতো তৈরি করি, তাও দৈনিক পাঁচহাজার জোড়ার কম নয়।

বহুলোক যুদ্ধের সময় আমাদের কারখানায় কাজ করতো। আমাদের কারখানার স্টোর থেকে সকল জেলার সৈনাদের খাদ্য সরবরাহ করা হ'ত। অস্ট্রিয়ার সর্বত্র খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অসম্ভব চড়ে গিয়েছিল, আমাদের কারখানা প্রায় ৩৫,০০০ হাজার লোকের খাদ্য শান্তির সময়ের অপেক্ষা সামান্য কিছু চড়া দামে সরবরাহ করতো। বাড়তি দামটা আমাদের কোম্পানী থেকে দিয়ে দেওয়া হ'ত। এর ফলে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ধ্বংসলীলার নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কার্যকলাপ ও পটভূমিকার মধ্যেও আমাদের কারখানা ও সহরে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যায় নি।

কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক পরিবর্তন জুতোর কারখানাগুলিকে ভয়ানক ধাক্কা দিলে। যুদ্ধের সময় অর্থব্যয়ে যে যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল, সেগুলি শান্তির সময় জুতো সরবরাহের অনুকূল নয়। সুতরাং সেগুলো বদলে আবার অন্য যন্ত্র বসাতেও বিস্তর ব্যয় পড়বে।

এদিকে বাজারের অবস্থা ভীষণ খারাপ। কাঁচামাল তো মেলেই না। অর্ডার যদি বা পাওয়া যায়, সস্তা দামে জুতো দেওয়ার কোন উপায় নেই, লোকজন খালি পায়ে হাঁটে, ক্রয় করবার সামর্থ নেই কারো।

আমরা কারখানার যন্ত্রপাতি ঠিক করে নিয়ে যুদ্ধের পূর্বকার রেটের জুতোর দাম বেঁধে দেবার মনস্থ করলাম, কিন্তু জুতো ব্যবসায়ীরা এতে গেল চটে। কেন বাজারে যখন চড়া দাম মিলছে, তখন দাম কমানোর অর্থ কি? অর্ডারও পাওয়া যাচ্ছে খুব এবং দাম বেশ চড়া, তখন কম দামে জিনিস দেওয়ার মানে বোকামি ছাড়া আর কি? আমরা অবশেষে নিজেরাই জুতোর দোকান খুলে সস্তায় একদরে জিনিস বিক্রী করতে লাগলাম। এই সময় ধীরে ধীরে কারখানাকে যুদ্ধের পূর্ব অবস্থায় নিয়ে এলাম।

সেই ভীষণ দুর্দিনে টমাস বাটা তাঁর খরিদ্দারদের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হয়ে তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, এটাই সব চেয়ে বড় কথা। ১৯২২ সালের অর্থনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লবে যখন বহু ব্যবসায় টলমল, বহু কারখানা ও ফার্ম দেউলে আদালতের ফরিয়াদী, তখন তিনি এমন একটি কাজ করলেন যার ফলে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সদিচ্ছা লাভ করতে সমর্থ হলেন। একদিনের মধ্যে তিনি সব রকম মালের দাম শতকরা ৫০০ ভাগ কমিয়ে দিলেন। বড় বড় ফার্মে এতে তাঁর প্রতি নানারকম বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল এবং যাতে তাঁর সর্বনাশ হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হ'ল। বাটা সকল বিপদ জয় করলেন। পূর্বোক্ত দাম কমানোর ব্যাপারে বাটাকে তাঁর সমস্ত স্টক বিক্রী করে বাটা তাঁর কারখানার খরচ কমিয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেঁধে দিলেন এবং ১৯২৩ সাল থেকে বাটার ব্যবসা হু হু করে বেড়ে চলল, কারখানা বাড়িতে কারখানার কাজ চলছিল, তা থেকে ক্রমে ১৯৩২ সালে এক জিলন্ সহরেই পঞ্চাশখানা বাড়িতে কারখানা বসল, এ ছাড়া অট্রোকোভিচে কুড়িখানা বাড়িতে পৃথক কারখানা ছিল। এই ১৯৩২ সালেই এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় টমাস বাটার মৃত্যু হয়।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বাটার শিক্ষানবিশি ও প্রতীক্ষার সময়, ধীর অবিচল প্রতীক্ষা, যার শেষে সাফল্যের অপেক্ষমান জয়মাল্য। দেশব্যাপী সেই ভীষণ দুরবস্থার দিনে বাটা শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। কর্মের মধ্যে, নিষ্ঠার মধ্যে, সত্যের মধ্যে, তিনি নিজেকে ও তাঁর কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রাচীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা তখন ভাঙনের মুখে, বাটা বুঝেছিলেন তাঁকে বাঁচতে হ'লে ও দেশবাসীকে বাঁচাতে হ'লে নতুনতর ভিত্তিতে তাঁর ব্যবসাকে দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু কি করে আরম্ভ করা যায়? এ সমস্যার সমাধান বাটা একদিনে করে উঠতে পারেন নি। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই সমস্যার সুসমাধানের জন্য তাঁকে কি প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁর দিন এল।

১৯১৮ সালের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে টমাস বাটার প্রবন্ধ

(১৯১৮ সালের ২৫শে মে প্রকাশিত)

যুদ্ধ আমাদের এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেচে। জনসাধারণের জীবনে আমরা এই ভীষণ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করচি, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের অসম্ভব বৃদ্ধি এই প্রতিক্রিয়ার একটি রূপ। এই সব ঘটনা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে অহরহ পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। এই সব ঘটনা থেকে ও প্রতিদিনের দুঃসংবাদ থেকে নিজেকে দূরে রাখা শক্ত। তাঁর পরিবারের মধ্যেই এই ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এসে পেঁছয় এবং তাঁকে আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ সব ঘটনা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে এবং শুধু লক্ষ্য করলেই চলবে না, তাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে নিজেদের তৈরি করতে হবে। বাইরে থেকে আমাদের নির্লিপ্ত মনে হ'লেও আমরা অহরহ এই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করচি। তবে এই সংগ্রামের কষ্ট আমাদের লাঘব হবে মোটা মজুরির কাজের দ্বারা। জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারখানার মজুরেরা একথা ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে যে তাদের আয়ও বেড়ে গিয়েচে এবং যদি দুর্ঘটনা চরমতম সীমায় না গিয়ে দাঁড়ায়, তবে এই বিপদের মধ্যেও তারা নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে।

অদ্যকার বিপদের মধ্যে আমরা আগামী কালের বিপদের কথা ভুলে বসে থাকি। যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হবে। আমরা সকলে সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু এটা অনেকেই বুঝি না যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিনেই আমাদের এ দুঃখ দূর হবার নয়, কারণ এই ভীষণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার শেষ এক আধদিনে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি আমরা পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সমর্থ হই, তবে একদিন না একদিন আমরা জয়ী হ'বই। শুধু মাসিক বেতনের ওপর যাদের নির্ভর, তারা সে সময় বিপদে পড়ে যাবে, কারণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নানা বিরুদ্ধ ঘটনাবলীর মধ্যে এসে পোঁছতে হবেই।

সেইজন্যই বলি, আমাদের অদ্যকার দুঃখ যেন কালকার কথা আমাদের ভুলিয়ে না দেয়, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, ভবিষ্যতের সে দুর্দিনে আমাদের শ্রমিকের আয় যেন বাড়ে।

ভবিষ্যতে কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, নতুনতর ব্যবস্থার মধ্যে কারখানাগুলো কিভাবে টি'কে থাকবে, কি হারে শ্রমিকদের মজুরি দেবে এগুলি ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

কিন্তু আরও প্রশ্ন আছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুলোক ফিরে আসবে, যাদের চাকরি নেই। এরা চাইবে বে'চে থাকতে, শ্রমিকদের মোটা বেতনে ভাগ বসাতে সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও বটে। যদি সে সময় কারখানার কাজ কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে এই সব লোকের উপায় কি হবে? কে দেবে তাদের চাকরি? তারা বাঁচবে কি খেয়ে?

খাদ্যসমস্যা থেকে বাসগৃহের সমস্যা কম নয়। বাসগৃহের সংখ্যা কমে যাওয়াতে অল্পসংখ্যক বাড়িতে বেশি লোকের ঠাসাঠাসি, প্রত্যেকের জন্য যথোপযুক্ত বিশ্রামের স্থান নেই, এতে দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে বাধ্য, কারণ উপযুক্ত বিশ্রাম ভিন্ন স্বাস্থ্য কিরূপে ভাল থাকতে পারে? প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী ক্ষুদ্র গৃহ চাই। সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমের পরে নিজের নিভৃত গৃহকোণে পরিবারবর্গ বেষ্টিত হয়ে বসবার কিংবা নিজের ক্ষুদ্র বাসবাটীতে মুক্ত আলো ও বাতাস উপভোগ করবার চেয়ে কি আর সুখ আছে জগতে?

আরও বহু বাধাবিপদ আমাদের সম্মুখে তখন দেখা দেবে, যুদ্ধের পরে তৎকালীন দেশের অবস্থায় সেগুলি দূর করা খুব সহজ হবে না। দৈহিক প্রয়োজন ব্যতীত আমাদের আত্মিক প্রয়োজনও আছে, যেমন শিক্ষা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মত, শিক্ষা শুধু নৈতিক প্রয়োজন সাধন করে না। আমাদের উপার্জন ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে তোলে। গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগার, থিয়েটার, কনসার্ট প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্রগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক।

এগুলি শুধু একজনের জন্য গঠিত হবে না, কারখানা থেকে যারা দু'পয়সা উপার্জন করছে, সকলের পক্ষেই এ আবশ্যক হয়ে পড়বে। ভবিষ্যৎ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও শ্রমিকের স্বার্থের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না। উভয়ের দৈনিক আদানপ্রদান উভয়ের শ্রীবৃদ্ধি।

উৎসাহ

১৭-১১-১৮ তারিখে বাটার বক্তৃতা

আজ আমি আপনাদের কাছে বলতে দাঁড়িয়েছি যে এই বিভাগে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করা কত প্রয়োজনীয়। যাঁরা মহাযুদ্ধের পূর্বে কাজ করেছিলেন, তাঁরা জানেন আমরা এখন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের

মাল ভিন্ন উপায়ে উৎপাদন করচি। যুদ্ধের সময় যাঁরা এখানে কাজ করেচেন, তাঁদের পক্ষে বর্তমানের কার্য সম্পূর্ণ নূতন। তখনকার আমলের সামরিক জুতো গড়তে বেশি কারিকরীর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এখন তার চেয়ে অনেক শিক্ষা ও কৌশলের প্রয়োজন হয় জনসাধারণের জন্যে সস্তা জুতোর যোগান দিতে।

উৎপাদনের সংখ্যা না বাড়ালে আমরা শ্রমিকদের বেতন দিতে পারি না, মালের দরুণ মহাজনকে টাকা দিতে পারি না। আজকাল জুতোর চাহিদা যথেষ্ট বেড়েচে, কিন্তু মাল কাটানো দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েচে। মালের দর কমার মুখে, ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেচে হঠাৎ কেউ কিছু কিনতে চায় না। জনসাধারণের মধ্যেও অনেক দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েচে। এ বাজারে ব্যবসা চালান খুবই কঠিন কাজ। দোকানে প্রায়ই চিঠি আসে, খরিদ্দারেরা অর্ডারী মাল না পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েচে। এ অবস্থায় আমাদের নিজেদের দোকান বিস্তৃততর ভাবে ছড়াতে হয়েচে দেশের সর্বত্র। যদি আমাদের মূলধন নিঃশেষ হয়ে যায় তবে আপনাদের মজুরি ও মালের দাম আমরা দেবো কোথা থেকে? সুবিধার মধ্যে এই দোকানের মাল ধীরে ধীরে কাটচে। আজকাল লোকে যুদ্ধের সময়ে যে গড়নের জুতো বাজারে চলতি ছিল, তা অপেক্ষা ভিন্ন গড়নের জুতো কিনতে চায়। অতএব আপনারা এই ধরণের জুতো তৈরি করতে আমাদের সাহায্য করুন এবং দোকানের ম্যানেজারদের মাল কাটাবার পন্থা নির্দেশ করুন। অবশ্য আমি জানি এ কাজ আপনাদের সকলের পক্ষেই গুরুতর, নতুন ধরণের জুতো তৈরির কাজ আমাদের শিখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে জনসাধারণের চাহিদা মিটাবার মধ্যেই আমাদের নিজেদের মঙ্গলও নিহিত, তবেই এ কাজ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে।

যারা গোড়ালির পেরেক এমনভাবে ঠুকে দেয় যে সেলাইওয়ালা সুতো চালাবার জায়গা পায় না, তারা মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলের সৃষ্টি করচে। এ ধরণের জুতো টেকসই না হওযায় যারা কেনে তাদের পয়সা নষ্ট হয়। এ জুতোর গোড়ালি দু'মাস যেতে না যেতে খসে পড়ে এবং সহজে জল জুতোর মধ্যে ঢুকবার পথ পায়। ফাঁকিবাজ মজুরেরা কাজে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে মাত্র, কাজ অগ্রসর হতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। ফলে আমাদের কারখানায় মজুর পিছু জুতো তৈরির রেট্ গড়ে দৈনিক দেড় জোড়া, সেখানে আমেরিকার কারখানাসমূহে মজুর পিছু দৈনিক মাল তৈরির রেট্ দশ জোড়া।

কিন্তু এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় কারা? আমাদের হাতে পয়সা কম, দারিদ্র্য ঘোচে না, যেখানে মার্কিন মজুরেরা দু'জোড়া ভাল জুতো কিনতে পারে, সেখানে আমাদের মজুরদের পায়ে তালি দেওয়া ছেঁড়া জুতো। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় আমেরিকার সঙ্গে তুলনায়। এর কারণ আমাদের মজুরেরা দৈনিক দেড়জোড়া জুতো তৈরি করে, সুতরাং তাদের মজুরির হারও কম।

আমাদের দেশের একজন কারখানার মালিকের চেয়ে আমেরিকার একজন মজুর অনেক বেশি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। আমাদের দেশে মজুরেরা মোটরগাড়ি কিনতে পারে না, যদিও মোটরগাড়ি থাকলে কাজে যাতায়াতের কত সুবিধা হয়। মার্কিন দেশে বেশির ভাগ শ্রমিকের মোটরগাড়ি আছে।

এর জন্যে শুধু আপনারাই দায়ী, এমন কথা আমি বলচি না। আমরা সকলেই সমান ভাবে দায়ী। মার্কিনদেশের মজুরদের মত অভিজ্ঞতা নেই আমাদের, ওদেশে কি শ্রমিক কি কেরাণী নিজের নিজের কাজে সকলেই দক্ষ। আমাদেরও ওদের মত কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে, তার উদ্দেশ্য হবে যাদের জন্যে আমাদের এই পরিশ্রম, সেই জনসাধারণের সেবায় যেন আমাদের শ্রম সার্থক হয়ে ওঠে।

জনসেবাই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র

টমাস বাটা কি চক্ষে নিজের কার্য ও কারখানার শ্রমিকদের দেখতেন, ১৯১৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তাঁর প্রদত্ত এই বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার পঁচিশ বৎসর অন্তে যে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় বাটা এই বক্তৃতা করেন:

সহকর্মিগণ

এই রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ উৎসবের চেয়ে কর্মপ্রচেষ্টায় অধিকতর উৎসাহের আমি পক্ষপাতী।

তোমাদের কাজকর্মে উন্নতি আমাকে যথেষ্ট আনন্দদান করেছে। কারখানার সাপ্তাহিক পত্রিকা মারফতে এ সম্বন্ধে সংবাদ সকলেই জানে। তোমরা আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ বলেই অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন কর। তোমাদের সহযোগিতা ব্যতীত আমার সাফল্যের অস্তিত্ব কোথায়? এই সহানুভূতি থেকেই মনে জাগে উৎসাহ, কর্মে বিপুল উদ্যম নতুবা আমি আমার কারখানার ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতির মালিকানা পেয়ে এতটুকু আত্মতৃপ্তি বোধ করি না। আমি গর্ব অনুভব করি আজ এই ভেবে যে তোমাদের কর্মকুশলতা, পরিশ্রম উদ্যম ও বিপুল প্রচেষ্টাই আমাকে এই কারখানা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এ কারখানা এ যন্ত্রপাতি তোমাদেরই পরিশ্রমলব্ধ জিনিস।

যারা আমাদের কাছ থেকে দূরে বাস করে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী যারা সকলেই আমাদের সাহায্য করছে এ কাজে। তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমাদের কারখানায় জীবিকা অর্জনের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ শিল্পী সরবরাহ করছেন আমাদের। এই নবতর শিক্ষিত শ্রমিকের দল শ্রমের মর্যাদা বোঝে কাজে ফাঁকি দেয় না। আমরা এ কাজে সকলেই শ্রমিক, ধনী কেউ নেই এখানে। পরস্পরের অভিজ্ঞতা পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে দেই আমরা। উন্নতির পথ যাতে সকলেরই সুগম হয়ে ওঠে।

এই অভিজ্ঞতা নদীর মত সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আমাদের অঞ্চলের সর্বত্র দেশবাসীর আসল ধন এই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা থেকে কর্মকুশলতা কর্মকুশলতা থেকে অর্থাগম। যাতে ধনী ও শ্রমিক উভয়েই লাভবান হয় এমন ব্যবসাতেই হাত দেওয়া ব্যবসায়ীদের কর্তব্য।

উত্তাপ

[১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর টমাস বাটার এই রচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যাবে শুধু শ্রমিকদের সুব্যবস্থার বাধাবিপত্তি নয়, জলকষ্টের দরুন প্রাকৃতিক বাধাও তাঁকে জয় করতে হয়েছিল।]

এই বৎসর ভীষণ গরম দেখা দিয়েছে, দেশের এও এক শত্রু। গরু বাছুর শাক-সব্জি সব জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে এই অসম্ভব গরমে। রাশিয়ার সংবাদে দেখা যায় এই ভীষণ শত্রুর হাতে সেখানে দলে দলে লোক মরছে।

জীবনধারণের উপযোগী জিনিসপত্রের অনটন হওয়ায় চারিদিকে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। উত্তাপের দরুন আমাদের কি কষ্ট, সকলেই বুঝতে পারছেন। আমাদের সহরে এই সপ্তাহে এই গরমে কি কি ঘটেছে দেখুন:—

রাত্রির পাহারাদার ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে আমাদের কারখানার এক অংশে আগুন লাগে।

অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিরাও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েচে গরমের দরুন। ফলে কারখানার উৎপাদনের হার নেমে গিয়েচে, যেখানে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকদের মজুরি শতকরা পাঁচভাগ বাড়তো, সেখানে শতকরা পাঁচভাগ কমে গেল। চামড়া পরিষ্কারের কারখানার মজুরেরা এ গরমে কাজ করতে পারচে না, জলাভাব ও উত্তাপ বৃদ্ধির দরুন পাওয়ার হাউস ও যন্ত্রশালাতেও আশানুরূপ কাজ হচ্চে না। উত্তাপরূপ শত্রুর সঙ্গে আমাদেব সর্বদা যুদ্ধ করতে হচ্চে প্রাণপণে, কাজ কি করে এগোয়?

আমাদের মনে রাখতে হবে, এ এক ধরণের যুদ্ধ, এবং এ যুদ্ধে জয়ী হতে হবে আমাদের। কর্মের মধ্যে, সাহসের মধ্যে আমাদের বিজয় নিহিত। এতে কাজ বাড়বে, কাজ বাড়লে মজুরীও বাড়বে। তবে আমরা দেশের বাইরে কারখানার তৈরি মাল রপ্তানী করে তার বদলে আরও কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে সমর্থ হব।

উত্তম খাদ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মের বাঁধাবাঁধি—সংক্রামক রোগকে দূরে রাখবার এই কয়টি সদুপায়। যুদ্ধের সময় এর পরীক্ষা হয়ে গিয়েচে। আমাদের দেশে সংক্রামক পীড়া এখনও অনেক কম, কারণ আমরা প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাই। কিন্তু এই খাদ্যদ্রব্য আসে কোথা থেকে? আমাদের শ্রম ও উৎসাহ আমাদের কর্মনিষ্ঠাই এর জনক।

দুর্দিন

[১৯২২ সালের শীতকাল। বিনিময়ের হার অসম্ভব রকম নেমে যাওয়ায় শীঘ্র ইউরোপ ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অর্থনৈতিক দুর্দিন সমাগত, এটা বেশ সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কেউ জানে না এ অবস্থার উদ্ভব কেন হ'ল বা কিসে এর প্রতীকার হবে। বাটার নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি সেই দুর্দিনের মুখে ১৯২২ সালের ২৮শে জানুয়ারী প্রদত্ত হয়]

চেক দেশে প্রচলিত ক্রাউনের দাম অসম্ভব রকমে উঠচে, নামচে। কোথায় যে তার দাম এসে ঠিক হয়ে দাঁড়াবে, তা কেউ বলতে পারে না। পশ্চিম অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা চালান অসম্ভব হয়ে উঠেচে, কারণ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় অত্যন্ত বেশি। পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসাও আশাপ্রদ নয় আদৌ। দোকানে যথেষ্ট মাল ঠাসা, মালের কাটতি নেই। গত বসন্তকাল ও শরৎকালের মত এবারেও আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করতে হবে।

অনভিজ্ঞ লোকদের বোঝান শক্ত হবে যে এক কিলো ওজনের চামড়ার তৈরি ভাল জুতো একজোড়া ১১৯ ক্রাউন খুচরা এবং ৯৫ ক্রাউন পাইকারী দরে বিক্রী করা কত অসম্ভব, যখন এক কিলো ওজনের জুতোর সোলের চামড়ার দর ১০০ ক্রাউন। একথা তারা আরও বুঝতে পারবে না যে এ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও গত সপ্তাহে জুতোর কারখানাতেই শ্রমিকেরা সর্বোচ্চ হারের মজুরি পেয়েচে অন্য অন্য ব্যবসার চেয়ে।

জুতো তৈরির ব্যবসা ক্ষতি সহ্য করেও চালাতে হচ্চে, নতুবা কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মজুরেরা না খেয়ে মরে।

[অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে ওঠে। বাটা কিভাবে ক্রমবর্ধমান বাধা-বিঘ্নকে জয় করলেন, তাঁর ১৯২২ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখের প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি]

কারখানায় শ্রমিকদের জলযোগ

একখানি সংবাদপত্র আমার বিরুদ্ধে হ্যাদিস্ত্ সহরের গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধির কাছে নালিশ জানিয়েচেন যে, আমার কারখানার মজুরদের আমি কারখানায় জলযোগ করতে বাধ্য করে তাদের গার্হস্থ্য জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করচি। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা দেখিয়েচেন একটি মহিলা তাঁর স্বামী পরিত্যাগ করেচেন, কারণ তাঁর স্বামী জলযোগ করতে বাড়ি যেতেন না। গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মহোদয় আমাকে যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি নিম্নোক্ত উত্তর দিতাম।

আমাদের ব্যবসার পক্ষে সময়টা খারাপ। আয় নেই অথচ কারখানায় অনেক মজুর পুষতে হচ্চে। আমাদের দেশে জুতোর কাটতি নেই যা আছে সে অনুপাতে মজুর রাখতে গেলে এক পঞ্চমাংশ মজুর রেখে বাকি সবাইকে জবাব দিতে হয়। বিনিময়ের অসুবিধার দরুন রপ্তানীর কাজ প্রায় বন্ধ। প্রত্যেক দেশে বিদেশী জুতোর ওপর উচ্চ হারে ট্যাক্স বসিয়ে দেশী জুতোর ব্যবসা বাঁচিয়ে রেখেচে। যে সব দেশে আমদানী মালের ওপর ট্যাক্স নেই আমেরিকার কারখানাগুলি সে দেশে সস্তায় আমাদের চেয়ে অনেক ভাল কোয়ালিটির জুতো পাঠাচ্চে। সেখানে মাসে মাসে ফ্যাশান বদলায়, সুতরাং কারখানার মালিকেরা তাদের বাড়তি বে-ফ্যাশানের জুতোগুলি লাখে লাখে বিদেশে পাঠাতে পারে।

এই ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অনেক কারখানা কাজ একেবারে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েচে অনেক মজুরদের মজুরির হার কমাতে বাধ্য হয়েচে। আমি এই সমস্যার সমাধান করেচি অন্যভাবে। আমার কারখানার দশজন ডিরেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি যে কোন উপায় আমাদের করতেই হবে। কিন্তু মজুরির হার কমান চলবে না।

কিভাবে আমরা এর সমাধান করলাম? জুতো তৈরির খরচা কমিয়ে। কারখানার কর্মচারীদের মিতব্যয়ী হতে হবে, এই ঠিক করলাম। বিশেষ করে মোটা বেতনের কর্মচারীদের। জলযোগের সময় বাড়ি যাতায়াত করতে যে সময় ব্যয় হয়, জলখাবার তৈরি করতে যে কয়লা পোড়ে, সেগুলি বাঁচাবার জন্যে কারখানায় প্রত্যেকে জলখাবার খাবে ঠিক হ'ল।

অতএব সংবাদপত্রে আমায় অকারণ দোষ দিয়েচে এজন্যে। আমার আটজন সহকর্মী আমার নিমন্ত্রণে আমার টেবিলে জলযোগ সম্পন্ন করতেন। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন এ বিপদের সময় নিজ নিজ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়ে যিনি হাজার হাজার মজুরের মুখের অন্নগ্রাস বাঁচাতে রাজি নন, তিনি শ্রমিকদের মালিক হওয়ার অনুপযুক্ত।

কর্ম না বেকার জীবন?

[বাটার ব্যবসায়ের মূলনীতি আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি বুঝতেন আমার খরিদ্দারদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, আমার কারখানার ও শ্রমিকদের পক্ষেও তাই মঙ্গলের পথ। আজকাল এ নীতির সত্যতা অনেকে উপলব্ধি করেচেন, কিন্তু ১৯২২ সালে বাটা যখন এ নীতির প্রবর্তন করেন, তখন অনেকে বাটাকে স্বপ্নদ্রষ্টা, খেয়ালী বলে ভেবেছিল। শুধু ভাববাদ নয়, বাটা কর্মক্ষেত্রেও সেগুলিকে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন কাজ বন্ধ করে হাত পা গুটিয়ে বসে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে সংগ্রামশীল জীবনও অনেক ভাল। ১৯২২ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে এ নীতির ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারি]

কর্মীদের উদ্দেশ্যে—কর্ম না বেকার জীবন?

আমাদের কারখানা সর্বপ্রথমে শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি করে এবং মুদ্রার মূল্যহ্রাসের সময়েও সেই বর্ধিত হার বজায় রাখে। কিন্তু বিনিময়ের হার বৃদ্ধি হবার পরেও মজুরির হার আমরা কমাই নি—কয়েক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত সেই হারেই আমরা মজুরি দিয়ে এসেচি।

চেক্ ক্রাউনের মূল্য বিদেশে দ্বিগুণেরও ওপর বেড়ে গিয়েচে, যে অবস্থার কল্পনাও আমরা কোনদিন করি নি। গবর্ণমেণ্ট মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েচেন রাষ্ট্রস্বার্থ বজায় রাখবার জন্য—কিন্তু এর ফলে দাঁড়িয়েচে এই, শুধু জুতো নয়, বিদেশে কোন প্রকার মাল রপ্তানীই আর সম্ভব নয়। মাল তৈরি করতে যা খরচ, তার অর্ধেক দামে বিদেশে আমরা মাল বিক্রী করতে বাধ্য হয়েচি। খরিদ্দার দোকানে এসে বলে, "আমরা ফসল বিক্রী করচি আগের চেয়ে অর্ধেক দামে। তোমরা জুতোর দাম কমিয়ে অর্ধেক না করলে আমরা মাল কিনি কি করে?"

আমরা দোটানায় পড়ে গিয়েচি। মাল তৈরি বন্ধ করে শ্রমিকদের কাজে জবাব দেব, যেমন অন্য অনেক কারখানা করেচে, না মাল তৈরির খরচ কমিয়ে আনব বর্তমান অবস্থার উপযোগী করে?

কারখানার মঙ্গল দেখতে গেলে প্রথমোক্ত পন্থাই ঠিক, কারণ তাতে পূর্বের তৈরি মজুদ মাল যে কবে হোক, বিক্রী করে ফেলতে পারা যাবে, যাতে খুব লোকসান না হয় এমন সস্তা দাম বেঁধে দিয়ে। যতদিন কাঁচামালের দাম আমাদের পক্ষে অনুকূল না হয়, ততদিন এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

কিন্তু তার ফলে কি দাঁড়াবে? দেশের শ্রমিককুল পথে দাঁড়াবে, তাদের না জুটবে অন্ন, না জুটবে আশ্রয়।

অতএব আমরা কারখানা বন্ধ না করে মাল তৈরির খরচ কমাতে সচেষ্ট হই। বসন্তকালে মালের যা দাম, তার অর্ধেক দামে যেন বর্তমানে আমরা মাল বিক্রী করতে পারি- এটাই আমাদের লক্ষ্য।

এই মূল্যহ্রাস অল্পে সম্ভব হয় নি। নানাদিক থেকে আমাদের মিতব্যয়ী হতে হয়েচে। মজুরিব হার কমাতে হয়েচে প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ। যেমন আমরা মজুরি কমিয়েচি, অন্যদিকে আমরা আমাদের কারখানায় শ্রমিকদের বাজারের দামের চেয়ে অর্ধেক দামে খাদ্য, বস্ত্র ধোয়ানোর খরচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেচি। বাজার না চড়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে।

জনসাধারণের প্রতি

(মূল্যহ্রাসের বিজ্ঞাপনী)

দেশবাসী যাতে শরৎকালের উপযোগী জুতো কিনতে সক্ষম হয়, যাতে তারা স্থানীয় বাজারেই সস্তা জুতো পায়, যাতে কারখানা বন্ধ না হয়, যাতে কোন মজুরকেই কাজে জবাব দিতে না হয়, যাতে ষ্টেটকে অনর্থক বেকারের ভাড়া দিতে না হয়, মূল্যহ্রাসের সাধারণ পথ ধীরে ধীরে গড়ে তোলার জন্য, বিনিময়ের হারের দরুন, দেশীয় মুদ্রার মূল্য বিদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন, যে অর্থনৈতিক সংকট দেশব্যাপী, তাহা দূরীকরণার্থ, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের জুতোর দাম, গত বসন্তকালে নির্দিষ্ট দামের অর্ধেক হয়ে গেল।

এই মূল্যহ্রাস শুধু তৈরির খরচ কমিয়ে করা যায় না, সুতরাং মজুরদের বেতন আমরা শতকরা চল্লিশভাগ কমিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম। তবে ১লা মে থেকে আমরা আমাদের মজুরদের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি বাজার দর অপেক্ষা অর্ধেক মূল্যে সরবরাহ করব।

বান্ধব

(১৯২২ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রাহা থেকে আমি আপনাদের সংবাদ পাঠাই, তদনুযায়ী আপনারা মজুরির হার শতকরা ৪০ ভাগ কমানর প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন এতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের ক্রাউন মুদ্রার মূল্য ১০ সেন্টিম থেকে ২০ সেন্টিমে ওঠাতে যে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের, আপনারা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। এর ফলে রপ্তানীর ব্যবসা একদম বন্ধ। চেক্ ক্রাউনের মূল্যহ্রাস না হওয়া পর্যন্ত রপ্তানী-ব্যবসায়ে ক্ষতি সহ্য করতে হবে।

কারখানার কাজের প্রবৃত্তি এরকম নয় যে আজ বন্ধ রেখে আবার দু'দিন পরে পূর্ববৎ চালান যায়। রপ্তানী বন্ধ হওয়ার দরুন আমাদের সম্মুখে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন পথ ছিল না। অথচ কিছু করতে হবেই না করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

এ বিপদ আমরা আনয়ন করি নি স্টেটের অর্থনীতির দরুন এ বিপদের উদ্ভব। মুদ্রামূল্যের এ ধরণের বৃদ্ধির পক্ষপাতী নই আমি আমি সুরু থেকেই মুদ্রামূল্যের দৃঢ় স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট ওকালতী করেছি যার ফলে শিল্পবাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হয়ে থাকে। মুদ্রাসংকট সমস্যা সমাধান করবেন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কারখানার মালিকেরা দেশের আইন অনুসারে চলবেন। কারণ আইন না মেনে চললে অধিবাসীদের স্বার্থ বজায় থাকে না, অর্থনৈতিক জীবনে সংকট দেখা দেয়।

আমাদের কারখানার স্বার্থ বজায় রেখে চললেই দেশের উপকার করা হবে না, যাতে রপ্তানীর ব্যবসা ভালভাবে চলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে। রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট না দেখা দেয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। মাল রপ্তানীর সুবিধার ওপর দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করছে।

উত্তর চেক অঞ্চলের কাঁচের কারখানার মজুরেরা নিজেদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—কারণ তাকে একজোড়া জুতোর দাম দিতে হয় ১৭০ ক্রাউন কিন্তু ইংলণ্ডে একজন কাঁচশিল্পী ১৫ শিলিং অর্থাৎ ৯৭ ক্রাউন মূল্যে একজোড়া জুতো কিনতে পারে। ইংলণ্ডে কাঁচের মাল রপ্তানী বন্ধ হ'লেই কাঁচের কারখানার মজুরেরা বেকার হয়ে যাবে, তাদের বসিয়ে রেখে মজুরি দেবে কে? স্টেটেরও ক্ষতি তাতে, কারণ একদফা হবে ট্যাক্সের ক্ষতি, অন্য দিক থেকে ক্ষতি দাঁড়াবে এই, বিদেশী মুদ্রার আমদানী বন্ধ হ'লেই চেক্ ক্রাউনের মূল্যহ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

স্টেটকে ট্যাক্স, রেলভাড়া প্রভৃতি কমাবার অনুরোধ জানিয়ে কি লাভ? ক্রাউন মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা দেশে একরকম, বিদেশে অন্যরকম—উভয় প্রকার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, কারখানার মালের দাম কমিয়ে সেই পার্থক্যের সমাধান করতে হবে আমাদের। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে সেজন্যে আমরা মালের দাম কমিয়ে দেব এবং মজুরদের খাদ্য ও বস্ত্র বাজার দরের অর্ধেক মূল্যে সরবরাহ করব। মজুরদের কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি, তারা যেন মজুরির হার শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে দেন।

এ ব্যবস্থায় আমাদের কারখানা দেশের অন্য সব কারখানার অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মজুরদের

মাহিনার কিছু অংশ কারখানার ব্যাঙ্কে জমা রাখে. আমরা প্রতিবৎসরের মজুদ টাকার সুদ অবশ্য দিয়ে থাকি। মজুরির হার কমে গেলে ব্যাঙ্কের টাকাও কমে যাবে। মজুরেরা বেশি টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারবে না। কোম্পানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দেবে। এই টাকার সুদ যোগাতে হ'লে বর্তমানে মাল বিক্রয়ের যে পরিমাণ, তার দ্বিগুণ বাড়াতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ক্ষতি সহ্য করতেই হবে কারখানা চালাতে হ'লে। বাজার দরের অর্ধেক দামে মজুরদের খাদ্য, পরিচ্ছদ সরবরাহ করতে আর একদফা ক্ষতি সহ্য করতে হবে। তবে আমরা আশা করি, মাল তৈরির হার বাড়িয়ে দিয়ে সেই ক্ষতি লাভে দাঁড় করাতে পারা যাবে।

ক্ষতির ভার সহ্য করতে হচ্ছে ক্রেতাকে নয়, শ্রমিককেও নয়, কারখানার মালিকদের। এ ব্যবস্থা কারখানার মালিকদের মনঃপূত হবে না জানি, কারণ এতে তাদের যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করতে হবে। শুধু আট ঘণ্টা মজুর খাটিয়েই এ সমস্যার সমাধান হবে না, তার চেয়ে আরও বাড়াতে হবে। সর্বনাশের মুখে, বিপদের মুখে, বেঁচে থাকতে হ'লে অল্প পরিশ্রমে, অল্প দুঃখে, তা সম্ভব হয় না। অনেক বেশি স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা যদি স্বার্থত্যাগ করি, তবেই আমরা গবর্ণমেণ্টকেও ডাক ও রেলবিভাগে স্বার্থত্যাগ করতে বলবার অধিকার অর্জন করবো। ক্রাউনের বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিতে লাভবান হয়েছে কারখানার মালিকেরা নয়--ব্যাঙ্ক ও পুঁজিবাদীরা। এই সময়ে ক্রাউনের দাম বেঁধে দেওয়া খুব আবশ্যক--নতুবা শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস অনিবার্য।

উন্নতির উপায়

প্রাহা থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের দেখাদেখি সেখানেও জুতোর দোকানগুলি তাদের মালের দাম কমিয়ে দিয়েছে অমাদের দরের সংগে সমতা বজায় রেখে।

লোহার তৈরি মালের দর এক টনে ৩০—১০০ ক্রাউন অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ কমে গিয়েছে। ক্রেতা এইবার লোহার তৈরি দ্রব্য কিনতে ইতস্তত করবে না। লোহার দাম বেড়ে যাওয়াতে আমাদের কারখানাও লোহার পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও লোহার জিনিস অনেক বেশি টেকসই। নৌকা কারখানায় আমরা জলের ড্রেন এক কিলোমিটার বাড়ালাম কাঠের পাইপ বসিয়ে। লোহার পাইপের দর অত্যন্ত চড়া, যে টাকায় লোহার পাইপ কেনা যেত, তার সুদ থেকে কাঠের পাইপ কেনা গেল। অথচ আমরা সকলেই জানি এ কাঠের পাইপ দশ বৎসরের বেশি টিকতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ক্রেতা লোহার জিনিস কেনে না—কিংবা নিতান্ত দরকারী জিনিসের জন্য হয়তো কিনতেও পারে। সব জিনিসের অবস্থাই এই রকম। আগে মায়েরা বিরক্ত হতেন, ছেলে-মেয়েদের জামা, জুতো এত বেশি, তাঁরা এতগুলি জিনিস সামলাবেন কি করে। এখন বেশি থাকা তো দূরের কথা তাঁদের ছেলেমেয়েরা অনাবৃতপদে স্কুলে যায়। জিনিসপত্রের মূল্য এত বেশি যে ক্রেতা পিছিয়ে যায়। এ সময় মাল তৈরি কমিয়ে বহু শ্রমিকদের বেকার করে রাখলে দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে কি করে বাঁচান যাবে? কম দরে মাল দেওয়া যাবে কি ভাবে?

শীতকালে অনাবৃতপদ বালকবালিকাদের বিদ্যালয় গমনের দৃশ্য যাতে আর না দেখতে হয়, সেই জন্য এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

এইবার ১৯২২ সালের দুর্দিন এসে গেল। বাটা বরাবরের জন্য মালের দাম কমিয়ে রেখে দিয়েছিলেন এবং মজুরদের বেতন সুদিন এলে আবার বহুগুণ বেড়ে যাবে একথা তাদের শুনিয়েছিলেন।

কর্মের প্রতিযোগিতা

(১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত বক্তৃতা)

কর্মের শেষে বিজয়, আত্মপ্রসাদ আনয়ন করে। তোমাদের মধ্যে যারা অলস ব্যক্তিদের জয় করে কর্মে বিজয়ী হয়েছ, তারা মানুষ হিসেবেও বড় হয়েছ সন্দেহ নেই। মানুষের ঐশ্বর্য কর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে সংগ্রহ করতে হয়েচে। প্রতিযোগিতা মানুষের কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে দেয় তার উপার্জন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

আমার কাছে এ একটি বড় সমস্যা। আমেরিকাতে যেমন সস্তায় জুতো বিক্রী করা যায়, এখানে সেরকম কিভাবে হতে পারে। এ সম্ভব হতে পারে একমাত্র এক উপায়ে- মজুর পিছু মাল তৈরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। এর জন্যে চাই ভাল যন্ত্রপাতি শৃঙ্খলা সময়ের সদ্ব্যবহার।

সময়ের সদ্ব্যবহার তখনি সম্ভব হয়, যখন প্রত্যেক মজুর মনে ভাবে এ কাজে তার উপকার হবে সর্বাগ্রে এ তার নিজের কাজ। মজুরদের কাজ যদি বাড়ে তবে আমরা মজুরির হার কমাবো না। বর্ধিত হারে কাজ দেখাতে পারলে মজুরদেরই ভাল। পরিশ্রমের ফল তারাই ভোগ করবে।

কারখানার মাল তৈরি বেড়ে গেলে খরচ কমে যায়, সেই মিতব্যয়িতার ফল ভোগ করে ক্রেতা, কারণ মাল সস্তায় দিতে পারা যায়।

[কিন্তু ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিথ্যা কুৎসা প্রচারের দ্বারা। বাটা কিভাবে এই হীন প্রচার কার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ১৯২২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর নিম্নলিখিত বাণী দ্বারা আমরা সেটা জানতে পারি]

দেউলিয়া

আমি বক্তা নই বা এ পর্যন্ত আমার কাছে জনসাধারণ বক্তৃতা শুনতেও চায় নি। আমি কাজ ভালবাসি, আমার লক্ষ্য মজুরদের সর্বোচ্চ হারে বেতন দেওয়া খরিদ্দারকে সস্তায় মাল সরবরাহ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হীন প্রচার কার্যের ফলে আজ মজুরেরা ভাবচে, কারখানা উঠে যাবে, ফলে তাদের চাকুরী এবং মজুদ টাকা দুই-ই চলে যাবে। ক্রেতা ভাবচে তাদের অত সস্তায় জুতো দেওয়ার ফলেই আজ বাটার কারখানার এ দুর্দশা। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের কৃপায় এ কাহিনী তারা অনবরতই শুনচে কিনা ?

ক্রেতা ও শ্রমিকগণ একটা কথা মনে রাখবেন। যখন নিন্দুকগণ একবার আমার অগাধ ঐশ্বর্যের কথা বলেছিল তার মধ্যেও যেমন সত্য ছিল না, আজ তারাই আবার যখন বলচে আমার ব্যবসা দেউলে হতে চলেচে—তার মধ্যেও সত্য নেই।

আমি পুঁজিবাদী নই—পয়সা নেই আমার হাতে। আমার শুধু আছে মজুরদের জন্য চামড়া এবং ক্রেতাদের জন্য জুতো। এই আমার পুঁজি, যেমন জ্যোতির্বিদের পুঁজি দূরবীক্ষণ, সঙ্গীতজ্ঞের পুঁজি বেহালা।

দেউলে আমি কোন দিনই হই নি, হবোও না। যে দেউলে হয় সে পাওনাদারদের কাছে পাওনা মাপ চায় সে যদি নিজের অবস্থা গোপন করে তবে পাওনাদারেরা তাদের পাওনার এক পয়সাও ছাড়ে কখনো ? আপনারাই বুঝে দেখুন।

আমি কেন দেউলে হবো না আপনাদের বোঝান শক্ত। প্রথমত, আমি বাল্যকালে যে শিক্ষা পেয়েচি, তার ফলে নিজেকে দেউলে ঘোষণা করা অপমানের কাজ বলে বিবেচনা করি। দ্বিতীয়ত, অল্প বয়সেই আমি শিখেছিলাম, দেউলে হওয়া থেকে নিজেকে কি করে বাঁচান যায়।

আঠার বছর বয়সে, আমি ভাই ও বোনের সঙ্গে ৮০০ জেলাটি (৬০০ টাকা) মূলধন নিয়ে আমাদের ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপন করি। আমরা আমোদপ্রমোদে সময়ক্ষেপন করে এক বৎসর পরে আবিষ্কার করলাম মহাজনের মালের দাম দেবার সঙ্গতি নেই আমাদের। হিসেবের খাতায় জমার ঘরে শূন্য। এ অবস্থায় আমার ভাই যুদ্ধে চলে যান তিন বৎসরের জন্যে।

ব্যালান্স-শিটে দেনার অঙ্ক থাকলে দেউলে হয় না। জমার ঘরে টাকা না থাকতে পারে, কিন্তু থাকে উৎসাহ, কর্মপ্রচেষ্টা, সদিচ্ছা, শ্রম --এ সব লেখা থাকে না জমার ঘরে। অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতাও মস্ত বড় মূলধন---মূলধন কি শুধু টাকা? কিন্তু সে সময় তাও আমার ছিল না। আমার বাড়ি যে সহরে, সেখানে সবই কেরাণীর দল, তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কোন না কোন আপিসে চাকরী পাওয়া। আমিও হাতের কাজকে ঘৃণার চোখে দেখতাম, অন্য ধরণের কাজ তো জানতামই না। কিন্তু তবুও আমি দেউলে হই নি, কারণ আমি প্রতারক ছিলাম না। প্রাণপণে খেটে টাকা জমিয়ে আমি পাওনাদারদের পাওনা শোধ করে দিলাম। দুরবস্থাকে জয় করলাম। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েচে যে, দেউলে হওয়ার মূলে নীতিবাদের প্রশ্ন নিহিত আছে। কেউ দেউলে হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। কেউ তার যথাসর্বস্ব এমন কি নিজে বিনা বেতনে পাওনাদারের চাকর হয়ে থেকে দেনা শুধতে চায়।

শেষোক্ত ব্যক্তিরাই বড় ব্যবসা, বড় জাতি, বড় কারখানা, বড় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলবার ক্ষমতা রাখে।

[কর্মে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা মানবের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, বাটা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, তিনি দেখেছিলেন গত মহাযুদ্ধের পরে দেশের যে ক্ষতি হয়েছিল, নিষ্ঠার সহিত পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তার পূরণ হয়। ১৯২৩ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত তাঁর রচনাতে তিনি সেকথা উল্লেখ করেচেন]

ছুটির দিন

গত সপ্তাহে দু'দিন ছুটি ছিল, একটি জাতীয় উৎসবের দরুন, অপরটি ধর্মসংক্রান্ত। আমাদের কারখানা একদিনও বন্ধ ছিল না, যদিও কাজ তত বেশি ছিল না যা মাল তৈরি হয়ে স্টকে জমা করা হচ্ছিল। আমরা ছুটির দিন কাজ বন্ধ রাখি না, কিন্তু তার কারণ এ নয় যে ধর্মের প্রতি বা জাতির বীর সন্তানদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কিছু কম আছে। আমরা বিশ্বাস করি পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জনের দরুন কোন বীর বা সাধুমহাত্মা অপমানিত হন না।

দেশের লোকের পরিশ্রমের ওপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে। আমেরিকার সঙ্গে তুরস্কের তুলনা করলে এ ব্যাপার পরিস্ফুট হবে। অবশ্য আমি কামাল আতাতুর্কের অভ্যুদয়ের পূর্বেকার তুরস্কের কথা বলচি। আমেরিকানেরা অলস নিষ্কর্মাভাবে থেকে কোন উৎসব পালন করে না। এমন কি তাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ওয়াশিংটনের জন্মদিনেও না। অথচ দেখ, তুরস্কে সপ্তাহে ছিল তিনদিন ছুটি, একদিন মুসলমানদের জন্যে, একদিন ইহুদীদের, একদিন খৃষ্টানদের। এতে কাজ ভালভাবে চলবার কথা নয়। ফলে আমাদের দেশ থেকে লোকে আমেরিকার যায় জীবিকা অর্জন করতে, কিন্তু

তুরস্কে কি কেউ যায়? আমার পরামর্শ এই, দেশে বসেই আমেরিকানদের মত খেটে পয়সা উপার্জন কর; বিদেশে যাওয়ার দরকার হবে না।

অনেকে রবিবারে ছুটির জন্য আন্দোলন করেন, অনেকে নতুন ছুটি প্রবর্তনের আন্দোলন করেন তাঁদের জানা উচিত, যত বেশি ছুটির দিন থাকবে সপ্তাহের মধ্যে, তত কাজ কম হবে, ভাল লোকেরা দেশ থেকে বেরিয়ে চলে যাবে বিদেশে জীবিকা অর্জনের আশায়।

আমরা আমাদের মজুরদের সম্মতিক্রমে দুদিন মাত্র ছুটি দেওয়া ঠিক করেচি। যে সব মজুর এই দুই ছুটির দিনেও কারখানায় বেরিয়েচে, তাদের উপরি রোজগার হয়েচে মোট ১৪২,৫১৬ ক্রাউন— ছুটিতে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে এই টাকা তারা পেত কি? বরং উৎসবের অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদে আরও বাজে খরচ বেড়ে যেত।

কারখানার লভ্যাংশে মজুরদের ভাগ

(১৯২৪ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে মজুরদের প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমরা আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের বর্মের লভ্যাংশ আপনাদের মধ্যে বণ্টন করচি এজন্যে নয় যে কোম্পানীর হাতে টাকা ধরচে না যে কোন উপায়ে কর্মীদের মধ্যে কিছু টাকা দিলে সে বাঁচে।

এই ব্যবস্থার দ্বারা মাল তৈরির খরচ আমরা আরও কমাব। মজুরদের আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে মালের দাম আরও কমে যাবে। আমরা এখনও মনে করি যে আমাদের জুতোর দাম বেশি এবং আমাদের মজুরদের বেতন এখনও অনেক কম।

অতএব আমরা ঠিক করেচি যে যে ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকেরা কাজে উন্নতি দেখিয়ে লাভ বাড়িয়ে দেবে কোম্পানীর সেই সেই ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকদের লাভের অংশ বণ্টন করে দেওয়া যাবে। অন্য অন্য ডিপার্টমেণ্টে যদি লোকসানও হয় তবে যে ডিপার্টমেণ্ট থেকে লাভ হবে তাদেরই মধ্যে সে লাভের অংশ বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে ডিপার্টমেণ্টের লাভক্ষতির হিসাব আপনাদের কারখানার বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে—তবে যদি কোন সপ্তাহে লোকসান হয় তার জন্যে আপনাদের ভয় নেই লোকসানের ভাগ আপনাদের নিতে হবে না।

প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের যত মাল তৈরি হওয়ার জন্যে যত শ্রমিক আবশ্যক তার চেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করে। যদি আপনাদের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে আপনারা খাটেন তবে কারখানার লাভ বাড়িয়ে আপনারা নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। বর্তমানে আপনাদের হয়তো কম মজুরিতে কাজ করতে হচ্চে তার কারণ আপনারা শুধু নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যেই কাজ করেন অন্য মজুরদের সুখের দিকে চেয়ে তাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করেন না। এই লভ্যাংশ বণ্টনের সংগে সংগে আপনাদের মনে এই সংকল্প জাগ্রত হবে যে সবাই মিলে ভাল করে খেটে, ভাল করে কাজ করে ডিপার্টমেণ্টের লাভ দেখাবো। কাঁচামাল যথাসম্ভব কম পরিমাণে খরচ করার দিকেও তখন আপনাদের দৃষ্টি পড়বে।

শ্রমিকদের তৈরি মালের পরিমাণ বাড়লে আপনাদের চাকরি যাবে একথা আদৌ ভাববেন না। আমাদের বর্তমান অপেক্ষা আরও দশগুণ বেশি মাল তৈরি করার মতলব রয়েচে, বাজারে চাহিদা বেড়েচে এত বেশি। কিন্তু এখনও আমাদের নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান বাধা বর্তমান:—

১। নতুন কারখানার ভার নেওয়ার উপযুক্ত অভিজ্ঞ ও উদারবুদ্ধি ব্যক্তির অভাব।

২। কর্মকুশল শ্রমিকের অভাব

৩। অর্থের অভাব

পরিশ্রম দ্বারা এই তিনটি বাধাই আমরা অতিক্রম করতে পারি। লভ্যাংশ বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি হবে। তারা কারখানার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে বুঝতে ও ভাবতে শিখবে।

আমরা কারখানার প্রত্যেক মজুরকে আমাদের অংশীদার করতে চাই। প্রত্যেক শ্রমিক তার জমানো টাকা আমাদের ব্যবসায়ে খাটাতে পারে, আমরা দশ পার্সেণ্ট্ সুদ দিতে রাজি আছি। এ ধরণের চুক্তি লেখাপড়া করা হবে, উভয়পক্ষের ইচ্ছাক্রমে যে কোন সময়ে এ চুক্তিপত্র বাতিল হতে পারে।

আমরা চাই, প্রত্যেক মজুর নিজেকে ফোরম্যান বা বিভাগীয় ম্যানেজার করবার মত অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা অর্জন করতে যত্নবান হবে। ভাল লোককে আমরা সব সময়েই ভাল পদ দিতে প্রস্তুত। মজুরদের উচিত পয়সা বাঁচিয়ে তারা জীবনে সুখভোগ করুক নিজে লেখাপড়া ভাল করে শিখুক। শিক্ষাদ্বারা তার মনুষ্যত্বের যে উন্নতি হবে, তার ফলে কারখানার কাজের সৌকর্য অবশ্যম্ভাবী রাষ্ট্রও ভবিষ্যতে উপকৃত হবে। শিক্ষা বৃথা যায় না।

লাভের অংশ বণ্টন পরীক্ষাসাপেক্ষভাবে কয়েকটি বিভাগে আরম্ভ করা হয়েছে। আমরা আশা করি সামনের গ্রীষ্মকালে অন্য অন্য বিভাগেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। যে শ্রমিক অন্তত এক বৎসরকাল আমাদের কারখানায় কাজ করে নি বা যার বয়স কুড়ি বৎসরের কম বা যে অবিবাহিত তাকে লভ্যাংশ দেওয়া না দেওয়া কোম্পানীর ইচ্ছাধীন। তবে যে অবিবাহিত লোকের আয়ের ওপর তার আত্মীয়স্বজনকে নির্ভর করতে হয় তার বিষয়ে আমরা বিবেচনা করবো।

আমরা আশা করি এই লাভের ন্যায্য অংশ শ্রমিকদের মাসিক আয় বাড়িয়ে তুলবে।

কারখানার স্বরাজ

উন্নতি—দায়িত্ব—দারিদ্র্য—কৈফিয়ৎ

একদিন সকালে আমি একটি আনন্দের গান গাইতে গাইতে জেগে উঠলাম। এই দিনই আমার মাথায় প্রথম এসেছিল ব্যবসার লভ্যাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করবার চিন্তা। আমাদের দেশে না হলেও এ ব্যবস্থা নতুন নয়। আমেরিকাতে বহুদিন ধরে এই নিয়ম প্রচলিত, বৎসরের শেষে লভ্যাংশের ভাগ দেওয়া হয় শ্রমিকদের। এতে ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে বন্ধুত্ব ও নির্ভরতার ভাব গড়ে উঠতে বাধ্য।

কিন্তু আমি ঠিক এভাবে করতে চাইনি ব্যাপারটা। যার দ্বারা কারখানার স্বরাজ আসতে পারে, কর্মী ও শ্রমিকেরাই নিজের নিজের কাজ নিজেরাই দেখাশুনো করে চালায়, এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সর্তগুলি মনে মনে ঠিক করা গেল:—

১। প্রতি সপ্তাহে হিসাব বের করা,

২। প্রত্যেক অংশীদার যাতে অংশের প্রাপ্য হিসেব করে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা,

৩। প্রত্যেক বিভাগে এই সুবিধা দেওয়া, যাতে প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় স্বরাজ আসতে পারে।

প্রত্যেক বিভাগে আমরা উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। প্রত্যেক বৎসর বিভাগীয় লাভের

অংশ শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া সত্ত্বেও যেরূপ ফল পাবো আশা করা গিয়েছিল, তেমনটি পাওয়া যাচ্ছে না।

এ জিনিসটা খুবই কঠিন। শ্রমিকদের সহানুভূতি ও উৎসাহ আমরা পেয়েচি, কারখানার কাজ তারা নিজেদের কাজ ভেবে করে এ কথাও ঠিক—কিন্তু তাদের চেয়েও বড় জিনিস হ'ল কর্মকুশলতা ও অভিজ্ঞতা। বড় কারখানার বিভাগীয় কামারশালাগুলি সুষ্ঠুতরভাবে পরিচালনা করতে হ'লে যে জ্ঞান থাকা দরকার, তা কি সকলের কাছে আশা করা যায়?

আড়াই বৎসরের মধ্যে আমাদের কারখানায় স্বরাজ বিস্তৃত হয়ে পড়েচে অনেকখানি। আমাদের লাভ ও শ্রমিকদের বেতন বর্ধিত হয়েচে, আমাদের তৈরি জুতো আরও সস্তায় দেওয়া যাচ্ছে। লাভের অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার ফল কতটা এই উন্নতির পথে আমাদের সাহায্য করেচে, তা অঙ্কে প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু হয়তো আমরা যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি হয়েচে। দশ বৎসর ধরে আমাদের হিসাব বিভাগের সুবন্দোবস্ত করার ফলে আমাদের ব্যবসার যথেষ্ট উপকার হয়েচে, তা বুঝতেই পারা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সুফল না পেলে হতাশ হওয়ার কারণ নেই।

আমরা যদি প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে পারি, কিভাবে তাদের ডিপার্টমেণ্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে হবে, তবে আমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবো। এতে শ্রমিকদেরও লাভ। কিন্তু এ কাজ সহজ নয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়েচে, লোককে তোমার কথা সশ্রদ্ধভাবে শোনানো যায় কিন্তু তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখানো যায় না অত সহজে। আমাদের কারখানায় আমরা লোককে শুনিয়েচি সহজে, কিন্তু চিন্তা করতে শেখাতে এখনও পারি নি।

অনেকে বলে, উপবাসে মরবার ভয়ে শ্রমিকেরা আমাদের এখানে কাজ করে। একথা ভুল। এ ধরণের মনোভাব সম্পন্ন লোকদের দ্বারা আমাদের কাজ চলবে না -তারা কাজ ছেড়ে চলে গেলেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

কারখানায় স্বরাজ আনয়ন বর্তমানকালের উপযোগী। এতে মাল তৈরির খরচ কমে যায়, কাজও ভাল হয়। তবে এ কাজের প্রবর্তন করেচি আমি, আমিই জানি এ পথে কি কি বাধা বিদ্যমান।

এমন কি অতি অভিজ্ঞ কর্মীরও ভুল হয়, আপিস থেকে বাড়ি ফিরবার সময় অনেক কাজ বাকি রেখে যায়। কর্মীব্যক্তি নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন কাজ। যে শ্রমিক কর্মে শৈথিল্যের জন্যে ম্যানেজার কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হয়, সে সব সময়েই ভাববে তার ওপর অবিচার করা হয়েচে, কর্মে আরও অমনোযোগী হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি কারখানার বিভাগীয় স্বরাজের ফলে তার সহকর্মিগণ তাকে দণ্ড দেয়, তার বলবার কিছুই থাকবে না। তার কর্মশৈথিল্যের দরুন বিভাগের অন্য সব শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্চে, এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ব্যবসার লভ্যাংশ হাতে পড়লে শ্রমিকেরা নিজেদের সাংসারিক অবস্থা ভাল করবার চেষ্টা করবে। যখন শ্রমিকেরা কারখানার ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তুলে নেয়, তখনই আমরা বুঝতে পারি কর্মপদ্ধতির দোষ দাঁড়িয়েচে কোথাও না কোথাও। এই সব টাকা প্রায়ই অপব্যয়ে নষ্ট হয়। পানদোষে এবং নানাবিধ তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে।

আমরা এরকম লোক আমাদের মধ্যে চাই না। যারা নিজেদের সাংসারিক অবস্থা ভাল করতে চায় না তারা নিতান্ত অপদার্থ। আমাদের কারখানায় কি উপকার হবে তাদের দিয়ে?

আমরা এদিকে এখনও কোন উন্নতি দেখাতে পারি নি। কারখানার ব্যাঙ্কে শ্রমিকদের গচ্ছিত

টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে মাত্র গত বৎসর থেকে, কিন্তু সহরের অন্যান্য ব্যাঙ্কে অন্য শ্রমিকদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ তার কয়েকগুণ বেশি। মানুষ চিনতে আমাদের এখনও অনেক বাকি।

কারখানার মালিক শ্রমিকদের মজুরি উপার্জন করতে শিখিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন না। বাকি কাজটা আরও শক্ত। উপার্জিত অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার এবং তার চেয়েও আবশ্যক কিছু কিছু সঞ্চয় করতে শেখানো। তবে সেই সব শ্রমিক একদিন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবে।

কর্মনেতা

বাটার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের কোন ধারণা নেই—কিভাবে তিনি ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন—মাল তৈরি ও কর্মের বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হবে বাটার ব্যবসায়ের অদ্ভুত সাফল্যের পিছনে আছে কোন প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ লোকের বুদ্ধি যিনি পূর্ব থেকে গণিতশাস্ত্র দ্বারা কষে সব কাজের ধরাবাঁধা পথ সুনির্দিষ্ট ও সুগম করে রেখেছেন।

কিন্তু আসলে টমাস বাটার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বই এজন্য দায়ী। বাটা কৌশলী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বটে, একটি শিল্পী মনও ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পী ছিলেন না—বাস্তবকে কেন্দ্র করে তাঁর ভিতরের শিল্পী আত্মপ্রকাশ করতো তাঁর সৃষ্টিতে। এর বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি তাঁর কর্ম-শৃঙ্খলা ও সংঘবদ্ধতার ক্রমের মধ্যে দিয়ে।

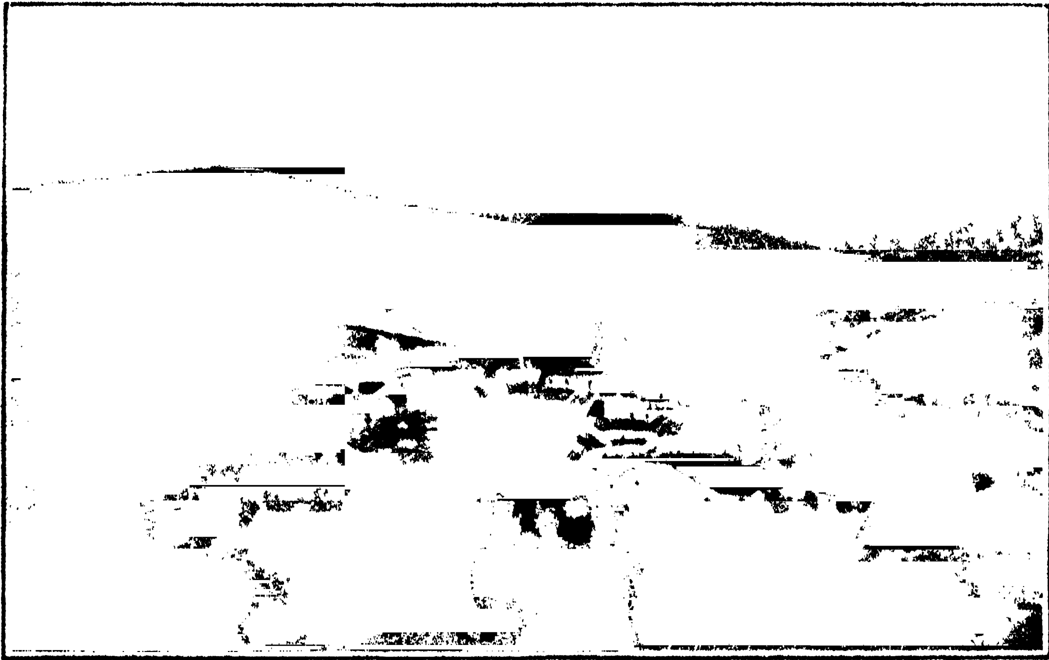
বাটার শিল্পীমন নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, অপরের উপর এ মনের প্রভাব খুব বেশি হওয়া স্বাভাবিক বটে। বাটা এই মালমসলা নিয়ে সৃষ্টি করে গিয়েছেন—যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেন—এক কথায় তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন গুণ নিহিত—বাটা কেবল এই অন্তর্নিহিত গুণাবলী বাইরে ফোটাবার চেষ্টা করেছেন এবং বহু স্থলেই তাঁর শিল্পীমনের যাদুদণ্ডের প্রভাবে শুষ্ক তরুও পুষ্প প্রসব করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই একটি বড় প্রমাণ—সারাজীবন তিনি পরিশ্রম করেছেন মানুষের উন্নতির চেষ্টায়, শুধু তাঁর নিজের উন্নতি নয়, তাঁর কারখানার শ্রমিকদের উন্নতি, তাঁর দেশবাসীর আমোদপ্রমোদ, কর্মশিক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি।

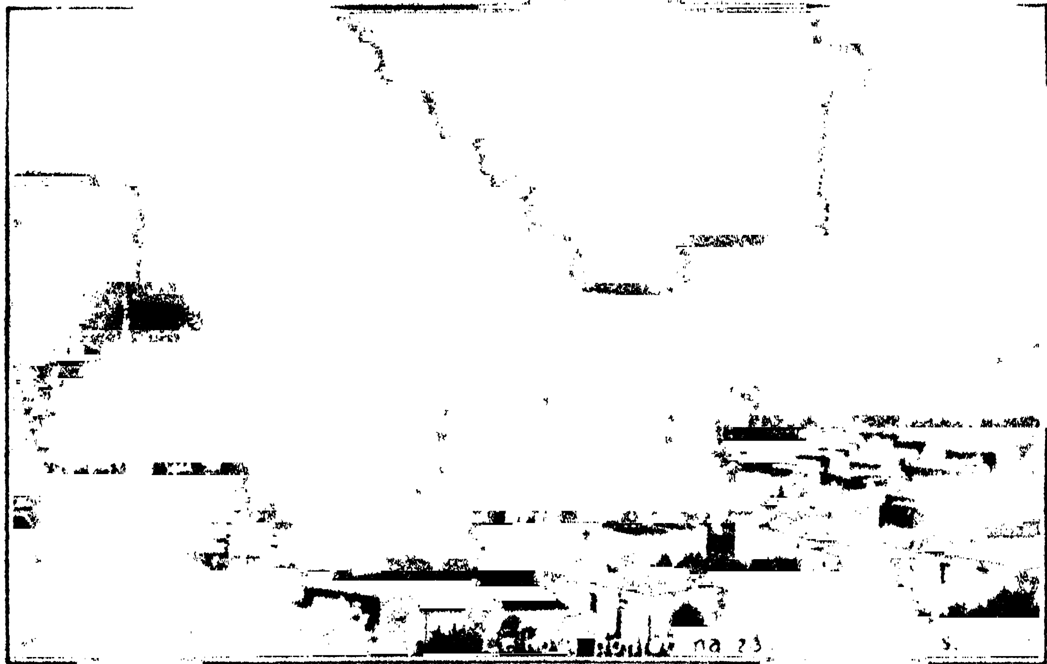
অনেক বড় বড় কথা তিনি বলেছেন, যার আলোচনা করলে হয়তো মনে হবে জুতো তৈরির সঙ্গে এ সকল কথার সম্পর্ক কি? কিন্তু তা নয়। বর্তমান যুগের শিল্প-বাণিজ্য সমাজের বিধিব্যবস্থা উলটে দিয়েছে। নবতর সমাজের বাণী সরল ভাষায় টমাস বাটা ব্যক্ত করে গিয়েছেন। তাঁর সরল রচনাবলী নব সমাজের নবতর সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রচেষ্টা।

কর্মে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা

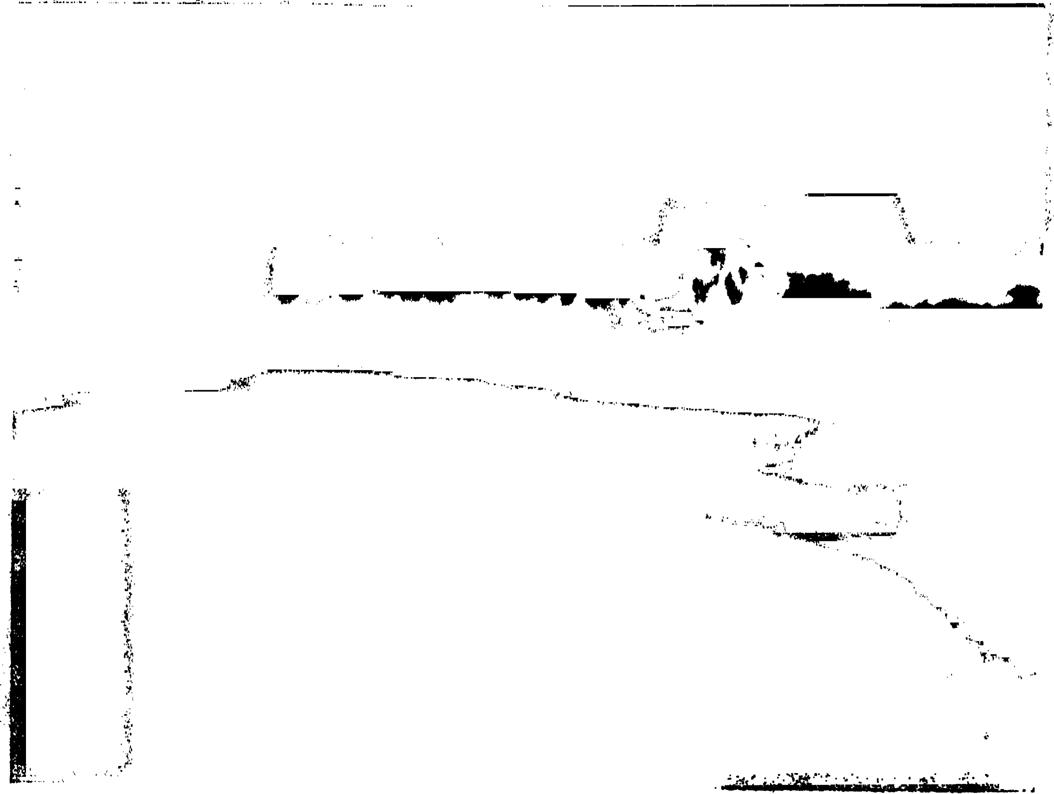
আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সব কারখানার শ্রমিকেরা হয়তো দু'পয়সা জমিয়েছে বা ভালভাবে বাস করে, তাদের দ্বারা কাজ ভাল পাওয়া যায়। এই সব কারখানায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য। অনেক



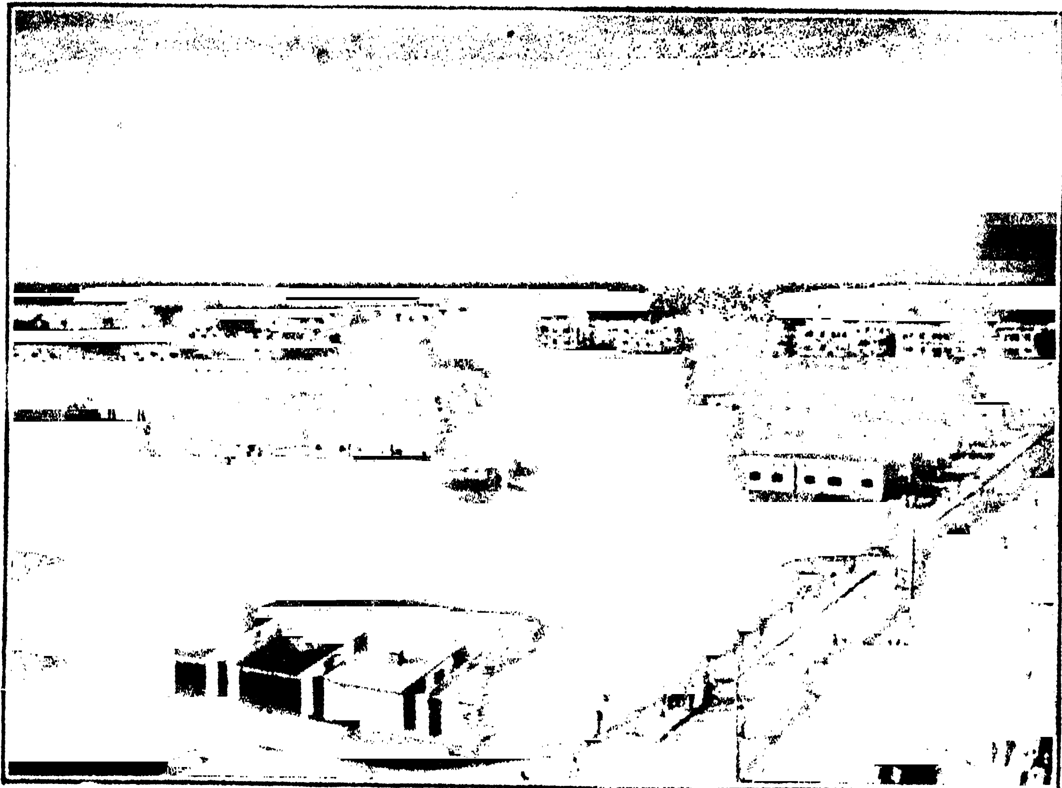
টমাস বাটার জন্মবৎসরে (১৮৯৪) জিল্‌ন্‌ গ্রামের দৃশ্য



বর্তমান জিলিন সহরের একাংশ



১৯৩২ সালে বাটানগরের রূপ



বর্ত্তমান বাটানগর (পশ্চিমাংশ)

বৎসর থেকে এটা আমরা জানি অভাবগ্রস্ত লোকের দ্বারা সৎকার্য হয় না। তাদের অবস্থা ফিরিয়ে না তোলা পর্যন্ত কোন দায়িত্বপূর্ণ টাকাকড়ির ব্যাপার তাদের হাতে দেওয়া যায় না।

পূর্বে থেকে বোঝা যায় না, পরের টাকা হাতে পেলে লোকে তা আত্মসাৎ করবার লোভ দমন করতে পারবে কি-না। আমাদের কারখানার শ্রমিকেরা হাতে টাকা জমিয়ে যেদিন ধনী হয়ে দাঁড়াবে, সেদিন আমার শ্রম সফল হয়েচে বিবেচনা করবো।

কেন্দ্র থেকে শত শত মাইল দূরবর্তী দোকানগুলিতে ইতিমধ্যেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। এই দোকানগুলিতে সর্বাগ্রে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক, নতুবা অতদূরের দোকান বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আমরা ব্যক্তিগতভাবে দূরবর্তী দোকানগুলির তত্ত্বাবধান করতে পারি না বলেই সেখানে এমন বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজনীয়, যার ফলে তাদের কাজকর্ম সুশৃঙ্খলায় চলতে পারে।

এখন দূরের শাখা দোকানগুলি ভালভাবে চলচে, সুতরাং যে নিয়ম তাদের সম্বন্ধে প্রবর্তিত হয়েচে, আমরা সেগুলি মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করি। যেগুলিতে এখনও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বুঝতে হবে তাদের ম্যানেজারেরা এখনও একথা শেখেন নি যে সৎভাবে কাজ করলেই আয় বাড়ে ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ বিষয়ে কঠোর আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে, যিনি সংযমী, লক্ষ্মী তাঁকেই আশ্রয় করেন।

দোকানের ম্যানেজার যাঁরা, তাঁদের অর্থনৈতিক দৃষ্টি এজন্যে যথেষ্ট স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তাঁরা নিজের উন্নতি করতে পারবেন না। নিজের অবস্থা যাদের ভাল নয়, শ্রমিকদের অবস্থা তাঁদের দ্বারা ভাল হতে পারে কি? আমরা আর্থিক সাহায্য দ্বারা কোন ম্যানেজারের অবস্থা ভাল করিয়ে দিতে পারি না—এতে ফল হবে উল্টো। তারা পরের ওপর নির্ভরশীল হবে, নিজের সম্পত্তি নিজে বাড়াবো এ আত্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে জন্মাবে না।

যে লোকের আত্মোন্নতি করবার চেষ্টা নেই, তার দ্বারা ভাল কাজ হয় না। শুধু আত্মবিশ্বাসী, অভিজ্ঞ সঞ্চয়ী ও সংযমী লোকেরাই এ জগতে ধনী হতে পারে, বড় বড় ব্যবসা চালাতে পারে, নিজের অবস্থা ও দেশের অবস্থা ফেরাতে পারে। আবার দেখা গিয়েচে, অনেক লোকের উচ্চাশা আছে কিন্তু সঞ্চয়ের অভ্যাস নেই, এক পয়সা জমাতে জানে না। যাদের পকেট খালি, এমন লোকে বর্তমান অর্থনৈতিক জটিলতার দিনে কি করে বড় ব্যবসায়ে হাত দিতে পারে? ব্যবসা সুপ্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমিকদের সঞ্চয়ী হতে শেখাতে হবে।

এই নিয়মে আমাদের কারখানা চলচে। কোন ব্যাঙ্কের কাছে আমাদের ঋণ নেই, কাঁচামাল কিনে তখনি তার দাম শোধ করে দিই। শ্রমিকদের সঞ্চয় জমা হয়ে থাকে আমাদের কারখানার ব্যাঙ্কে। যখন যে চায়, তখনি তার টাকা মায় সুদ শোধ দেওয়া হয়।

স্বরাজের পথে অগণ্য বাধা

কয়েকটি প্রধান বাধা এখানে বলি। কারখানায় বা ব্যবসায়ে যারা অকর্মণ্য ও ফাঁকিবাজ, তারাই বড় বাধার সৃষ্টি করে। তাদের সব সময়েই ভয়, তাদের চাকরি যাবে, তাদের চেয়ে ভাল লোককে এনে ঢোকান হবে। মানুষ যদি নিজেকে অপরিহার্য করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে, তবেই তার উন্নতি।

ফাঁকিবাজ লোকে সর্বদা অপরের উন্নতিতে হিংসা করে। তার মনে সর্বদা ভয়, অন্য কেউ

তাকে ছাড়িয়ে গেল বুঝি। কিন্তু কর্মকুশল ব্যক্তির সময় নেই হিংসা করবার। সে শ্রমিকদের মধ্যে সৎকর্মের ও সদিচ্ছার বীজ বপন করে তাদের শিক্ষিত করে তুলবে। তার সময় ব্যয় হয় নিজের ও তার মনিবের ব্যবসার উন্নতিকল্পে। চিফ্‌ ডিরেক্টারের আপিসে যদি লেখা থাকে 'প্রবেশ নিষেধ,' সে তার জন্যে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। সে নিসংকোচে আপিসে ঢুকে চিফ্‌কে অভিবাদন জানায়, চিফ্‌কে বুঝতে দেয় সে নিজের বিবেকমত কর্তব্য সম্পাদন করে চলেচে, কাউকে সে ভয় বা খাতির করে চলে না।

একটি কথা আমরা যেন সর্বদাই মনে রাখি। যে কাজে লাভ কম, আয় সামান্য সে কাজে লক্ষ লক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান, কিন্তু যে কর্মে বা ব্যবসায়ে বুদ্ধি, উৎসাহ, কৌশল ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অনেক কম—কারণ তার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা কোন দেশেই বেশি থাকে না।

অনেকের বিশ্বাস আছে পৃথিবীতে মাত্র মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিব স্থান আছে। প্রাচীন দিনেব কৃষকেরা এ ধারণা পোষণ করতো, আমরা সেই কৃষকদের বংশধর, সেই বিশ্বাস আমাদের রক্তেও বর্তমান। কৃষকেরা ঐশ্বর্য মানে বোঝে জমি। পৃথিবীতে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যে আয় বা উন্নতি সীমাবদ্ধ নয়, যত লোক এতে খাটে, সকলেরই উন্নতির উপায় আছে।

আমাদের কারখানার কথাই ধরা যাক। এর যত উন্নতি হবে, এব শ্রমিকদের তত উন্নতি। কলকব্জায় তেল দেওয়ার মত, যত তেল দেবে, তত ভালভাবে কল চলবে। যে লোকের সঞ্চয় নেই, সঞ্চয়ের বুদ্ধি নেই—সে লোক দ্বারা আমাদের কাজের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। সে শ্রমিককে আমবা তৈলবিহীন মরচে-ধরা কলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

কারখানাকে দেখতে হবে একটি গৃহস্থালী। ম্যানেজার বাড়ির মালিক, শ্রমিকেরা গৃহস্থালীব লোক। সমস্ত কারখানা নিয়ে একটি সুবৃহৎ পরিবার। পরস্পরের বিপদে পবস্পরে সাহায্য করবে, একজন অপরকে সাহায্য করবে—শুধু কারখানার মধ্যে নয়, কারখানার বাইবেও। যদি কোন শ্রমিকেব কোন বিপদ ঘটে, তবে কারখানার ম্যানেজার ভাববেন এ তাঁর নিজেরই বিপদ। এই মনোভাব প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে আনতে চেষ্টা করতে হবে। এর মূলে রয়েচে আত্মসংযম। তবুণদের মধ্যে এ শিক্ষা প্রচার করতে হবে—কারণ মদ্যপান, ধূমপান প্রভৃতি অপব্যয়ের পথে এখনও তারা পা বাড়ায় নি, কিংবা বাড়ালেও এখনও কুঅভ্যাসগুলি বদ্ধমূল হয়ে ওঠে নি তাদের মধ্যে।

আমাদের বিশেষ চেষ্টা হবে এই জন্যে, তরুণদের সুশিক্ষা। চোদ্দ বছব বয়স থেকেই যাতে তারা পরিবারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার বহু পূর্বে সম্পূর্ণরূপে আর্থিক সাচ্ছল্য অর্জন করতে পারে, তার ব্যবস্থা কবতে হবে।

তরুণদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়া আরও একটা বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—২৪ বৎসব বয়স পূর্ণ হবার সময় তার হাতে যেন কিছু মূলধন জমে। তাদের ব্যক্তিগত আয় যদি প্রতি বৎসর বেড়ে চলে, ১৪ বৎসর বয়স থেকে—তবে দশ বৎসরের মধ্যে হাতে মূলধন জমা খুব কঠিন হবে না।

নারীশিক্ষা আমাদের একটি প্রধান কর্তব্য। তবে মেয়েদের শিক্ষা হবে অন্য ধরণের। রন্ধন বিদ্যা উপযুক্তভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের স্কুলে। উৎকৃষ্ট রন্ধন স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। রন্ধন বিদ্যা আজকাল বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নীত হয়েচে। পোষাক পরিচ্ছদ সেলাই করা, শিশুপালন, গৃহকর্ম প্রভৃতি বিষয়েও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষিতা গৃহিণী তাঁর বুদ্ধি

ও সৃজনী প্রতিভা দ্বারা গৃহস্থালীকে কিভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে পারেন এ সম্বন্ধে অনেকের কোন জ্ঞান নেই।

মেয়েদের সঞ্চয়ী হবার প্রয়োজন নেই তা নয়, তবে ছেলেদের মত অতটা নয়। মেয়েদের আয় কম, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় বেশি। তবুও তাদের হাতে টাকা থাকা উচিত, তাদেরও কিছু কিছু সঞ্চয় করা প্রয়োজন। সচ্ছল অবস্থার মেয়েকে ছেলেরা বিবাহ করতে চাইবে, বিশেষ করে সে মেয়ে যদি শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা হয়।

দু'টি তরুণ-তরুণী বিবাহ করে যখন সংসার পাতবে, তখন উভয়ের সঞ্চিত অর্থ হবে সেই সংসারের মোট মূলধন। স্বাধীনভাবে থাকবার সময়ে উভয়ের মধ্যে যে সঞ্চয়প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছিল, দশ বৎসর ধরে তারা যে অভ্যাসের সুব্যবহার করে এসেচে—সেই অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস তাদের সাহায্য করবে সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাদের সংসারটি দাঁড় করাতে। মূলধন হাতে থাকাতে তারা এখন থেকে পুঁজিবাদী মহাজন হয়ে পড়বে এবং কারখানার ব্যাঙ্ক থেকে এই মূলধনের সুদ পাবে। এই সুদ থেকেই সংসারের খরচ চলে যাবে, যদি বুঝে চালান যায়। কারখানার শ্রমিক-সমস্যার এ একটি সুন্দর সমাধান।

অনেকে ভাববেন, আমরা সকলেই যদি ধনী হই, এত টাকা খাটাবো কি করে? সুদ দেবে কে? এসব দুর্ভাবনার কোন আবশ্যক নেই। টাকা খাটাবার বহু রাস্তা আছে। সারা সপ্তাহ টাকা জমিয়ে এক মিনিটে টাকা খাটানোর বহু পথ আবিষ্কার করা যাবে। তবে অনেক পথ আছে, যা প্রলোভনে ফেলে মানুষকে নষ্ট করে। সে বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে।

মাতাপিতা ও সন্তান

তরুণ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শিক্ষার পক্ষে প্রধান বাধা তাদের পিতামাতা। বহু পিতামাতা বিবেচনা করেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের উপার্জিত অর্থ তাঁরা ইচ্ছামত খরচ করবার অধিকারী। সন্তানও কখনও এ টাকার হিসেব নেয় না পিতামাতার কাছ থেকে। অশিক্ষিত পরিবারে পুত্রকন্যা উপার্জনক্ষম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসে আর সরাইখানায় বসে বিয়ার পান করে ফূর্তি করে।

ফলে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, শ্রমিকেরা তার বিবাহের পূর্বে দশ বৎসর হয়তো খাটচে; হাতে এক কানা কড়িও জমে নি। বস্তুত, জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা হয় নি। সে যে পোষাক পরচে, অনেক সময় তার দাম পর্যন্ত সে জানে না। কারণ তার মা এটা কিনেচে।

এর ফলে কি ঘটে? তার স্বোপার্জিত অর্থে কোন আগ্রহ থাকে না, কাজে উন্নতি করবার চেষ্টা হয় না তার, এবং সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উপার্জনের ফল ভোগ করতে না পারলে কর্মে আনন্দও সে পায় না।

পুত্রকন্যা বয়োপ্রাপ্ত হ'লে বৃদ্ধ পিতামাতাকে সাহায্য করা তাদের কর্তব্য, ছোট ছোট ভাই-বোনকে মানুষ করে তুলতে তারা পিতামাতাকে সাহায্য করবে। কিন্তু এ অবস্থায় পিতামাতা সন্তানের উপার্জিত অর্থ পারিবারিক ঋণস্বরূপ গ্রহণ করবেন এবং একজনের ঘাড়ে বোঝা না চাপিয়ে সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন।

তাঁরা এটা দেখবেন সন্তানের উপার্জিত অর্থ সম্বন্ধে যেন সন্তানের অধিকার বলবৎ থাকে। সন্তানেরা যদৃচ্ছাক্রমে খরচ করুক, তবে তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন অযথা ব্যয় বা অসৎকার্যে ব্যয় তারা না করে। এমন কি ছ'বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের নিজের টাকার ওপরে যেন তার অধিকার জন্মায়, যত সামান্যই হ'ক সে বালক বা বালিকার পুঁজি।

ব্যবসা ও বিশ্বাস

আমরা এমন ব্যবসা যেন করি, যার দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য জনসেবার একটি রূপ। ব্যবসায়ীরা এ সত্য যত গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন, তাঁদের ব্যবসা ততই বিস্তৃত হবে। আমি অনেক সময় ব্যবসাক্ষেত্রে কোন পথে যাব, চিন্তায় পড়ে শিখেছি। শেষে মনস্থ করলাম যে পথে গেলে পাঁচজনের উপকারে লাগতে পারি, সেই আমার পথ।

কিন্তু যে পথে শুধু নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে গিয়েছি, পরিশেষে তাতে আমি এবং জনসাধারণ উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। ব্যবসায়ে উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব বর্জন করতে শিখি। ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্যের পথে আমরাই আমাদের শত্রু।

জুতোর কারখানায় চামড়া থেকে টুকরো কাটবার দোষে অনেক ক্ষতি হয়। চামড়ার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে, জুতোর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কোয়ালিটির চামড়ার দরকার হয়। হয়তো সস্তাদামের জুতো তৈরি করবার সময় মিস্ত্রিরা ভাল চামড়া থেকে কেটে সস্তা জুতোর অংশের জন্যে খানিকটা দামি চামড়া বের করে নিলে। কিন্তু অভিজ্ঞ মিস্ত্রি ঠিক উল্টো করতে পারতো- খারাপ চামড়া থেকে সে ভাল ও দামী জুতোর ক্ষুদ্র অংশের জন্যে ভাল টুকরো কেটে নিতে পারত।

চামড়া কাটার দরুন কারখানার যে লোকসান হয়, তার পূরণের একমাত্র উপায় চামড়া কাটতে শেখানো মিস্ত্রিদের। তাদের বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি অর্জন করলে তবেই পাওয়া যাবে। এ কাজে হিসাব করতে শেখা দরকার, এখন কারখানার ম্যানেজার ও তার কয়েকজন অভিজ্ঞ সহকর্মী দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে--কিন্তু তা হ'লে চলবে না, প্রত্যেক শ্রমিককে এ কাজ শিখিয়ে নিতে হবে।

এই বিষয়ে জটিল হিসাব অত্যন্ত গোপনে রাখা হয়, ম্যানেজার ও সর্দার মিস্ত্রিদের ডেস্কে লুকোনো। ডেস্কের চাবি খুলে দিতে হবে, এ বিদ্যা প্রত্যেক মিস্ত্রিকে শেখাতে হবে বিশ্বাস করে। জানি এই সব হিসাব বাইরে যাওয়া উচিত নয়, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী কারখানার মালিকের হাতে পড়লে তারা এর অনুকরণ করে আমাদের হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু যখন আমরা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সাপ্তাহিক আয়ব্যয়ের হিসাব নোটিস বোর্ডে টাঙ্গানোর বন্দোবস্থা করেছি, তখনই ব্যবসায়ের অনেক গুপ্তকথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করবার ঝুঁকিও সেই সঙ্গেই গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকেরা উৎসাহ ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ কখনই করতে পারে না, যদি তারা নিজ নিজ বিভাগের কাজের পরিমাণ, লাভ-ক্ষতির হিসাবের অবস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় না ঘটে।

এর চেয়েও ভয় আছে, ট্যাক্স আদায়কারী তার হিসেবের খাতা নিয়ে ছুটে আসবে, বর্ধিত হারে ট্যাক্স ধরতে। প্রত্যেক ব্যবসাদারেই জানে এ কত বড় বিপদ, অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স দিতে গিয়ে কত ব্যবসা ফেল মেরেছে।

এ বাধাও আমরা জয় করেছি। আমাদের আগে ব্যবসাদারদের ধারণা ছিল, ট্যাক্স আদায়কারীকে

প্রতারণা না করলে ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তার কারণ, আমাদের মধ্যে কেউ ট্যাক্সসংক্রান্ত আইনগুলি জানবার চেষ্টাও করতো না। আমরা সর্বপ্রথম এ বিষয় অবগত হয়ে আমাদের হিসাবের খাতা-বই ট্যাক্স আদায়কারীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে এবং অন্য পাঁচজনকে অবাক করে দিই।

আমাদের ব্যবসার ভিত্তি এবার দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ব্যবসাসংক্রান্ত কোন কিছুই সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে ঢেকে রাখবার আর আবশ্যক রইল না। প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের কাজকর্ম চলতে লাগল আমরা যা করি, সবাইকে জানিয়ে করি। প্রত্যেক শ্রমিক জানে আমাদের লাভ ক্ষতির অবস্থা কি।

একবার একটা চামড়া শোধন করবার কারখানায় বড় মজা হয়েছিল। সে কারখানার ম্যানেজার কর্মদক্ষ লোক ছিল বটে কিন্তু হিসাবের খাতা লুকিয়ে রাখতে ভালবাসত। যখন তাকে বলা হ'ল তার ডিপার্টমেণ্টের সব লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রত্যেক সপ্তাহে নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে হবে এমন কি তার ব্যক্তিগত হিসাব পর্যন্ত তখন লোকটা রেগে আগুন হয়ে বললে "অসম্ভব! আমার ব্যক্তিগত আয়ব্যয়ের হিসাব আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত দেখাই নে -তাই টাঙাতে হবে নোটিস বোর্ডে? আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

অজ্ঞ লোকের ধারণা বদলাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় বই কি। পুরাতন নিয়মের ভিত্তি ছিল মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য দাবী উপস্থাপিত করতো, তখনই কারখানার ম্যানেজারদের মুখের বুলি ছিল, "কোথা থেকে দেব? লোকসান খেয়ে ব্যবসা চালাতে হচ্ছে।" শ্রমিকের মুখ বন্ধ করবার পক্ষে এটা ছিল ব্রহ্মাস্ত্র।

কিন্তু বর্তমান যুগে এ নিয়ম অচল। লাভ ক্ষতির হিসাব লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে কোন লাভ নেই। এখন সমস্ত দলিলপত্র, হিসাব মাল উৎপাদনের পরিমাণ লাভ লোকসানের পরিমাণ ম্যানেজারের মস্তিষ্ক থেকে দিবালোকে দশজনের সামনে খাড়া করে তাদের বিশ্বস্ত হতে হবে।

অনেকে বলবেন, ইতিহাস পড়ে দেখ—নেতার মতলব ফেঁসে যাওয়াতে বড় বড় যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল না কি? আমরা একথা বিশ্বাস করি না অক্ষম নেতার অক্ষম কৈফিয়ৎ বলেই এগুলিকে মনে করি। যুদ্ধে সে কারণে কেউ হারে না যুদ্ধে হারবার আসল কারণ দাঁড়ায় নেতৃবৃন্দের অহমিকা, দম্ভ ও অক্ষমতা।

যত ভাল চিন্তা বা পরিকল্পনা হ'ক না কেন, মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে কারারুদ্ধ থাকলে তা ফুরিয়ে গেল। ভাল আইডিয়াকে মানুষের মনে আবদ্ধ করা চলবে না। ও জিনিস হীরকের মত, অপর একজন বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের শান পাথরে শান দিলে তবে ওর দীপ্তি বাড়বে।

আমার কাছে অনেক লোক এসে চুপি চুপি বলে, "মস্ত বড় একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। পেটেণ্ট আপিসে নিয়ে গিয়ে পেটেণ্ট করাবো। আপনার কাছে শুধু বলছি কারণ জানি আপনি পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করে আমার এটা নষ্ট করে দেবেন না।" তারপরে কম্পিত হস্তে তার অদ্ভুত আবিষ্কারটা পকেট থেকে বার করে। যত অকিঞ্চিৎকর আবিষ্কার, ততই তাদের ভয় বেশি। আমার হো হো করে হাসতে ইচ্ছে করে এদের এই নিবুদ্ধিতা দেখে। তবে আমার মনে পড়ে যায়, তরুণ বয়সে আমি নিজেও কয়েকবার এই ধরণের 'অদ্ভুত আবিষ্কার' নিয়ে পেটেণ্ট আপিসে ছুটে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছি। তারপর বুঝেছি চিন্তাশীল ব্যক্তির একমাত্র পুরস্কারই হচ্ছে সমস্যার সুসমাধান, আর কিছু নয়।

সমস্যার সমাধান করতে হ'লে চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর মস্তিষ্ককে পূর্ণ বিশ্রামের অবকাশ দেবেন, মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধনের উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করবেন, যেমন ব্যায়ামবীর পালোয়ানেরা ক্রীড়া প্রদর্শনের পূর্বে নিজেদের মাংসপেশী সবল রাখে।

জগতের যত কিছু শক্তি, মানুষের ধনসম্পদ, পৃথিবীর খনিজ ঐশ্বর্য—সব মানুষের চিন্তাশক্তির কাছে পরাজিত, মানব মস্তিষ্কের ভৃত্য। তবে সেই মস্তিষ্ককে কাজে খাটাতে হবে—নতুবা কিছু হবে না।

আমাদের দোকানে বিক্রেতা ও ক্রেতার দ্বন্দ্ব জিনিসের মূল্য নিয়ে এবং শ্রমিকদের ঝগড়া তাদের মজুরি নিয়ে—অনেক চিন্তা করে এ সমস্যার সমাধান করেচি আমি।

কিন্তু আমার কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ঝগড়া ও সন্দেহের কোন মীমাংসা এখনও আমার দ্বারা সম্ভব হয় নি। কারণ শ্রমিকদের আয় নির্ভর করে তাদের ডিপার্টমেণ্টের কাজের পরিমাণের ওপরে। অনেক শ্রমিকদের মনে ধারণা, কাঁচামালের দাম যদি কম দেওয়া যায় এবং উৎপন্ন মালের দাম যদি বেশি নেওয়া যায়, তবেই তাদের ডিপার্টমেণ্টের লাভ বাড়বে, সংগে সংগে তাদেরও আয় বাড়বে।

এ থেকে দাঁড়ায় অসাধু প্রতিযোগিতা। ডিপার্টমেণ্টের অযথা পরিশ্রম ও কাঁচামালের অপব্যয় হয় এ থেকে। মনে রেখো গ্রীসের সর্বাপেক্ষা বড় ব্যবসাদার আলেকজান্দারকে কি জবাব দিয়েছিলেন। আলেকজান্দার তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি কি করে এত ধন উপার্জন করলেন?"

তিনি উত্তর দিলেন—"আমি বেশি দাম দিয়ে জিনিস কিনি এবং সস্তায় বেচি।"

আমাদের দোকানে দরদস্তুর নেই। জিনিসের বাঁধা দর- সেই প্রথম এবং সেই শেষ কথা। খরিদ্দারের গুপ্ত মনোভাবকে পূর্ব থেকে বুঝে নিয়ে আমরা কাজ করি। আমাদের সাফল্যের মূলে দু'টি ব্যাপার থাকা আবশ্যক—রাষ্ট্র, দেশ ও আমাদের ক্রেতাদের ওপর আমরা যেমন সাধু ব্যবহার করবো, আমাদের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের মধ্যেও যেন পরস্পরের প্রতি সাধু ব্যবহার করে। সবাই মিলে মিশে পরস্পরের সহযোগিতা করেই আমরা জনসাধারণের সেবা করতে পারি এবং আমাদের অবস্থাও সচ্ছল করে তুলতে পারি।

কারখানায় স্বরাজের আদর্শ

টমাস বাটার মনে কারখানার স্বরাজ সম্বন্ধে যে আদর্শ প্রথম উঁকি দিয়েছিল তার ফলে শ্রমিক আর শুধু শ্রমিক থাকবে না, সেও ব্যবসায়ী হয়ে উঠবে, এটা তিনি বুঝেছিলেন।

শ্রমিক শুধু তার মজুরি চায়। কিন্তু সে যখন তার বিভাগের লভ্যাংশ পাবে, তখন সে ব্যবসায়ী হয়ে উঠবে। সে চাইবে নব নব পন্থার আবিষ্কার করতে, জনসাধারণের সেবা করতে। কারখানার স্বার্থ ও তার ব্যক্তিগত স্বার্থ তখন হয়ে উঠবে অভিন্ন। যে শ্রমিক শুধু মজুরি চায়, সে তার মজুরির অনুপাতে খাটবে। কারখানার উন্নতিকল্পে সে নব পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করবে না। কিন্তু যখন শ্রমিক বুঝবে, এ কারখানা তাদের নিজেদেরই, তখন সে অন্য মানুষ হয়ে উঠবে। তার মস্তিষ্ক থেকে এমন পন্থা বার হবে, যার পরিমাপ নেই কিন্তু ক্রেতারা উপকৃত হবে তা থেকে।

ব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করচে সেই ব্যবসায়ের ম্যানেজার, শ্রমিক, বিক্রেতা প্রত্যেকটি মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি, উদ্যম, আবিষ্ক্রিয়া ও কর্মকুশলতার ওপর। যে যত ছোট কাজই করুক না কেন, নিজের নিজের বিভাগের কাজ যাতে ভাল চলে, এজন্যে সে যদি পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করে তবে তাদেরও উন্নতি, ব্যবসায়েরও উন্নতি।

ইউরোপে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে সব বড় বড় কারখানা ও ব্যবসায় চলেছিল, সবই পুরাতন পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ করে। শ্রমিক তার মজুরি আদায় করে চলে যেত, তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব সেখানেই শেষ হয়ে গেল। এ নিয়মের একটা প্রধান দোষ, এতগুলি শ্রমিকের মস্তিষ্ক ও আবিষ্ক্রিয়া শক্তিকে সম্পূর্ণ অলস রাখা। সব সময় মনে রাখতে হবে, মানুষ বিনা স্বার্থে খাটে না। তাকে তোমার ব্যবসায়ের ভাগীদার কর, সেও তোমার ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ভাববে, পরিশ্রম করবে। তার মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান জন্মাবে ক্রমে ক্রমে।

বেতন দিয়ে লোক খাটানো অতি প্রাচীন প্রথা—নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন অন্তে শ্রমিক তখনি তার পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ প্রথার দোষ এই, এতে শ্রমিকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব জন্মায় না—বিশেষ করে উৎপন্ন মাল সম্বন্ধে।

শ্রমিক মাল তৈরি করে কারখানার মালিকের কাছে মাইনে পেলে। উভয়ের সম্পর্ক এখানেই শেষ। মালের ক্রেতার সঙ্গে শ্রমিকের কোন সম্পর্ক নেই। বাঁধাধরা বেতনভোগী শ্রমিক একথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না সে মাল কাটবে কোথায় বা কাটবে কিভাবে।

বড় কারখানার পূর্বের যুগে যখন কারিকরে ছোট্ট দোকানে নিজের হাতের তৈরি নিজে বিক্রী করতো তখন তাদের দায়িত্ব ছিল অন্যরূপ। একই লোককে কাঁচামাল কিনতে হ'ত, জিনিস তৈরি করতে হ'ত বিক্রী করবার ফন্দি খুঁজতে হ'ত। যে মিস্ত্রি জুতো তৈরি করতো, জুতো সেলাই করেই তার দায়িত্ব শেষ হ'ত না। তাকে ভাবতে হ'ত, চামড়া কিভাবে সে কাটবে, কিভাবে ভাল জুতো তৈরি করবে—যাতে বাজারে তার নাম হয় ক্রেতা তার দোকানেই আসে। এরেই জিনিস বেচে সে দু'পয়সা আয় করতে পারবে। সস্তায় তাকে মাল কিনতে হবে, মজবুত করে জুতো সেলাই করতে হবে, ক্রেতার সঙ্গে মিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে- তবে তার মঙ্গল, তার ব্যবসায়ের মঙ্গল।

টমাস বাটা এরকম ছোট জুতোর কারখানার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর বাল্যকালে। সেজন্যে তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্বের মূল্য সব সময় বুঝতেন। বর্তমান যুগোপযোগী বিরাট কারখানার সঙ্গে ক্ষুদ্র দোকানের মালিকের মনোভাব—এই উভয়ের শুভসংযোগ সাধিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। কাজেই তিনি কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরণের দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা, উৎসাহ, কঠোর শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী জাগ্রত করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা শ্রমিকদের দ্বারা বাস্তবে পরিণত হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই ব্যবস্থাবিধিকেই তিনি বলতেন "কারখানায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।" প্রত্যেক শ্রমিক তার ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ অনুযায়ী নিজেদের ডিপার্টমেন্টের পরিচালনার অধিকার প্রাপ্ত হবে—এই ছিল টমাস বাটার আদর্শ।

স্বরাজ প্রতিষ্ঠা

স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকে বাস্তবে পরিণত করবার মূলে এই নীতি বিদ্যমান, "তৈরি মাল কারখানা থেকে ক্রেতার হাতে পৌঁছবে।"

কারখানার মালিক কাঁচামাল কিনে নিজের তত্ত্বাবধানে মাল তৈরি করাবেন এবং তিনিই সেই তৈরি মাল সোজা ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। তাঁকে নজর রাখতে হবে ব্যবসায়ের তিনটি প্রধান অঙ্গের দিকে:—কাঁচামাল ক্রয়, তৈরি মালের উৎপাদন ও বিক্রয়।

প্রত্যেক কারখানা প্রকৃতপক্ষে বহুশত ডিপার্টমেণ্ট ও তাদের শ্রমিকগণের সম্মেলন, যার মধ্যে প্রত্যেকটি শ্রমিকের স্বতন্ত্র দায়িত্ববোধ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিদ্যমান। ডিপার্টমেণ্টগুলিরও প্রত্যেকটির যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, এই অর্থে যে,

(১) প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে এমন একজন লোক আছে, যে তার নিজের ডিপার্টমেণ্টের কাজকর্ম, লাভ ও ক্ষতির জন্য দায়ী।

(২) প্রত্যেক সপ্তাহে বিভাগীয় লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রকাশিত হয়।

(৩) শ্রমিক সর্দার ও বিভিন্ন শ্রমিকের অধিকার থাকবে তাদের বিভাগের কর্মপদ্ধতির অদলবদল বা সুপরিচালনা সম্বন্ধে।

(৪) প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

(৫) কোন বিভাগের কর্ম সম্বন্ধে গোটা কারখানায় সম্মিলিত দায়িত্ব।

কারখানার পরিচালনা

এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সকল কর্মীর দায়িত্ব স্বীকৃত হয়, সুতরাং পরিচালনা বিষয়ে প্রত্যেকেই তার মত ব্যক্ত করবার অধিকারী।

প্রত্যেক বিভাগে একজন ম্যানেজার আছে। তার হাতে কিছু মূলধন দেওয়া আছে এবং সে মূলধন উপযুক্তরূপে ব্যবহার করবার স্বাধীনতা আছে তার। সে মূলধন শুধু অর্থ নয়--সেই বিভাগের কামারশালা, যন্ত্রপাতি, শ্রম ইত্যাদি সেই অলিখিত মূলধনের অন্তর্ভুক্ত। এই সব মূলধনের সুপ্রযোজনা তার প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য। সমগ্র কারখানার বিভিন্ন বিভাগগুলির সহযোগিতায় ব্যবসায়ের মূল নীতি ও চুক্তি নির্ধারিত হয়। এই সব চুক্তি হিসাব বিভাগের কর্মচারিগণ ও কারখানার ডিরেক্টরগণ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি চুক্তিতে কোন গোলমাল থাকে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ সে বিবাদের মীমাংসা করেন।

তৈরি মালের দাম নির্ধারিত হয় রীতিমত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে। এক ডিপার্টমেণ্ট অন্য ডিপার্টমেণ্টের হাতে মাল দেওয়ার সময় মনে করে যে অন্য একটি ফার্মের হাতে মাল দেওয়া হ'ল। বিভাগীয় কণ্ট্রোলারগণ মালের তত্ত্বাবধান করেন, তাঁরা দাম ঠিক করবার সময়ে ম্যানেজারদের মুখ চেয়ে কাজ করেন না বলেই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন।

এ বৎসরের কাজের প্ল্যান নির্ধারিত হয় তার পূর্ব বৎসর। এই প্ল্যান ঠিক হয় সব ডিপার্টমেণ্টের প্ল্যানগুলি একত্র করে আনুমানিক মূল্য, মাল তৈরি ও বিক্রীর খরচগুলির ওপর ভিত্তি করে। বার্ষিক প্ল্যান আবার দৈনিক আটঘণ্টা কাজের ও দৈনিক মাল তৈরির পরিমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সবদিকের হিসাব নখদর্পণে না রাখলে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করা যায় না।

কর্মে শৃঙ্খলা ও প্ল্যান

(দৈবকে জয় করতে হবে)

প্রত্যেক কর্মে আজকাল দৈব নিজের লীলা প্রদর্শন করে—কিভাবে কখন দৈব আবির্ভূত হবে, পূর্ব থেকে তা বলা যায় না।

এমন সব ব্যবসা আছে, যেখানে দৈব ব্যবসায়ের সর্বময় কর্তার অপেক্ষাও শক্তিধর। প্রত্যেক বৎসর দৈবের ক্রিয়া লক্ষ্য করার ফলে শেষে লাভ-ক্ষতির হিসাবের ব্যালান্স-শিটের মধ্যেও দৈব এসে পড়ে।

দৈবের মস্ত বড় শত্রু ছিলেন টমাস বাটা। মাল তৈরির ব্যাপারে যতদূর সম্ভব তিনি দৈবকে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করতেন। ছ'মাস পূর্বে প্রত্যেক বিভাগের খুঁটিনাটি প্ল্যান খাড়া করা হয় তার মধ্যে মালের দাম, মালের পরিমাণ, অর্থ, তৈরি মালের সংখ্যা সব ধরা থাকে এমন কি ম্যানেজারের আয় হবে কত পার্সেন্ট, শ্রমিক পাবে কত পার্সেন্ট—সে সব পর্যন্ত।

প্রত্যেক শ্রমিক তার আয়ের পরিমাণ নোটবইতে লেখে—ফার্ম থেকে এই নোটবই দেওয়া হয় প্রত্যেক শ্রমিককে। স্কুলে ছাত্রদের ব্যক্তিগত হিসাব রাখার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

বাটার কারখানাগুলিতে মাল ক্রয়, মাল তৈরি ও মাল বিক্রীর বিশেষ প্ল্যানগুলি ছ'মাস পূর্ব থেকে করা হয়ে থাকে। বাটার ক্যালেন্ডারের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ দিনের কাজের প্ল্যান করা থাকে। বাকী ৬৫ দিনের প্ল্যান পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয় না। এক সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হয় পূর্ণ বেতনে।

সমগ্র বিভাগের সম্মিলিত প্ল্যান অনুযায়ী সমস্ত কারখানার প্ল্যান ধার্য হয়। ম্যানেজারেরা এই সব প্ল্যান তৈরি করেন, প্রত্যেক মজুরের ঊর্ধ্বসংখ্যায় কর্মের পরিমাণ কত তাও এ প্ল্যানের মধ্যে ধরা থাকে। মাল তৈরির প্ল্যানের মধ্যে প্রত্যেক মজুর, প্রত্যেকটি যন্ত্রের কর্মের পরিমাণ ধরা থাকে।

যদি কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্ল্যান অনুযায়ী কর্ম শেষ না হয়, তবে বাকি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। একে 'স্টর্ণো' বলে। প্রত্যেক বিভাগের প্রখর দৃষ্টি থাকে যাতে তাদের বিভাগে 'স্টর্ণো' ঘোষিত না হয়, অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে চেষ্টা করে প্রাণপণে।

যে বিভাগের কাজে 'স্টর্ণো' ঘোষিত হয়, সে বিভাগের বাকি কাজ অন্য বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়—বাড়তি লাভ তখন সেই বিভাগের শ্রমিকদের হস্তগত হয়—কর্মে শৈথিল্য প্রদর্শনের দণ্ডস্বরূপ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি চামড়ার কারখানা বিক্রয় বিভাগকে উপযুক্ত পরিমাণ জুতো সরবরাহ করতে না পারে এবং যদি এই শৈথিল্য ঘটে কাঁচামালের অভাবে তবে কাঁচামাল ক্রয় বিভাগ এজন্য দণ্ডিত হয়ে থাকে। এই দণ্ডের ভয়ে সব বিভাগ সতর্ক থাকে যাতে তারা প্ল্যান অনুযায়ী কর্ম সম্পন্ন করতে পারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এই কর্মপদ্ধতির ওপর হাজার হাজার শ্রমিকের রুটি নির্ভর করচে সুতরাং সকলেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হিসাবে বিবেচনা করে।

এই 'স্টর্ণো' ঘোষণা দ্বারা দণ্ডদানের পদ্ধতি প্রত্যেক কর্মদক্ষ শ্রমিককে উৎসাহ দান করে, কারণ সে জানে তার সহকর্মীর কর্মশৈথিল্যের জন্য সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

নেতৃবৃন্দের শিক্ষা

বাড়ি বা যন্ত্রপাতি -ইঁটপাথর এবং লোহাও স্তূপ মাত্র। মানুষই তাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে। যে কোন কাজই হ'ক না কেন, নেতৃবৃন্দের সুশিক্ষার ওপর তার সাফল্য নির্ভর করচে। চমৎকার কলকারখানা, খুব পরিশ্রমী ও কর্মদক্ষ শ্রমিকদল, কিন্তু নির্বোধ ও অকর্মণ্য নেতা—সব মাটি।

কলকারখানার ম্যানেজার যদি ভাল না হয়, তবে খুব যন্ত্রপাতি এবং শ্রমশীল সহরেও সে ব্যবসাকে দাঁড় করাতে পারে না।

টমাস বাটা এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি সুরু থেকেই তাঁর বিরাট কারখানার শত শত বিভিন্ন বিভাগের আজ যারা কর্ণধার, তাদের শিক্ষা দেবার সুব্যবস্থা করেছিলেন—যাতে তারা কর্মনিপুণ ও সংযমী নেতা হয়ে উঠতে পারে। এই শিক্ষাব্যবস্থার গুণগান করে নি এমন নেতা আমি দেখি নি—এমন কি যারা আমাদের কারখানা ছেড়ে অন্যত্র বেরিয়ে গিয়ে আমাদের সংগে ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েচে, তাদেরও বলতে শোনা গিয়েচে, "বাটার স্কুল থেকে অনেক কিছু শিখেচি বটে।"

টমাস বাটা বলতেন, "যখনই দেখি খারাপ গোড়ালি-ওয়ালা অ-মজবুত জুতো কারখানা থেকে বেরিয়ে আসচে, তখনই ভাবি কারখানার কোন বদলোকটা এমন জুতো তৈরি করলে—এ কুশিক্ষা সে পেলে কোথায়। কুচরিত্রের লোকে কখনো সুন্দর কাজ করতে পাবে না।"

আমার একটা ঘটনার কথা মনে আছে। এ সময়ে বাটা কর্ম সম্বন্ধে সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একবার চামড়ার উপযুক্ত ব্যবহার ও মিতব্যয়িতার ভারপ্রাপ্ত জনৈক ডিরেক্টর, তাঁর বয়স বছর ত্রিশ হবে—একটি বাড়িতে অবস্থিত কুড়িটি বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এই কুড়িটি বিভাগে যাতে আরও ভাল কাজ হয়, এই তাঁকে দেখতে হবে। তিনি সেই বাড়িব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসারকে সংগে নিয়ে চিফের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি এক সপ্তাহের জন্যে এই কাজ দেখবো, তা হ'লেই কাজ খুব ভাল চলবে, কারণ আমি আর একবার এই বিভাগগুলিব যথেষ্ট উন্নতি করে গিয়েছিলাম, আমি জানি কি করে তা করতে হবে।"

টমাস বাটা তাঁর এই তরুণ কর্মচারীর উৎসাহপূর্ণ কথা নীরবে শুনলেন। সত্যিই দু'জনের খুব উৎসাহ, কর্মে সাফল্য সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই। তিনি আরও ছ'জন লোককে ঘরের মধ্যে আনলেন—এই ছ'জনের সংগে পূর্বোক্ত কর্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

তারপর বললেন, "মানুষের বয়স ত্রিশ বছর হওয়া একটা সাংঘাতিক ভুল। আমার যখন ও বয়েস ছিল, তখন আমিও ভাবতাম তুড়ি মেরে সব কাজ করে ফেলব। তোমাদেব মত উৎসাহের সংগে আমিও কাজ আরম্ভ করেছিলাম একদিন। এক লাফে তিন পা করে যাই আর কারখানায় প্রত্যেক শ্রমিকের কাজের তত্ত্বাবধান করি।

কিন্তু কিছুদিন পরে কারখানার কাজ আবার খারাপ হতে লাগলো। আবাব আমি খাটি, আরও কড়া নজর রাখি সকলের কাজে। কিন্তু আমার পরিশ্রমে কি হবে? যুবক ছিলাম, খাটতে পাবতাম—কিন্তু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পাবো কোথায়? কেউ আমায় তখন বলে নি যে ভাল জুতো তৈরির মনস্তত্ব ও তৈরির কৌশল দুই-ই জানা চাই, তবে জুতোর ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ ঘটে। আত্মবিশ্বাস ভাল জিনিস, কিন্তু অজ্ঞানের আত্মবিশ্বাস কোন কাজের জিনিস নয়।

মানুষের মন ও হৃদয় লোহা-ইস্পাতের যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি জটিল—একে ঠিক মত চালানো যে কত শক্ত কাজ তা তখনও আমি বুঝতে পারি নি। সেই কাজ আপনাদের সামনে আজ এসেচে।

একটা উদাহরণ আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করি। গত সপ্তাহে আমি একটি কারখানার দোষ সংশোধন করেচি কিভাবে শুনুন। এই কারখানার জুতো খুব খারাপভাবে তৈরি হ'ত।

জুতোর চামড়া ছিল খারাপভাবে কাটা। তিনজন মিস্ত্রির ওপর চামড়া কাটার ভার ছিল। আমি ম্যানেজারকে বললাম, "এই তিনজনের মধ্যে সব চেয়ে ভাল কে?"

একটি মধ্যবয়সী মিস্ত্রিকে তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি তার কাছে দাঁড়িয়ে তার চামড়া কাটা দেখলাম। অপর মিস্ত্রিদের কাজও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে। সেই লোকটাই সকলের চেয়ে খারাপ কাজ করে, লক্ষ্য করে বুঝলাম।

আসল ব্যাপারটা এই, এই মিস্ত্রির চেহারা ভাল, কথাবার্তা ও ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট। সুশ্রী মুখাবয়ব ও ভদ্র ব্যবহারের গুণে সে কারখানার সর্দার মিস্ত্রি ও ম্যানেজারের বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি অর্জন করেছে। তার সহকর্মীদের মধ্যে একজনের চেহারা খারাপ, অন্য লোকটি বেশি কথা বলে না। সুতরাং, যদিও সেই দু'জন এই লোকটার চেয়ে চামড়া অনেক ভাল কাটে, তারা ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারে নি। এ ব্যক্তি নিজের কাঁচা কাজ মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা ঢেকে রেখে ওপরওয়ালা কর্মচারীর সুনজরে পড়েছে। ম্যানেজার তার তোসামোদে ভুলে অপর দু'টি ভাল মিস্ত্রির কাজ ভাল হ'লেও ভাল বলে না, তাদের কাজের কড়া সমালোচনা করে। জুতোর চামড়া কাটা যে খারাপ হচ্ছে, সে দোষ ম্যানেজার ফেলেছে সেই দুই বেচারীর ঘাড়ে।

তা হ'লেই বুঝে দেখুন, এ ম্যানেজার কিরূপ দুর্বল চরিত্রের লোক। যে সুশ্রী মুখ দেখে ভুলে যায় তার কাছে সুবিচারের আশা করা যায় কি? অপর দু'জন মিস্ত্রি যখন দেখলে তারা ভাল কাজ করলেও কেউ তাদের ভাল বলে না, তখন তাদের কর্মে শৈথিল্য এসে পড়লো। ফলে সেই বিভাগ থেকে শুধু খারাপ জুতো ছাড়া ভাল জুতো কিভাবে তৈরি হবে?

অতএব নেতা যে হবে ভাবাবেশ বা হৃদয়দৌর্বল্যকে সে প্রশ্রয় দেবে না, তাকে বিচার করতে হবে লোকের কাজ দেখে, তার মুখ দেখে নয়, তার মিষ্ট কথা শুনে নয়। ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তিকে কাজের ক্ষেত্রে এনে ফেলবার কোন অধিকার নেই নেতার। এই দৌর্বল্য যিনি জয় করতে পারবেন, তিনিই প্রকৃত নেতা হওয়ার উপযুক্ত।

আমি ম্যানেজারকে বললাম, "তুমি এই লোকটাকে বন্ধু করে রেখেছ, কিন্তু ও কাজের শত্রু, সব কাজ ও নষ্ট করছে। অন্য দু'টি মিস্ত্রির চেহারা ভাল নয় এবং কথাবার্তা মিষ্ট নয়, সুতরাং তাদের ভাল কাজও তোমার চোখে মন্দ। সুতরাং তারাও আর ভাল কাজ করে না। তোমার বন্ধুর কাছে গিয়ে বল, যতদিন পর্যন্ত সে নিজের ত্রুটি সংশোধন করে না নিতে পারে ততদিন সে তোমার বন্ধু নয়।"

আমি ম্যানেজারের মুখ দেখে বুঝলাম তার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে সে দ্বন্দ্বের আমিই স্রষ্টা। বন্ধুর বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হবে, বড় খারাপ হয়ে গেল তার মন। কিন্তু লোকটা ছিল ভাল, সুবিচার করার একটা আগ্রহ শেষ পর্যন্ত তার মনে জাগলো। এর ফলে কারখানায় চামড়া কাটার কাজ খুব ভাল চলতে সুরু করলে এর পর থেকে। তা ছাড়া কারখানায় সকলে বুঝলে শক্ত মজবুত চরিত্রের লোক বেশি আদরণীয় হয় তার কাজের জন্যে। আর একদিক থেকেও ভাল হ'ল, সেই সুশ্রী লোকটার মনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল, যার ফলে সে এখন থেকে মন দিয়ে কাজ করতে শিখলে।

আমি একবার মাত্র সেই কারখানায় গিয়েছিলাম অল্পক্ষণের জন্যে। আমি এখনও তাদের কথা ভাবি, তারা এখনও ভালভাবে চামড়া কাটছে। কারখানার যন্ত্রপাতির ঊর্ধ্বে যে অদৃষ্ট ও অদৃশ্য ব্যাপার বর্তমান, তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম বলেই অতগুলো লোকের ভাল করতে পেরেছিলাম সেদিন। নতুবা কি সম্ভব হ'ত?

খাঁটি যন্ত্র

(১৯২৭ সালে কারখানার মিস্ত্রিগণের প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতা)

যন্ত্রের জ্ঞান আমি বড় জ্ঞান বলি না বা তার তত মূল্য দিই না। আমি মূল্য দিই মানুষের চরিত্রের সাধুতা ও সদ্‌গুণের।

যান্ত্রিক নবযুগ আনয়ন করবে। যারা লৌহ নির্মিত ভৃত্য (অর্থাৎ যন্ত্র) তৈরি করতে পারে, তারাই কেবল মানুষকে ক্রীতদাসের কাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু এত বড় যন্ত্র সকলে তৈরি করতে পারে না, আমাদের কারখানায় যে যন্ত্র রয়েছে তা যেমন বিরাট তেমনি জটিল। এই যন্ত্রের অস্তিত্বের দরুন আমাদের মজুরেরা প্রত্যেক দিন ১০০ ক্রাউন উপার্জন করতে পারে এবং ক্রেতাদের জন্যে ২৯ ক্রাউনের জুতো তৈরি করতে পারে।

আমাদের লক্ষ্য হবে কারখানায় এমন লোক নেওয়া, যারা যন্ত্রপাতির কাজ খুব ভাল বোঝে। ভগবানদত্ত সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যবহার যারা না জানে তাদের দ্বারা একাজ হবার নয়। বুদ্ধি যাদের কম তাদের বরং আমি কৃষিক্ষেত্রে হাতের কাজ করতে পাঠিয়ে দেব লোকের উপকার হবে তাতে। সে সব লোককে কলের কাজে লাগালে খারাপ কল তৈরি হবে। খারাপ জুতো কিনে লক্ষ লক্ষ ক্রেতা ঠকবে কারণ খারাপ কলে ভাল জুতো হবে কোথা থেকে?

যন্ত্রের জ্ঞানকে আমি তত বড় করে দেখি না, যত বড় ভাবি চরিত্রকে। প্রকৃত চরিত্রবান লোক ছাড়া উৎকৃষ্ট যন্ত্র তৈরি হয় না। আমাদের দেশে এরকম লোক পাওয়া কঠিন। তবুও আমি আমার দেশের দেড়কোটি লোকের মধ্যে সেই রকম একজন লোক খুঁজে বার করবো এই আমার সংকল্প। ভাল যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হ'লে এই রকম লোক দরকার যতদিন আমি এমন লোক খুঁজে না পাই ততদিন আমার অনুসন্ধান চলবে।

যন্ত্র তৈরি করতে টাকার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্তু নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশি। যদি আমরা নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করতে না পারি তবে কোন দিনই আমরা ভাল যন্ত্র গড়তে পারবো না। আমরা মানুষ হবো না চিরকাল বানরের পর্যায়ে থেকে যাব।

বানরের কথা কেন বলেছি বুঝিয়ে দিই। বুদ্ধিবৃত্তি যাদের অল্প তারা উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। আবিষ্কারক যন্ত্রের মধ্যে কি সংকল্পের সৃষ্টি করেছেন তা বুঝবার ক্ষমতা তার কোথায়? বানরে যেমন ঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়ি চালাতে গিয়ে ঘড়ি বন্ধ করে দেয় তেমনি সে যন্ত্রটাকে নষ্ট করে ফেলবে। বানর দেখে তার মনিব পেণ্ডুলাম দুলিয়ে ঘড়ি চালিয়ে দেন, সেও তাই করতে গিয়েছে। কিন্তু স্প্রিং-এ যে দম দেওয়া দরকার সেটা তার মাথায় ঢুকবে না। মনিবের অনুকরণে সে পেণ্ডুলাম দোলাতে গিয়ে ঘড়িটা অচল করে দেবে।

আমি যদি দেখি, মজুর বা তাদের ম্যানেজারেরা কর্মদ্বারা বহু লোকের আর্থিক সাচ্ছল্য আনয়ন করছে না, তাদের জবাব দিয়ে দেব। এ রকম একবার নয়, বহুবার করতে আমি প্রস্তুত।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা চলতে পারে। কিন্তু বৃহৎ কার্যে, বৃহৎ ব্যবসায়ে মহৎ লোকের নেতৃত্বের প্রয়োজন—যারা চরিত্রে, ইচ্ছাশক্তিতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে ও হৃদয়বত্তায় বহু লোককে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা তরুণ, আমরা তাদের শিখিয়ে নিতে চাই আমরা তাদের নেতার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই।

তোমরা তোমাদের মধ্যে থেকে এমন তরুণ শ্রমিকদের নির্বাচন করে দাও, যারা এই বৃহৎ কাজের যোগ্য, তাতে তোমাদেরও উপকার, সমগ্র দেশেরও উপকার।

মনঃসংযোগ

(গবেষণা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি প্রদত্ত)

গবেষণার কার্যে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কারখানা হ'ল মন। এ কারখানার কর্মীদের তৈরি করা বড় শক্ত কাজ। এ কাজে সুদৃঢ় আত্মসংযম ও শৃঙ্খলা একান্ত আবশ্যক। আমরা জোর করে একটা মানুষকে কারখানায় শারীরিক পরিশ্রম করাতে পারি কিছুকালের জন্যে—কিন্তু কোন মানুষকে তার মনরূপ কারখানায় জোর জবরদস্তি করে খাটাতে পারি না বেশিক্ষণ—যদি সে লোক পূর্ব থেকে এ কাজের শিক্ষা না পায়, এবং একথাও সত্য, যদি কোন ব্যক্তি একাগ্রমনে তার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কর্তব্য কর্মে নিয়োগ না করে, তবে তার দ্বারা এ ধরণের কাজ আদৌ সম্ভব নয়।

আমরা বহু লোক এনে ঢুকিয়েছিলাম এই গবেষণা বিভাগে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা কি কাজ পেয়েছি আমরা? তাঁদের অসাফল্যের প্রধান কারণ এই যে কোন কাজে বেশিক্ষণ মন বসাতে পারে না তাঁরা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাঁরা গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করতে সম্পূর্ণ নারাজ।

কিন্তু যিনি সত্যই কোন দরকারী যন্ত্রের আবিষ্কার করতে চান, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে কর্মদক্ষ হ'তে হ'লে কারখানার মাল তৈরি বিভাগের যন্ত্র ভাল করে দেখতে হবে, সেই যন্ত্রে নিজেকে সুদক্ষ করে তুলতে হবে নিজে খেটে। তবে তিনি বুঝতে পারবেন কোথায় কি নতুন যন্ত্রের দরকার, পুরাতন যন্ত্রাদির উন্নয়ণ কিভাবে সম্ভব। আমাদের রিসার্চ বিভাগের কর্মিগণের অসাফল্য আমাদের দমিয়ে দিতে পারবে না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করবো, এই কর্মীদের দ্বারা ভাল কাজ আদায় করতে।

সংঘগঠন যিনি করবেন, তাঁর মানসিক বৃত্তি উচ্চস্তরের হওয়া দরকার, গবেষণা বিভাগের কর্মীদের ন্যায়। তাঁদের মস্তিষ্করূপ কারখানায় সব এলোমেলো, অগোছাল, সুতরাং কোন এক বিষয়ে বহুক্ষণ মনোনিবেশ তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য।

অনেক সময় এরকম দেখা যায় ডিরেক্টর বা ম্যানেজার তাঁর বিভাগের উন্নতি করবার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্বেও সফল হচ্চেন না। তিনি যতই খাটেন, কাজ ততই খারাপের দিকে চলে, শেষে সে বিভাগে যা শৃঙ্খলা ছিল, তাও অন্তর্হিত হয়। এর কারণ কি? আমি একটা উদাহরণ দিই।

জুতোর সোল তৈরি বিভাগের একজন ফোরম্যানকে চল্লিশটি লোকের খবরদারি করতে হ'ত—এই চল্লিশটি লোক বিভিন্ন প্রকৃতির কর্মে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু সে ব্যক্তির কারখানার মাল ভাল হ'ত না। আমি তার অসাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করবার জন্যে তাকে আদেশ দিলাম, অন্য সব লোকের কাজ তাকে দেখতে হবে না। শুধু একটি মেসিনের চারজন শ্রমিকের ওপর সে যেন নজর রাখে। জুতোর সোল পিটিয়ে দুরুস্ত করা ছিল এদের কাজ। তাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ব্যক্তি বাঁ পায়ের জুতোর সোল গড়ে, দ্বিতীয় ও চতুর্থজন গড়ে ডান পায়ের সোল।

একটু সতর্কতার সংগে নজর রাখলে যে কেউ বুঝতে পারতো সেই চারজনের মধ্যে কে সর্বোৎকৃষ্ট কর্মী, কে নিকৃষ্ট কর্মী। আমি কিছুক্ষণ ধরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করার পরে তাদের

সম্বন্ধে ফোরম্যানের মতামত জিজ্ঞাসা করলাম। সে এমন লোককে নির্দেশ করলে ভাল বলে, যার কাজ সকলের চেয়ে খারাপ।

ফোরম্যান তার যথার্থ মত আমার কাছে জ্ঞাপন করেছিল, এর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। তবে তার এ ভুল হ'ল কেন? অথচ তার এই ভুলের জন্যে গোটা ডিপার্টমেণ্টের কাজ খারাপ হচ্চে। এই ভ্রমই যে তার অসাফল্যের প্রধান কারণ, সে নিজেও তা জানে না।

আমি তাকে বললাম, আর একবার জুতোর সোল পরীক্ষা করে দেখে তার ভ্রম সংশোধন করে নিতে। তার ওপর নজর রেখে দেখলাম এ কাজের উপযুক্ত ধৈর্য তার নেই—সে এক সংগে অনেকগুলি মিস্ত্রির ভুল শোধরাবার জন্যে ব্যস্ত। তা ছাড়া এই চারজনের লোকের কাজে ভুল ধরবার জন্যে এদের প্রত্যেকের তৈরি অনেকগুলি জুতোর সোল পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু সে ধৈর্য তার নেই।

তখনি আমি বুঝলাম যে ব্যক্তি চারজন মিস্ত্রির কাজ ভালভাবে তত্ত্বাবধান করতে অক্ষম, সে চল্লিশজন মিস্ত্রির কাজ দেখবে কি করে? এর আসল কারণ তার মনঃসংযোগের অভাব। যে পরিমাণ একাগ্রতা থাকলে সে এই চারজন মিস্ত্রির কাজের দোষ বার করতে পারতো, ততটুক্ একাগ্রতা তার নেই। সারা কারখানা ছুটোছুটি করে বেড়িয়ে সকলের কাজের ওপর খবরদারি করতে গিয়ে সে একটি মিস্ত্রির কাজও নিপুণভাবে দেখতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে একাগ্রতা অভ্যাস না করে।

আমাদের সকলেরই অসাফল্যের কারণ উপরোক্ত ফোরম্যানের মত। আমরা কাজ করি অর্ধেকটা, কাজের যেদিকটা সহজ সেই অর্ধেকটা করে কাজের মধ্যে শক্ত অংশটুকু ফেলে রাখি। কিন্তু কর্মের সাফল্য নির্ভর করে এই কঠিন ও অপ্রীতিকর অর্ধাংশের ওপর। যে সংযমী ও শ্রমশীল কর্মী মনপ্রাণ ঢেলে দেয় তার কর্তব্যকর্মে, এবং যে শুধু ফাঁকিবাজ, কোন রকমে অর্ধেকটা করে, এই উভয়ের মধ্যে কি রকম তফাৎ জানো? একটি কুকুর ও বানরের মধ্যে যে তফাৎ।

কুকুরের গায়ে যখন মাছি বসে, তখন সে একবার পা চুলকেই সন্তুষ্ট থাকে - মাছিটা অল্পক্ষণের জন্য অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু বানরের গায়ে মাছি বসলে সে মাছিটাকে মেরে তবে ছাড়ে।

আমাদের রেস্তরাঁ

আমাদের রেস্তরাঁ আমাকে বড় ভাবনায় ফেলেচে। এত চেষ্টা সত্বেও ওর ব্যবস্থা এখনও সন্তোষজনক হচ্চে না। আমাদের কারখানা যথেষ্ট খরচ করে মজুরদের সস্তায় ভাল খাবার যোগাত—কিন্তু তারাই খেতে পাচ্চে না ভাল।

অতএব আমি ঠিক করেচি এখন থেকে আমি ডিরেক্টরদের নিয়ে কারখানার রেস্তরাঁয় জলযোগ করবো। আমাদের জন্যে এখানে ছোট রান্নাঘর খোলা হবে, এবং সাধারণ রান্নাঘরে মজুরদের জন্যে যে জিনিসপত্র দেওয়া হয়, সেই জিনিসপত্র দিয়েই কত ভাল রান্না হতে পারে, তার পরীক্ষা চলবে এখানে। সেই পরীক্ষার ফল আমরা মজুরদের রান্নাঘরে ব্যবহার করে দেখবো তাতে কি ফল পাওয়া যায়।

আমি রেস্তরাঁয় ভাল খাওয়ানোর জন্যে অর্থ ও সময় ব্যয় করতে কার্পণ্য করবো না। তবে যাঁরা খাবেন, তাঁরাও যেন আমাদের কার্যে সহযোগিতা করেন তাঁদের ইচ্ছা, মতামত ও সমালোচনা দ্বারা। আমি চাই প্রত্যেকটি ডিস সুস্বাদু হবে, সুপের অবস্থা বর্তমানের চেয়েও ভাল হবে। আমরা কোথায় ভুল করি, তাও আপনাদের জানানো দরকার হবে। যে যা প্রস্তাব করেন, সরাসরি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে আপনারা একটু কুণ্ঠিত হবেন না।

বাটার কার্যকরী নির্দেশসমূহ

বাটা যে কি অদ্ভুত কর্মী ছিলেন এবং কর্ম সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ কি ছিল, তা আমরা ভাল বুঝতে পারি বাটার স্বহস্তলিখিত নির্দেশসমূহ পাঠ করে। এত বড় একটা কারখানায় মাঝে মাঝে বহু সমস্যা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এই সমস্যার কিভাবে তিনি সমাধান করতেন, এ সব নিয়ে কত চিন্তা করতেন—এইগুলি না পড়লে জানা যাবে না। আট ভলুম এরকম আদেশাবলী আমাদের কাছে আছে। বাটার ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় চরিত্রবল, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান এই নির্দেশসমূহের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে—আমরা নিম্নে সেগুলির মধ্যে কিছু প্রকাশ করলাম। বাটার কারখানার সুশৃঙ্খলা ও উত্তরোত্তর উন্নতি যে দৈবঘটনা নয়, একটি অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মন যে তাদের পেছনে সদা জাগ্রত, এর পরিচয় এগুলির মধ্যে ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে। কি ভাবে টমাস বাটা এ আদেশগুলি দিতেন? কতকগুলি তিনি টাইপিস্ট্‌কে বলে যেতেন, কতকগুলি ঘটনাক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি দু'চার ছত্রের মধ্যে লিখে দিতেন।

১৯২৭ সালে প্রাহা সহরের ছাত্রমণ্ডলীর নিকট বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, "আমরা যেন সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে, পরিপূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। তোমরা দেখ, পেন্সিলটা যদি চেনে বাঁধা থাকে, তাতে কাজ ভাল হয়। সে পেন্সিলটা ধরা যায় ভাল, লেখা যায় তাড়াতাড়ি। এই নিয়ম দ্বারা আমরা প্রত্যহ বহু হাজার সেকেণ্ড বাঁচাতে পারি। একটা নোট বই সর্বদা পকেটে থাকা দরকার। এতে সাফল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই দুই কর্মী, অর্থাৎ নোট বই আর ঘড়ির চেনে ঝোলান পেন্সিল, আমাদের বড় উপকারী বন্ধু। তোমাদের মনে যখনই দরকারী কোন কথা আসে, তুমি তখনই সেটা নোট বইয়ে টুকে রাখতে পার—হয়তো সে সময় তুমি উঁচু চিমনির ওপর কাজ করচো কিংবা খালের পথে নৌকায় চড়ে চলেচ, কিন্তু তখনি লিখে রাখলে সে কথা তুমি কখনো ভুলে যাবে না। সময়মত সেগুলি কাজে লাগাতে পারবে।

নির্দেশগুলিতে আমরা ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষরটি মাত্র ব্যবহার করেচিঃ

পাওয়ার হাউস

মিঃ বি-

আপনার কলের চিমনি দিয়ে আজ সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে বিশ্রী ধোঁয়া বার হচ্ছিল, ঠিক কালকের মতই, অথচ কাল এদিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি দেখলাম, সকাল ৭টার আগে আপনি কাজে আসেন না, তার আগে কি হয় না হয় আপনি নিজের চোখে দেখতে পারেন না।

এটা কি রকম হ'ল জানেন? কৃষক সারাদিন গরুবলদ নিয়ে মাঠে রইল, কিন্তু সে বিছানায় শুয়ে রইল সকালবেলাটিতে—যে সময় তার কৃষাণ বলদদের খাওয়াচ্ছে।

চিফ্‌, ৭—১১—১৯৩১।

দ্রব্য ক্রয়

মিঃ সি—

একটা পুরাতন প্রবাদ আছেঃ কৃষকের কর্মদক্ষতা তার সারকুড় দেখলে বোঝা যায়। কৃষকের কাছে গোবর যে জিনিস, একটি বড় কারখানার পক্ষে টুকরো-টাকরা কাঁচামাল, লোহার টুকরো, ঝড়তি-পড়তি চামড়া ইত্যাদি সেই জিনিস। শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে আমরা কিভাবে আমাদের এই

ঝড়্তি-পড়্তি মালের সদ্ব্যবহার করি তার ওপর। আপনি কি পরিমাণে মিতব্যয়ী, তা বুঝতে পারবেন, যদি আপনি আপনার ঝড়্তি-পড়্তি মালের স্তূপটি দেখেন।

এর জন্যে আপনি মজুরদের দোষ দিতে পারেন না। তারা মাল জড় করেই খালাস। এই অজ্ঞ মজুরেরা জানে না যে জুতোর ওপরের চামড়ার প্রতি কিলোগ্রামে শতকরা কুড়ি ভাগ চর্বি থাকে। এই বাদ দেওয়া চামড়ার টুকরোগুলো অন্য অনেক কাজে লাগানো যায়। তারা জানে না যে এগুলি থেকে চর্বি নিষ্কাশিত করে নেওয়ার জন্যে আমাদের দু'টি দামী যন্ত্র আছে। তারা এও জানে না যে এইগুলি জমির খুব উৎকৃষ্ট সার। আপনি যদি এদিকে দৃষ্টি না দেন, তারা এগুলো নিয়ে কি করতে পারে? আপনি এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ট্রেনিং প্রাপ্ত। কারখানার এই মালগুলির অপচয় নিবারণ আপনারই কর্তব্য কর্ম।

যে মজুরেরা এগুলি জড় করেচে, তারাই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে। তারা জানে কোন কারখানা থেকে এই সব মাল জড় করা হয়েচে। আপনি আজ বেলা ২টার সময় নিজে গিয়ে স্বচক্ষে এগুলি দেখে এসে আমাকে এই পত্রখানি ফেরৎ পাঠাবেন এবং এর অপর পৃষ্ঠায় লিখে জানাবেন আপনি এ ব্যাপারে কতদূরে কি করলেন। এই সব মালের অপচয়ের জন্যে ভবিষ্যতে আমরা আপনাকেই দায়ী করব।

চিফ্, ১২—১১—১৯৩১।

[টমাস বাটা ধূমপান করতেন না, সেদিক থেকে নিম্নোক্ত নোট্‌টি কৌতূহলজনক মনে হবে]

মিঃ এইচ —

তামাকের দোকানে বড় লোকের ভিড় হয়। একটা দোর দিয়েই তারা ঢোকে আব বার হয। দু'টো দোরেব ব্যবস্থা করে দিন, একটা দিয়ে লোকে ঢুকবে, আব একটা দিয়ে বেরুবে।

চিফ্, ১৬—৮—১৯৩১।

মিঃ কে —

নতুন মালগুদাম ও রেস্তর্বা তদারক করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম খাওয়ার ঘবের টেবিলে লবণ বা পানীয় জল নেই।

চিফ্, ২৭—১—১৯৩১।

পাওয়ার হাউস, গ্যাস হাউস, রেলওয়ে

মেসার্স জেড্, বি, ডি —

যদি পাওয়ার হাউস ও গ্যাস হাউসে কোন গোলমাল ঘটে, তবে জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। আপনাদের উচিত সাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এই ত্রুটির জন্যে—কারণ আপনারাই এজন্য দায়ী।

৭ই তারিখে হঠাৎ পাওয়ার হাউসের কল বিগড়ে ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে গেল, পাওয়ার হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ বি এজন্য কোন ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। রেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ ডি সম্বন্ধেও একথা খাটে। যদি ট্রেন দেরী করে জংশন স্টেশন পৌঁছে যাত্রীদের বড় লাইনের ট্রেন ফেল করিয়ে দেয়, তবে যাত্রীসাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

গ্যাস হাউস সম্বন্ধেও সেই একই ব্যাপার। গত রবিবারে গ্যাসের অভাবে আমাদের পাচক রান্না করতে পারলে না, কেন এমন হয়? গ্যাসের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

চিফ, ১০—১১—১৯৩১।

মজুরদের বাসগৃহ

মিসেস্ এস্ —

বাসগৃহ বিভাগের কর্ম ঠিকমত চলা চাই। এখন যেভাবে কাজ চলচে, ভবিষ্যতে আপনার কর্তব্য-ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করা দরকার হবে। আমি শুনেচি মজুরদের কলোনিতে অনেকে আধুনিক air heating এর কলকব্জা ব্যবহার করতে জানে না। বাসগৃহ বিভাগ থেকে একজন লোক নিযুক্ত করা উচিত ছিল, যে শীতকালের প্রথমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে এ বিষয়ে উপদেশ দেবে। বছরের মধ্যে বারকয়েক এ ধরণে শিক্ষক পাঠানো উচিত কলোনির প্রত্যেক বাড়িতে। Air heating-এর দোষ সম্বন্ধেও লোকে তার কাছে জানতে পাবে। Gas heating এবং আরও অনেক ব্যাপার সম্বন্ধে এরকম ব্যবস্থা করা যায়।

চিফ ১—৬—১৯৩১।

সহর

মিঃ জেড —

আজ সহরের রাস্তা ছিল ভীষণ অপরিষ্কার। নতুন ঝাড়ুদারের গাড়িগুলো কেমন কাজ দিচ্চে? আপনি নিজে জানেন ঐ গাড়িগুলো কি করে চালাতে হয়?

জবাইখানার কাছে একদল বেদে বেদেনীর ভিড় দেখা গেল। জবাইখানার লোকে ওদের কাছে গোপনীয়ভাবে কোন মাল কিংবা ঝড়তি-পড়তি মাংস বিক্রী করচে কিনা, তদারক করুন। যদি এমন হয়, সেটা বন্ধ করে দিন।

চিফ, ২—১১—১৯৩১।

সহর

মেসার্স এস, এস্ —

আজ রাস্তায় আমি দু'জন পুলিশম্যান দেখলাম, মিঃ এ এম, ও মিঃ এফ, পি। তারা রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে এমন ভাবে হাট্‌ছে যে, কোন মোটর গাড়ি সে সময় রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না।

পুলিশ দু'টি রাস্তার একপাশে অবশেষে গেল বটে, কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হ'ল তারা চটেচে। তাদের চালচলন দেখে মনে হচ্চিল মোটর ড্রাইভারকে তারা নিজেদের কর্তৃত্বাভিমান দেখাতে চায়।

কিন্তু আমাদের পুলিশম্যানের শিক্ষা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। পুলিশম্যানের জানা উচিত যে জনসাধারণের পয়সায় তাদের রাখা হয়েচে, জনসাধারণের সেবার জন্য—তাদের নিজেদের কর্তৃত্বাভিমান প্রদর্শনের জন্য নয়।

যদি তারা সাধারণের উপকারের জন্য তারা তাদের কর্তৃত্ব জাহির করে, তাতে আমাদের কিছু বলবার নেই, তবে তারা যেন ব্যক্তিগত কারণে কখনো তা না করে।

চিফ, ৪—১১—১৯৩১।

সহর

মিঃ আর—

আমি লক্ষ্য করেচি আপনি সন্ধ্যা ৭টার আগে রাস্তায় আলো দেন না, অথচ বিকেল পাঁচটার আগেই অন্ধকার হয়ে যায়। গতবারেও আপনি বড় রাস্তায় অনেক দেরি করে আলো জ্বেলেছিলেন।

চিফ্

যদি আদেশগুলির মর্ম এরূপ হ'ত, কোন্ নতুন কর্তব্য বা দায়িত্ব দীর্ঘকালের জন্য কারো ওপর ন্যস্ত করা হবে, তবে ঐ আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে চুক্তির অবকাশে করা হ'ত। চুক্তির মধ্যে কর্তব্যের প্রকৃতি, কি করে তা করতে হবে এবং তার পুরস্কার কি -সব খোলসা করে লেখা থাকত। টমাস বাটার কার্যপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাঁর নিজের পুত্রের সহিত নিম্নোক্ত চুক্তিপত্র পাঠে বোঝা যাবে।

নিজের পুত্র ও জিল্নের অন্যান্য তরুণবয়স্ক বালকদের শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ডিমোক্র্যাটিক নীতির অনুসরণ এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেচে।

গণিতশাস্ত্র পাঠ

মিঃ টমাস বাটা জুনিয়র,

যখন তুমি নিজে গণিত অধ্যয়ন করবে, তখন সর্বদা মনে রাখবে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের বহু তরুণবয়স্ক ছাত্রকে তুমি অঙ্কশাস্ত্র শেখাতে বসেচ। আমি এ কারখানার ইলেক্ট্রিক, মেকানিক্, বাড়ি তৈরি প্রভৃতি বিভাগগুলির কথাই বলচি। এই বিভাগের শ্রমিকগণ অবসর সময়ে গণিত চর্চা করবে—তুমিও ওদের সঙ্গে শিখবে। তারাও তোমার সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্র পরীক্ষা দেবে।

কতগুলি বালকের গণিত শিখবার আগ্রহ আছে, তাদের নামের একটা লিষ্ট করে ফেল। আমাদের কারখানার সংবাদপত্রে তাদের নাম ছাপিয়ে দাও এবং সেই সেই বিভাগের দরকারী বোর্ডগুলিতে সেই খবর প্রচার কর, যাতে প্রত্যেক তরুণ ঐগুলি পড়তে পারে।

সেই সংবাদে লিখে দিও এই এই সময়ে এই এই বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা দিয়ে পাশ না করলে তাদের সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ গণিত না জানা থাকলে তারা ঐ সব বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবে না।

তুমি বা তোমার সহপাঠী ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করলে আমরা তোমাদের পুরস্কৃত করবো। স্কুলের ছাত্রদেরও এরূপ পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি। এ বিষয়ে স্কুলের ডিরেক্টর রাডিল ও মিঃ রাডেক যেন তোমায় সাহায্য করেন।

টমাস বাটা

জিল্ন্, ২২শে মার্চ, ১৯৩২।

অর্থনীতিবিদ

সেই মাঠেই ভাল ফসল ফলে চাষা যেখানে নিজের হাতে লাঙল চষে।

আমার কাছে উপদেশ নাও, আমি এক পেনিও উপার্জন করেচি আবার লক্ষ লক্ষ টাকাও রোজগার করেচি।

আমি সেই সব লোকের সংগে ব্যবসা করতে চাই না, যারা বিবেচনা করে ব্যবসা শুধু লোকের কাছে ফাঁকি দিয়ে কিছু রোজগার করবার পন্থা। বিশ ত্রিশ বছর ধরে লুঠে করলাম, তারপর লুঠের মাল নিয়ে ভাগবো, এই যাদের মূল নীতি। আমি চাই তাদের সংগে ব্যবসা করতে যারা ব্যবসার মধ্যে দিয়ে সাধারণের সেবা করতে চায়। সারাজীবন ধরে সেবা করবার সংকল্প করেচে যারা।

টাকার পেছনে যে ছোটে, সে কখনো টাকা পাবে না। কাজ ভাল করে কর, তোমার সহকর্মীদের চেয়েও ভালভাবে কাজ কর, টাকা তোমায় খুঁজে নেবে।

একদিনে ৮৬,৪০০ সেকেন্ড।

সহজে পয়সা রোজগার করলেই মানুষে নষ্ট হয়। ভাল লোকও নষ্ট হয়ে যায়, যদি সে বিনায়াসে পয়সা হাতে পায়।

মানুষের সংগে মানুষের প্রত্যেক ব্যবহার অংক দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

উপরোক্ত চমৎকার বাক্যগুলি ও তৎসম্বন্ধে সুন্দর ভাব ও চিন্তা টমাস বাটার বিশেষত্ব। আর্থিক সাফল্যের মূলে দৈব বিদ্যমান যাঁরা ভাবেন, তাঁরা ভুল করেন। কিন্তু বাটা দৈবকে স্বীকার করতেন না।

অবস্থা অনুকূল নয় একথা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ অবস্থার দাস নয় অবস্থাই মানুষের দাস। অবস্থা যষ্টির মত, তাকে শক্ত হাতে পাকড়াও, তারপর তাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার কর।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে অবস্থাকে বুঝবার কোন মানে হয় না, অবস্থাকে আয়ত্তে আন।

এই হ'ল জীবন্ত টমাস বাটা—কর্মী, শক্তিধর তাঁর নীল, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির এমন শক্তি ছিল যে, সে শক্তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারতো না। যখন জগতে ঘোর অর্থনৈতিক দুর্দিন চলেচে, তখন তিনি একটি সভায় বক্তৃতাকালে বলেছিলেন, 'জগতের বর্তমান দুর্দশার সৃষ্টি আমি করি নি, তবে এজন্যে আমি দুঃখিত নই। এতে আমার উৎসাহ বাড়ে ছাড়া কমে না।" দুনিয়াময় সমস্ত খবরের কাগজে যুক্তিতর্ক দ্বারা যখন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলচে মানুষের শ্রম ও চেষ্টার ব্যর্থতা, তখন তিনি বলতেন, "যে যুক্তিতে আমায় বলে আমায় গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে, সে যুক্তি চুলোয় যাক্। অবস্থা যত খারাপ হবে, কাজ তত বেশি করে করা দরকার। কাজ ছেড়ে আমি পালাব কোথায়?"

টমাস বাটা তাঁর অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা রাজনীতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মতের নিরসন করতে চান নি, তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও শক্তি নিয়ে পৃথিবীব্যাপী দুর্দিনের মাঝে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সমস্ত লোকের ভয়, বিস্ময় ও ভক্তি উদ্রেক করতেন। সমস্ত রকম ব্যর্থতা, অত্যাচার ও নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিদ্রোহ, পাণ্ডিত্যাভিমানীদের সংকীর্ণ, স্বার্থান্বেষী দৃষ্টি ও পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর সামনে সম্ভ্রমে নত হ'ত। যাঁরা তাঁকে ঠিক মত বুঝত না, তাঁরাও তাঁর মতকে শ্রদ্ধা না করে

পারত না। কারণ টমাস বাটার মতবাদ জীবনের জয়গান, কায়ক্লেশে পঙ্গুর মত পথ চলা নয়, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া নয়— বিজয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বীরের মত অগ্রসর হওয়া, এর পরিশেষে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করা।

বাটার এই ছবি বীরের ছবি, যোদ্ধার ছবি। এর পাশেই আবার দেখি আর এক বাটাকে—জ্ঞানী, শিক্ষক, উদারচেতা, অর্থনীতিবিদ।

প্রত্যেক পিতা তাঁর ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্রের সঙ্গে টাকাকড়ি সম্বন্ধে স্বাধীন ব্যবহার করবেন। ছেলে যেন চুক্তিমত নিজের উপার্জন নিজে করে। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হ'লেই বালকের সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার জন্মায়।

প্রত্যেক ছেলেকে স্কুলে কিছু জমি দিয়ে তাকে চাষ করতে বলো। জমির উৎপন্ন ফসল তাকেই দাও। স্কুলের চেয়ে সে বেশি শিখবে।

পয়সা রোজগার কর প্রয়োজন মত ব্যয় কর, সঞ্চয়ী হও।

আমাদের উচিত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দান করা। শ্রমিকেরা মূলধনের দাস না হয়ে মূলধন তাদের দাসত্ব করুক। তরুণ বয়স থেকে আমরা যদি এ শিক্ষা দিই যদি তাদের সংযমী হতে উপদেশ দিই, অর্থ উপার্জন, ব্যয় ও সঞ্চয় করতে শেখাই—তবে আমরা সাফল্য অর্জন করব।

বাটার এ নীতি সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছে কেন? কারণ এ নীতি যাঁর প্রাণের বাণী তিনি সারাজীবন মানুষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে এসেছেন। আমাদের শতাব্দীর সত্যকার স্বাধীনতা—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ ব্যতিরেকে বিজয়লাভ অসম্ভব। বাটার নীতি মানুষকে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করে, তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়, তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। লোককে দান করে কোন লাভ নেই। ভিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া দুই ই মানুষকে ছোট করে রাখে।

অর্থসাহায্য ও উপহার দ্বারা আমরা মানুষকে সাহায্য করতে যাই বটে, কিন্তু তার সত্যকার সাহায্য তাতে হয় না। তাকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাও।

জনসাধারণের ভেতর থেকেই টমাস বাটা উঠেছিলেন এবং চিরদিন তিনি তাদের শিক্ষক স্থানীয় হয়ে থাকবেন।

ব্যবসায়ে স্বাধীনতা

আমি অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষপাতী। নতুন যন্ত্রপাতি নতুন প্রণালী আনয়ন করেছে আমাদের কর্মের মধ্যে। একটা ব্যবসায় নিয়ে মানুষ কেন চিরকাল পড়ে থাকবে? কর্মের নব নব ক্ষেত্রে সে দৃষ্টি প্রসারিত করুক। নতুবা তার নিজের ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি।

পুরাতন ধরণের ব্যবসা এখন আর চলবে না। এখন চাই নবতর প্রণালী, শৃঙ্খলা, নবতর শিল্প, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নবীনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

ব্যবসায়ীর প্রকৃত আদর্শ হবে সদাজাগ্রত উন্নতির ইচ্ছা। তার নিজের উন্নতি, ব্যবসায়ের উন্নতি, পুঁজির উন্নতি। এই ইচ্ছাশক্তি বিদ্যুতের শক্তির চেয়েও বড়, অর্থের শক্তির চেয়েও বড়। সদাজাগ্রত উন্নতির ইচ্ছাই প্রতিপদে আমাদের শক্তিমাণ করে তুলবে, আমাদের চোখের সামনে এনে দেবে মহত্তর আদর্শবাদ, মহত্তর উদাহরণ। ব্যবসাও চলবে বেড়ে।

আমাদের ব্যবসা আজ ছোট হতে পারে, কিন্তু কাল আমরা বড় ব্যবসাদার হ'ব এ আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাশা আমাদের থাকা অত্যাবশ্যক। আমরা যদি তত বড় নাও হতে পারি, যাতে আমাদের সন্তানরা বড় হতে পারে, সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আমাদের আদর্শ তাদের প্রেরণা দান করুক, আমাদের অসাফল্য তাদের সতর্ক করে দিক।

প্রত্যেক ব্যবসাদার নিজের মনের শক্তি ও সাহস অনুসারে বড় বা ছোট হয়ে থাকে। আমার মনে আছে, বোস্টনের ইয়ং কোম্পানী আজ ২৫ বছর আগে পৃথিবীর সব খবরের কাগজে তাদের গোড়ালি তৈরি মেসিনের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

সেই বিজ্ঞাপন পড়ে আমার ধারণা জন্মালো যে ইয়ং কোম্পানীর বিরাট কারখানা, বিরাট যন্ত্রপাতি, পৃথিবীর সব দেশে তাদের শাখা ছড়ানো বুঝি। তারপর আমেরিকায় গিয়ে ওদের কারখানা খুঁজে বের করতে গিয়ে দেখি ছোট কারখানায় বাপ আর ছেলে জামার আস্তিন গুটিয়ে খাটছে। এই ব্যবসায়ীর কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে. এ থেকেই আমার মনে হয়েছে বড় ব্যবসায়, বড় বাড়িঘর বা বড় কলকারখানা থাকলেই হয় না ব্যবসায়ীর আত্মশক্তি বা আত্মবিশ্বাস বড় থাকলেই সে বড় হয়-সে দুঃখবহুল ক্রেতার অভাব মোচন করবে না, সারা দুনিয়ার বহু লোকের সেবা করবে।

আমাদের নিজেদের চরিত্র আগে বড় করতে হবে, সংযমী হতে হবে, উদার হতে হবে, মিতব্যয়ী হতে হবে। লক্ষ্মী তাকেই আশ্রয় করেন, যে নিজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, নিজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভার দিকে। ব্যবসায়ের সাফল্য ও বিস্তৃতি নির্ভর করবে এই সব গুণের সামঞ্জস্যের ওপর। অর্থ ও সম্পত্তি আর কিছু নয়, এই সাফল্যের মাপকাঠি মাত্র। আমাদের ব্যবসায়ের জন্য ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমাদের বড় করে তুলতে হবে। ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ যেন আমরা না করি। আমাদের আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। নিজেকে ছোট করে রাখাই পাপ।

এই পথই সত্যের ও বাস্তবতার পথ। এই দুই জিনিসের ওপর ভিত্তি স্থাপন না করলে কখনো বড় ব্যবসায় গড়ে ওঠে না, বড় কোন জিনিসই গড়ে ওঠে না। ব্যবসায়ের সঙ্গে সেবাবুদ্ধি জড়িত না থাকলে তা মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয় না। মিষ্টি কথায় কাজ হয় না শুধু, রাজনৈতিকদের পক্ষে হয়তো বড় মূলধন হতে পারে, কারণ কথা বেচেই তাদের ব্যবসা চলে, গলার স্বর একমাত্র পুঁজি। কিন্তু মিষ্টি কথায় টাকা আসবে না। দুনিয়াটা আদানপ্রদানের জায়গা, শুধু হাতে কেউ কিছু দেবে না।

অতএব সত্যকে জানতে যেন আমরা চেষ্টা করি। তোষামোদে যেন না ভুলি। তা হ'লে নিজেদের ওপর মিথ্যার আবরণ পড়ে যাবে, নিজে যত বড় নই, তত বড় ভাববো নিজেকে। তোষামোদকারীকে প্রশ্রয় দিলে বাস্তবতার পথ ছেড়ে চলবো অসত্যের পথে, মিথ্যা অহমিকার পথে।

ব্যবসায়ী ও পূর্ণবয়স্ক লোকের পতনের কারণ অনেক সময় ঘটে, যখন তারা ভাবতে সুরু করে, তাদের আর কিছু শেখবার নেই, সব রকম শেখা সাঙ্গ করে তারা বসে আছে–জীবনের পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হয়েছে। কারো কাছ থেকে নতুন কিছু শুনতে তাদের মন নারাজ হয়ে উঠে, মনের বাতায়ন দ্বার বন্ধ করে দেয়।

তা করলে চলবে না আমাদের। তার চেয়ে মূর্খের কাজ আর কিছু হতে পারে না। সবজান্তা মানুষ কে আছে দুনিয়ায়? সকলের কাছেই শিখতে হবে, যাঁরা ব্যবসা করে সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদের সাফল্যের দৃঢ় কথাটি কি, তাঁদের কাছে শুনতে হবে–তবেই আত্মোন্নতি, নতুবা যদি আমরা সবাইকে ছোট করে দেখতে শিখি আমাদের অধঃপতন হতে বিলম্ব হবে না'বেশি।

যে ব্যবসায়ী শুধু নিন্দা ও কুৎসা রটিয়ে বেড়ায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ব্যবসাদারের, কোন দিনও সাফল্যলাভ ঘটবে না তার অদৃষ্টে। যে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভুল সকলের কাছে প্রকাশ করে দেয়, সে নিজে গরীব থেকে যাবে চিরকাল। ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ হবে তার, যে ক্রেতাদের সঙ্গে সুমিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহার করে, যে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর গুণগুলি অনুসরণ করবার চেষ্টা করে।

প্রতিযোগিতার ভয় করলে চলবে না। তারা বহুদূরে আছে, হাতের কাছেই রয়েচে আমাদের ভয়ের জিনিস। ধরো না কেন, যদি আমাদের দোকানের জানালায়, টেবিল-চেয়ারে ধুলো থাকে, দোকান দেখতে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন হয়, তবে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য খারাপ তো হবেই, কোন ক্রেতা আমাদের দোকানের ছায়া মাড়াবে না।

কোন দেশের ধনদৌলতের পরিমাণ বোঝা যায় সেখানকার ব্যবসায়ীদের অবস্থা দেখে। দরিদ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে থাকে, ক্রেতাদের সব অভাব তারা মেটাতে পারে না, তার সদিচ্ছা থাকলেও পারে না। সে দোকানে সাহায্যকারী কর্মচারী রাখতে পারে না, তাদের ভাল বেতন দিতে সে অক্ষম।

অনেকে পার্থিব জিনিসে দারিদ্র্য পছন্দ করেন। যাঁরা বিষয়াসক্ত নন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু শিল্পী, কারিগর বা ব্যবসায়ীর পক্ষে দারিদ্র্য শুধু তার পক্ষে অমঙ্গলজনক নয়, তার দেশ, তার জাতিকে দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের অমঙ্গলজনক পথে নিয়ে যায়।

শিল্পী বা ব্যবসায়ীর কর্তব্য ধনী হবার চেষ্টা করা, নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায়কে উত্তরোত্তর বাড়ানো, উন্নত করে তোলা। যদি সে তার সন্তানদের জন্য অন্য কোন সম্পত্তি না রেখে শুধু তার সদিচ্ছা ও সৎ আদর্শ রেখে যেতে পারে, তবে সে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম করে দিয়ে যাবে, সন্তানও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করবে আজীবন।

আমি ব্যবসায়ে কি চাই

একটা দেশের অধিবাসিগণের অবস্থা তখনই ভাল হতে পারে, যখন উৎপাদন ব্যবসায়কে সাহায্য করে, ব্যবসা উৎপাদনকে সাহায্য করে। মাল তৈরি করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা দু'পয়সা পায় এবং সেই মালের যারা ব্যবসা করে, তারাও মোটা লাভ করে। শিল্প ও ব্যবসায় উভয়ের একত্র সম্মেলন ক্রেতাকে সস্তা জিনিস সরবরাহের একমাত্র উপায়। ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কিভাবে ক্রেতাকে সস্তা জিনিস দেওয়া যায়।

ব্যবসায়ীরা সমাজের বড় সেবক। ব্যবসার অবস্থা খারাপ হ'লেই দেশের অধিবাসীর দুর্দশা সুরু হয়। আমাদের ব্যবসায়ের প্রধান দোষ দাঁড়িয়েচে যে, উৎপাদন ও শিল্প বিবর্তিত প্রণালীতে এসে দাঁড়িয়েচে বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু ব্যবসায়ের রীতিনীতি রয়ে গিয়েচে মধ্যযুগে। বর্তমানে কারখানার মালিকেরা জানে শ্রমিকদের মোটা বেতন ও সস্তায় ক্রেতাদের মাল যোগাবার একমাত্র উপায় অনেক মাল একসঙ্গে তৈরি করা। কিন্তু ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল না হ'লে এভাবে মাল তৈরি করা সম্ভব নয়। যে মালটা কারখানায় তৈরি হবে, সে মালটা কাটানো চাইতো? ব্যবসায়ীরাই কেবল ক্রেতাদের মধ্যে জিনিসটা বিক্রী করতে পারে। ব্যবসায়ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করা আবশ্যক, যাতে প্রত্যেক ক্রেতা তার বাড়ির কাছাকাছি মালটা কিনতে পারে।

যাঁরা ক্ষুদ্র ব্যবসাদার, তাঁদের কাছে আমার একমাত্র বক্তব্য এই, সব সময়ে তাঁরা যেন মনে রাখেন

ব্যবসাকে বাড়াতে হবে। ব্যবসায়ীর শ্রীবৃদ্ধি এভাবেই শুধু সম্ভব। জনসেবাও আবার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবসায় বিস্তৃতির মূল উদ্দেশ্য হবে বহু জনের সেবা। তাঁদের প্রতি আর একটি বক্তব্য তাঁরা দোকানঘরের অবস্থা ভাল করে কর্মপ্রণালী উন্নততর করুন। সংকীর্ণ, আলোবাতাসহীন ঘর, জিনিসপত্র বোঝাই টেবিল ও আলমারি, সর্বত্র ধুলো ও ময়লা, সারা বছর ঘরে মুক্ত বাতাস প্রবেশলাভ করতে পারে না, এ ধরণের দোকানঘরের অনেক ছবি আমার মনে আসচে। এই হ'ল তাঁদের প্রধান শত্রু, যে তাঁদের কর্মে আনন্দ ও শারীরিক স্বাস্থ্য অপহরণ করে, ক্রেতাকে দোকানঘর থেকে বিতাড়িত করে।

আধুনিক দোকানঘরের অবশ্যক নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা। যে যন্ত্রপাতি অন্য কিছু নয়, আলো ও হাওয়া, সাজানো জানালা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানঘর, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক। ট্যাক্স আদায়কারী আপনাদের শত্রু নয়, সে শত্রু আছে অনেক দূরে। আপনাদের শত্রু বাড়িতে রয়েচে।

প্রত্যেক ব্যবসাদার দিগ্বিজয়ী বীরের মত কল্পনা করবেন নিজেকে। তবে স্বার্থান্বেষী পরধনলোলুপ যোদ্ধা নয়– মানবের সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত এবং তিনি এই ক্ষেত্রকে যত প্রসারিত করবেন, ততই তাঁর মঙ্গল।

ক্ষুদ্র দুগ্ধ ব্যবসায়ীও যেন সব সময় মনে রাখে তাকে ক্রমে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে, সে যেন ধরে একটা ম্যাপ রাখে কোন্ কোন্ স্ট্রীট সে দুধ দিচ্চে – এবং সব সময়েই উচ্চাশা পোষণ করে কি ভাবে সে আরও অধিক সংখ্যক ক্রেতার সেবা করতে পারে। প্রথমে তার নিজের পাড়া, ক্রমে সমস্ত সহর, তারপরে পাশাপাশি অনেকগুলি সহর এমন কি সমগ্র জেলায় সে যেন বহু ক্রেতাকে ভাল দুধ যোগান দিতে পারে এই হবে তার আকাঙ্ক্ষা। এই ধরণের ব্যবসাদারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই দেশের মঙ্গল।

ব্যবসাদারের জানা উচিত যে দেশের রাস্তাঘাট ভাল হওয়া ব্যবসার উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাদের উদ্দেশ্য হবে স্টেটের নিকট মাল যাতায়াতের জন্যে উন্নততর রাস্তাঘাটের দাবি করা, সস্তায় যাতে মাল বহন সম্ভব হয়। এ ব্যতীত ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভব কি করে হবে? আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন।

প্রত্যেক গোয়ালা, তরকারী ব্যবসায়ী, পাঁউরুটি বিক্রেতা ও মাংস বিক্রেতার একখানা করে মোটরগাড়ি থাকা দরকার; সুতরাং দেশের রাস্তাঘাট ভাল না হ'লে গাড়ি চলবে কি করে? পায়ে হেঁটে জিনিসের যোগান দিতে হলে তারও উন্নতি হবে না, তার খরিদ্দারদেরও অসুবিধা ভোগ করতে হবে। সে যতক্ষণ দু'টি স্ট্রীটে পাউরুটি যোগান দেবে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ততক্ষণ পিচবাঁধানো রাস্তায় মোটরগাড়িতে কুড়িটি স্ট্রীটের খরিদ্দারের বাড়ি রুটি দিয়ে আসবে। এই দু'জন লোকের লাভ কেমন হবে, উভয়ের আয়ের পার্থক্যের বিষয় চিন্তা করুন। একজন প্রাণপণে খেটে সামান্য লাভ করবে, অপর ব্যক্তি মোটরে বেড়িয়ে অনেক বেশি আরামে অনেক বেশি আয় করবে। মনে ভাবুন দেশের যুদ্ধের সময় সৈন্যদল কামান-বন্দুক নিয়ে রাস্তাঘাট ও গাড়ির অভাবে যেখানে সেখানেই রয়ে গেল। গতির পথ বন্ধ যদি হয়, তবে তাদের পরাজিত হতেও বেশি বিলম্ব হবে না।

প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার দোকানে টেলিফোন রাখবেন, এতে ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের পথ সহজ ও সুগম হবে। ক্রেতা টেলিফোনে মালের অর্ডার দিতে পারলে তার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা।

ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনী পৃষ্ঠাগুলি সযত্নে পাঠ করবেন, তাতে জানবার সুবিধা হবে দেশের লোক কি চায়, ব্যবসায়ের ক্ষেত্র কোন দিকে বিস্তার করা আবশ্যক।

ব্যবসায়ীরা দেশের উন্নতির প্রধান সহায়। ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ইংলন্ড প্রভৃতি ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির অবস্থা এত সচ্ছল কেন, তার কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখবেন তাদের ব্যবসাদারদের উন্নতিই দেশের সচ্ছলতার মুখ্য কারণ।

ব্যবসায়ীর পুঁজি থাকা চাই, হাতে পয়সা থাকা চাই। অর্থহীন ব্যবসায়ী বেহালাশূন্য বেহালা-বাদকের সমান। অতএব অর্থ উপার্জনের পথ সহজ ও সুনিশ্চিত করা নিতান্ত আবশ্যক ব্যবসাদারের পক্ষে। অনেক ব্যবসায়ী আছেন, যাঁরা কেবল নিজের লাভ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেন—কিন্তু তাঁরা নিজের লাভের দিকেই শুধু নজর না রেখে যদি তাঁদের ক্রেতাদের লাভের কথাও ভাবেন, তবে তাঁরা অধিকতর সাফল্য অর্জন করবেন সন্দেহ নেই। তাঁকে মনে রাখতে হবে, শুধু নিজের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবসা করলে তার ফল দারিদ্র্য। সচ্ছল অবস্থাপন্ন দেশসমূহের ব্যবসার অবস্থা উন্নততর, কি কৃষি, কি শিল্প, কি ব্যবসায়—সব বিষয়েই নবতর মূল্যের সৃষ্টি করে তারা দেশকে ধনী করে তুলচে। কিন্তু যেখানে এরা পরস্পরের অর্থ অপহরণ করবার চেষ্টায় ব্যস্ত, সেখানে সকলেই দরিদ্র।

দরিদ্র দেশে মাল বিক্রী হয় না, মজুরেরা বেতন পায় না। অতএব আমরা দেশবাসীর উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে যেন আমাদের ব্যবসা চালাই—তবেই সহরের রাস্তায় রাস্তায় আরও অনেক নতুন দোকান খোলা হবে—মাল উৎপাদনের কাজও বেড়ে যাবে।

মাল তৈরির কার্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও সংঘশক্তির উন্নতি

(১৯২৪ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

মাল উৎপাদনের কার্যের উন্নতি নির্ভর করে কলকারখানা ও সংঘবন্ধতার প্রগতির ওপর। মধ্যযুগের অপেক্ষা এখন মনুষ্যসমাজ উন্নত, তার কারণ বর্তমান যুগের কলকারখানা। লোকে যে কাজে যে আয় করতো একশত বৎসর আগে, আজ তার চেয়ে সে অনেক বেশি লাভ পায় সেই কাজ থেকেই, বর্তমান যুগের উন্নততর ব্যবসায়নীতি ও কলকারখানার সহায়তায়। এই উন্নতির প্রধান কারণ যন্ত্রের আবিষ্কারকগণ, তারপরে ব্যবসায়িগণ।

আমাদের দেশে আবিষ্কারকের চেয়েও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন বেশি। পেটেন্ট আপিসের লোহার সিন্দুকে বহু নব আবিষ্কারকের নক্সা পোকায় কাটচে, কারণ সে আবিষ্কারকের কাজে খাটাবার মূলধন নেই।

একটা দেশে কতখানি বৈদ্যুতিক বা বাষ্পীয় শক্তি ব্যয়িত হয়, সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সেটি একটি প্রধান মানদণ্ড। মূলধনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে সেই দেশের শক্তি ব্যয় করবার ক্ষমতা।

স্টেটের শক্তি এখানে আমি ধরচি না। স্টেট দ্বারা শাসিত ব্যবসাগুলি দ্বারা দেশের সাচ্ছল্য আনয়ন করে না; কারণ স্টেট ব্যবসায়ক্ষেত্রকে প্রতিযোগিতাবিহীন করতে চায়। অথচ প্রতিযোগিতাই ব্যবসায়ীকে উন্নত করে, এবং উন্নতির ফল ভোগ করে মজুর ও ক্রেতা। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা শক্তির ব্যবহার আমাদের দেশে অনেক কম, সুতরাং আমাদের অবস্থাও তাদের চেয়ে খারাপ।

পূর্বে লোকের ধারণা ছিল কলকব্জা মজুরদের পক্ষে অপকারী। আমি নিজেও ত্রিশ বছর

পূর্বে তাই ভাবতাম। এমন এক সময় ছিল, যখন জুতোর দোকানের মজুর জুতো সেলাই করা কল ভেঙেচুরে ফেলেছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে। শিক্ষা দ্বারা এসব কুসংস্কার এখন দূর হয়েচে।

পূর্বে জটিল কর্মপ্রণালীর আবশ্যক ছিল না কলকারখানার কাজে, কিন্তু মাল তৈরির কাজে যত বেশি লোক নিযুক্ত হতে লাগলো, ততই কর্মপ্রণালীর জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ল। বহু লোককে ঠিকমত চালানোর ওপরেই এ ধরণের ব্যবসার সাফল্য। ধরুন, ইঁট তৈরির ব্যবসা। এতে বহু দলে বিভক্ত বহু শ্রমিকের দরকার। এই শ্রমিক দলকে যদি ঠিক মত চালিত না করা যায়, তবে উৎপাদন কম হয়, মজুরের মজুরিও কমে যায়।

কিন্তু যে সমস্ত কাজের অনেক সূক্ষ্ম অংশ আছে, মালের এক এক অংশ এক এক ডিপার্টমেণ্টের দ্বারা তৈরি হয়, এবং প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে বহু লোক খাটে সে সমস্ত কাজে সাফল্যলাভ করতে হ'লে এই সব শ্রমিককে সুপরিচালিত করা দরকার। শুধু যেন তারা হাত দিয়ে খেটে কর্তব্য সমাপ্ত না করে- তাদের খাটতে হবে তাদের মনপ্রাণ কর্মের মধ্যে ঢেলে দিয়ে। তবেই ব্যবসায়ী, মজুর ও ক্রেতা সকলের মঙ্গল।

শ্রমিক যদি ভাবে, ব্যবসায়ের লাভ সবটাই কারখানার মালিকের পকেটে যায়, সে তার ভাগ পায় না তবে ব্যবসা চলে না ভাল। মার্কিন দেশের কয়েকটি বড় বড় কারখানা চমৎকার উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করেচে। জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে ক্রেতা ও মজুর উভয়েরই হৃদয় জয় করেচে তারা। এই একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে মজুর ও ক্রেতা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে। এই সহযোগিতার ফলে সস্তায় ভাল জিনিস পায় খরিদ্দারে, ব্যবসায়েরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

কি করে এ সম্ভব হ'ল তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর মূলে একটি নীতিবাদ নিহিত। এই ব্যবসায়ীরা বিলাসিতা ও সৌখীনতা বর্জন করে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিজেরা কাজে লেগে গিয়েছিল। খাটুনির দিক থেকে দেখতে গেলে সব চেয়ে বেশি খেটেচে তারা। তাদের এই ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ শ্রমিক ও ক্রেতা উভয়েরই হৃদয় স্পর্শ করে, প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে তখন এরা লড়তে সমর্থ হয়।

এই সুদৃষ্টান্তের জন্য আমরা আমেরিকার কাছে ঋণী। আমেরিকার তৈরি হাজার কলকারখানার চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশি। মনুষ্য সমাজকে উন্নতি ও সংরক্ষণের এই একমাত্র পথ।

মাল উৎপাদনে বাধা

(১৯২৪ সালের ২রা আগস্ট তারিখে বাটার প্রচারিত ইস্তাহার)

[বৈজ্ঞানিক বিধিতে কর্ম পরিচালনার জন্য যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় প্রাহাতে, সেই সভায় পঠিত হয়েছিল]

কল্যকার ও অদ্যকার বক্তাগণ বৈজ্ঞানিক বিধি অনুযায়ী কারখানা পরিচালনা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। এই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যই তাই।

আমি ত্রিশ বৎসর ধরে ব্যবসা করে এলাম। ২৯ বছর ধরে আমি জানি, একজন লোক যদি ভাল ও সস্তা মাল তৈরি করে বর্তমান সময় ও ভবিষ্যতের জন্য-তাই যথেষ্ট। মানুষের সেবা এতে সকলের চেয়ে ভাল করা যায়। আমার তরুণ বয়সেও তাই আমি মাল তৈরির উন্নতিকে জীবনের ব্রত করেছিলাম।

আমার অভিজ্ঞতা এই যে কর্মপ্রণালীর উন্নতিসাধন শুধু উৎসাহ ও সুমিষ্ট ব্যবহার দ্বারা হয় না—এর পেছনে থাকা চাই অক্লান্ত পরিশ্রম, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ। এর প্রধান শত্রু হ'ল নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সকলের সামনে জাহির করা ও কার্যে বিশৃংখলা।

মানুষের স্বভাব, প্রগতির দ্বারা সুবিধাটুকু সে একাই ভোগ করতে চায়। মাল তৈরির কাজে সামান্য উন্নতির জন্যে শ্রমিকদের কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়। এতে করে প্রত্যেক আবিষ্কারক শ্রমিককে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী করে তোলে। কিন্তু তার সব সময়েই ভয়, যদি তার উন্নততর কর্মপ্রণালী অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রবর্তিত করা হয়, তবে তার পুরস্কারের হার কমে যাবে। মানবের প্রধান দুর্বলতা আত্মস্বার্থবোধ এখানে উন্নতির পথে বাধা এনে দেয়।

মাল উৎপাদনের উন্নতি নির্ভর করে মানুষের প্রত্যেকটি দোষ ও খুঁৎ সংশোধন করে ধীরে ধীরে তার মধ্যে আত্মস্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়ার ওপর। কারখানার প্রত্যেক শ্রমিক মাল উৎপাদনের উন্নতির চেষ্টা করলেই কাবখানা ও মালিকের প্রকৃত উন্নতি।

যদি মালিক ভাবে, উন্নতির ফল তাকে শ্রমিক ও ক্রেতার সংগে ভাগাভাগি কবে নিতে হবে, অতএব এ উন্নতিতে তার একার লাভ কিছু নেই—তবেই উন্নতির পথে বাধা পড়ে। কিন্তু যদি তিনি ভাবেন, ব্যবসায় ও কারখানা তাঁর নামে রেজেস্ট্রী করা থাকলেও তাঁর একাব ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠান মাত্র, তবেই শ্রমিক, ধনী ও ক্রেতা সকলেরই মংগল।

যেখানে ব্যবসায়ী এ ধরণের স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেখানে উৎপাদনেব প্রধান বাধা দূব হয়ে গেল। মজুরি নিয়ে সেখানে মজুরেরা ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে না, খরিদ্দারে জিনিসের দাম নিয়ে দবদস্তুব করে না। ব্যবসায়ীকে আইন দ্বাবা নীতিবাদী করে তোলা যায না, আইনের পীড়াপীড়ি এক্ষেত্রে অনেক সময় শ্রমিকদের পক্ষে উপকারী নয়। সাধু ব্যবসাযীব সংখ্যা বাড়াবে যত বৃদ্ধি পাবে, অসাধু ব্যবসাযীর দল ততই অন্তর্হিত হবে। আইন দ্বারা ব্যবসায়ীর কাজে বাঁধাবাঁধি একচেটে ব্যবসা, প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় ব্যবসাগুলির রক্ষা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে মাল উৎপাদনের নীতিবাদ ক্ষুন্ন হয়, উৎপাদন প্রণালীর প্রগতির পথে এরা একান্ত বাধা।

ব্যবসায় ও প্রবঞ্চনা

(১৯২৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

অনেক লোকের বিশ্বাস আছে সাধু উপাযে ঐশ্বর্য সঞ্চয করা যায় না। প্রত্যেক দেশের ধনী ব্যক্তির সম্বন্ধে এ কথা প্রচলিত আছে। আমাদের সহরে মিকুলাস্ কাসপাবেক সম্বন্ধেও এরকম গল্প প্রচলিত ছিল। ইনি প্রায় ত্রিশ বৎসর জিলুন্ সহরের মেয়র ছিলেন এবং নগরবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

তাঁর সম্বন্ধে গল্পটি এই। তিনি বাজারে যাচ্ছেন গাড়িতে, সামনে কতকগুলি সামরিক গাড়ি যাচ্ছিল। একজন জেনাবেলেব গাড়ি থেকে একটা লোহার সিন্দুক পড়ে গেল। কাসপাবেক সিন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে লুকিয়ে আলোধুক্ সহরে উপস্থিত হ'লেন। এই করেই তাঁর ঐশ্বর্য কুড়িয়ে পাওয়া টাকায়।

আর একটি এমন গল্প এখানে বলি। হ্রাদিস্ত্ সহবে একজন খাদ্য ব্যবসায়ী ছিল, তার নাম

ইম্যানুয়্যাল ফ্রুস্ট। তার বসত বাড়ির নিকটে সে প্রথমে একটি দোতলা বাড়ি ওঠায়, আবার তার পাশে আর এক দোতলা বাড়ি ওঠালে আর কিছুদিন পরে। তখন প্রতিবেশিরা ঠিক করলে যে সে একজন ধনী ব্যক্তি। ঐশ্বর্যের কারণস্বরূপ তারা নির্দেশ করতো, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় ফ্রুস্ট অস্ট্রিয়ার সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রুসিয়ার রাজার সৈন্যদলে যোগ দেয়। সেই সময় অস্ট্রিযার পুলিস ধরে ফেলে যে ফ্রুস্ট তার বাড়িতে একটা পিপাবোঝাই সোনার মোহর পাঠায়। ফ্রুস্ট প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয, কিন্তু শেষে সম্রাট তাকে দয়া করে প্রাণদণ্ড মকুব করেন। প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তার প্রতি আদেশ হয যাবজ্জীবন, সে গলায একটা কালো ফিতে পরবে এবং প্রতি বৎসর দেশের দরিদ্র লোকের কাজের যোগাড় করে দেবার জন্যে একটি করে দোতলা বাড়ি তৈরি করবে।

এ সবের মূলে এই বিশ্বাস প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান যে সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য অপরের নিকট থেকে অপহরণ না করলে কেউ পায় না। লোকে বিবেচনা করে ঐশ্বর্য এক-আধজনের আয়ত্তাধীনে থাকবার জিনিস, সকলের নয়। সুতরাং ব্যবসা ও শিল্প প্রতারণা দ্বারা ধনসঞ্চয়ের একপ্রকার উপায় মাত্র নতুবা শিল্পী বা ব্যবসায়ী ধনী হয কেন?

কিন্তু আসলে ঐশ্বর্য তারই করতলগত হয যে সৎ পথ আশ্রয় করে ব্যবসা ও মাল উৎপাদনের দ্বারা দেশের জনসাধারণের সেবায নিযুক্ত।

আমি সৎপথে ব্যবসা চালানো বলতে কি বুঝি?

বুঝি এই যে কেনাবেচা চুকে যাবার পরে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হবে। মাল তৈরির কাজ ও ব্যবসায় এমন ভাবে চালানো চাই যে এ কাজে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোকের সম্পদ বৃদ্ধি হয, কি মজুর, কি মালিক, কি ক্রেতা। লাভের বেশি অংশ ভাগ করে দেওয়া হয মজুর ও ক্রেতাদের মধ্যে, কম অংশ মালিক রাখেন নিজের জন্যে। একমাত্র এই নীতি অবলম্বন দ্বারাই ব্যবসায়ী তার তৈরি মালের খরিদ্দার বাড়াতে পারেন। বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায শুধু এই পথেই গড়ে উঠতে পারে—প্রবঞ্চনার পথে নয। ক্রেতা বা মজুর খুঁজবে নিজের দু'পয়সা লাভের পথ। যেখানে তারা লাভবান হবে সেখানেই যাবে। সুতরাং যে ব্যবসায়ী লাভের মোটা অংশ খরিদ্দারদের মধ্যে ভাগ করে দেন, তাঁর খরিদ্দারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলাই স্বাভাবিক—এবং যিনি তাদের ঠকাবেন, তাঁর কাছে কেউ যেতে চাইবে না।

সব সময়েই মনে রেখো, সম্পদ বৃদ্ধির সীমা নেই, জনসেবা দ্বারা, মূল্য সৃষ্টি দ্বারা এই সম্পদ বৃদ্ধি হয। প্রত্যেকেই ধনী হতে পারে। আমাদের যে ধারণা আছে, সব লোকে সমান ধনী হতে পারে না-সেটি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয।

কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীর নীতি যত উন্নত হবে, দেশ ও দেশবাসী তত ধনী হবে। যেখানে জনসাধারণে পরস্পরকে প্রতারণা করে, সে দেশে সকলেই দরিদ্র। একবার একজন রাজনীতিবিদ ব্যক্তি রথচাইল্ডকে ইহুদি ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির কথা বলেছিলেন। রথচাইল্ড উত্তর দেন, "কথা ঠিক, তবে এ ধরণের ইহুদি সবদেশেই আছে, দেশের অবস্থা এদের অস্তিত্বের একটি প্রধান কারণ।"

শিল্পী বা ব্যবসায়ীর নৈতিক অবস্থা নির্ভর করে দেশের ও জাতির শিক্ষার উন্নতি অবনতির ওপরে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় একজন ব্যবসায়ী অস্ট্রিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে বলেছিল, "রাশিয়ায় আমি জানি যে আমার কিছু ঘুস দিতেই হবে কিন্তু অস্ট্রিয়ায় এসে বুঝতেই পারি না ঘুস দিতে হবে কি না।"

এমন কয়েকটি জাতি আছে যারা ব্যবসায়ীর সততার যথেষ্ট মূল্য দেয়। ১৯১৯ সালে আমি মাসাচুসেট্‌স্, লিন্ সহরে একটি আপিস খুলে আমার টাইপিস্ট মিস্ আর-কে একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনতে পাঠাই।

মিস্ আর ফিরে আসবার পূর্বেই আমার কয়েকটি বন্ধু ব্যবসায়ী আমার আপিস-ঘরে ঢুকে আমাকে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে আমার টাইপিস্ট একাজে কিছু কমিশন মারবার চেষ্টায় ঘুরচে। ফার্নিচারের দোকানী নিজেই আমার বন্ধুদের জানিয়েচে এবং আমার কাছে কথাটা বলতে বলেচে।

উন্নত দেশসমূহ ব্যবসায়ের সততা রক্ষায় এ রকম উৎসাহী। অপর পক্ষে, আমি এমন সব দেশের কথা জানি, যারা তাদের ব্যবসায়ী বন্ধুর কর্মচারীদের ঘুস দেয় বা ব্যবসায়ী নিজে জেনেশুনেও কর্মচারীদের ঘুস নিতে বাধা দেয় না।

শুনলে অনেকে সুখী হবেন যে ব্যবসায়ে যেখানে সততা বিরাজমান, সেদেশে কারখানার মালিক বা ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভাল, আর যে দেশে এমন সততা নেই, সেখানকার ব্যবসায়ীরা দুর্বিদ্র। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ মূল্য সৃষ্টি না করে যারা ধন উপার্জনের চেষ্টা পায় তাদের অবস্থা এ রকমই হয়।

আর একটি নীতি হচ্চে, 'সময়মত দেনা শোধ করা'। আমি জানি অনেক ব্যবসায়ী এ নীতি মেনে চলেন, কিন্তু অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা থাকা সত্বেও ঋণশোধে উদাসীন। তাঁদের জানা উচিত, টাকা জমাতে হ'লে আগে দেনা শোধ করে তারপর টাকা জমানো উচিত।

বাটা ও যাতায়াতের সুবিধা

বাটার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল একটি বিষয়ে - শীঘ্র যাতায়াতের ও মাল পাঠানোর সুবিধা। তিনি ১৯৩২ সালে এ সম্বন্ধে বলেন, "আমার বয়সের অনুপাতে আমার কাজের পরিমাণ অনেক বেশি। জীবনে এত কাজ এত অল্প সময়ে করার মূলে রয়েচে এ যুগের শীঘ্র যাতায়াতের সুবিধা। আমি দু'মাসে যে পরিমাণ ভ্রমণ করেচি, তা জোড়া দিলে পৃথিবী পরিক্রমার সমান হয়। যাঁরা বহু আত্মত্যাগ দ্বারা এই আকাশপথে ভ্রমণের কল আবিষ্কার করেচেন, তাঁরা মানবজাতিকে বহু বৎসর এগিয়ে দিয়ে গিয়েচেন সভ্যতার পথে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এতদূর ভ্রমণ করেছি, যা পূর্বে অনেক বৎসর লেগে যেত শেষ করতে। এর জন্যে সেই আবিষ্কারক ও স্রষ্টাদের নিকট আমি কেন সমগ্র মানবজাতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকবে চিরদিন।

কিন্তু টমাস বাটা যাতায়াতের একটি সহজ ও সনাতন উপায়ের ওপর বেশি জোর দিতেন— রাস্তা। জিল্‌ন্ সহরে তাঁর কারখানায় রাস্তাগুলি পিচঢালা ঋজু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ বিষয়ে তিনি রোম দেশের অধিবাসীদের সমান। প্রথমবার মেয়র নির্বাচিত হবার পরে তিনি পথের ওপর ব্রোঞ্জ অক্ষরে এই কয়টি কথা লিখে দেন, "যে পথকে কমায়, সে জীবনকে দীর্ঘতর করে।"

নিজের জন্মভূমি জিল্‌ন্ থেকে তাঁর চেষ্টার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে সমগ্র জেলায়, সমগ্র দেশে। তিনি স্টেট্ রোড কমিটির সভ্য নির্বাচিত হবার বহু পূর্বে রাস্তা সম্বন্ধে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে কি কি উন্নতি হওয়া সম্ভব তা ঠিক করে ফেলেন। ১৯২৮ সালে তিনি বলেন, রাস্তা তৈরি দ্বারা বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব।

রাস্তার জন্য দশ মিলিয়ার্ড ক্রাউন ব্যয় কি আবশ্যক? যাতায়াতের সুবিধাই মানুষকে মধ্যযুগের দুর্দশা থেকে মুক্তিদান করেচে এবং বর্তমান যুগের উন্নতিকে সম্ভব করেচে। মধ্যযুগে মানবের জীবনে গতির সত্তা ছিল না, তারি পাশে যে খাদ্য প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচলিত, সেই একই খাদ্য আস্বাদ করে এবং চিরদিন এক ধরণের পরিচ্ছদ পরিধান করে মৃত্যুদিন পর্যন্ত কাটাতে হ'ত তাকে। এ অবস্থায় সে ছিল কুসংস্কারের দাস। সে যুগে মানুষ যে সব জিনিস তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করতো—তারাও গতিহীন, যেমন—প্রাসাদ, দুর্গ, গির্জা, পিরামিড, বাজার, সমাধি।

স্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কারের পরে মানুষে গতিশীল জিনিসের নির্মাণে সময় ও শক্তি নিয়োজিত করতে আরম্ভ করলে—রেলপথ, রাস্তা, মোটর, এরোপ্লেন। পৃথিবীতে বাস সুখকর হয়ে উঠলো এর দ্বারা। দেশের লোক পূর্বাপেক্ষা চারগুণ বেড়ে গিয়েচে। আধুনিক কালের একটি সাধারণ লোকের বাড়িতে যা আসবাবপত্র থাকে, সেকালে ধনীব্যক্তিদের বাড়িতে তা থাকতো না। সে কফি, চা, ফল প্রভৃতি বিদেশাগত যে খাদ্যদ্রব্য আহার করে, সেকালে ধনীব্যক্তির অদৃষ্টেও তা জুটতো না। যাতায়াতের সুবিধার পূর্বে মানুষকে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার নিজে সংগ্রহ করতে হ'ত -এখন তার বাড়িতে বসে রাস্তা ও রেলপথের কল্যাণে সে সস্তায় ভাল জিনিস কিনতে পারে। যন্ত্রাদি নির্মাণও সম্ভব হয়েচে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার দরুন। পৃথিবীর এক অংশের লোক অপর অংশের লোককে আগে জানবে তবে তার সুখসুবিধা বুঝবে। যন্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের সুখসুবিধা বৃদ্ধি -তা থেকে ক্রমে ব্যবসায়েরও শ্রীবৃদ্ধি।

একশ' বছর আগে যারা রেলপথ তৈরি করে প্রথম, তাদের ছিল নানা অসুবিধা। এই রেলপথ থেকে মানুষের যে কি সুখসুবিধা আসতে পারে, তা তাদের জানা ছিল না। তাদের সামনে কোন আদর্শ ছিল না, যাতায়াতের সুবিধা মানুষের জীবনকে কি ভাবে পরিবর্তিত করতে পারে, সে অভিজ্ঞতা তখন তাদের কোথায়? তারা জানতো না যে রেলপথ ক্ষুদ্র মিস্ত্রিকে কারখানার মালিক করে তোলে। না জানলেও এবাবদ অর্থ ব্যয় করতে তাদের বাধে নি, কারণ এটুকু তারা জানতো, যা কিছু জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুখকর করে তোলে, তা কখনো লাভজনক না হয়ে পারে না।

আমাদের সামনে রয়েচে আমেরিকার বিরাট ও শক্তিমান জাতির আদর্শ। যে সব স্থানে একশ' বছর আগে একটা রেলওয়ে লাইনও ছিল না, আজ সেখানে ৪০ লক্ষ কিলোমিটার রেলপথ ও রাজপথ। ভূগর্ভ থেকে তেল পাইপ বাহিত হয়ে কিভাবে কারখানায় ও রেলগাড়িতে পৌঁছচ্চে। সে দেশে ক্রোড় ক্রোড় মোটরগাড়ি, আর আমাদের দেশে ধনী ছাড়া মোটর কেউ কিনতে পারে না। সুবৃহৎ চুম্বকের মত রাজধানী ও বড় বড় নগরীকে সংযোজিত করে দিচ্চে এই যাতায়াতের পথগুলি। যদি একটা মোটরগাড়ির মালিক দিনে ত্রিশ মিনিট সময় বাঁচাতে পারে এবং যদি একজন আমেরিকান ব্যবসায়ীর একঘণ্টার দাম হয় এক ডলার, তবে মোটরগাড়ি জাতির ধনভাণ্ডারে রোজ তুলে দিচ্চে ১২০০০,০০০ ডলার প্রতিদিনে, প্রতি বছরে ৩৬০,০০০,০০০ ডলার।

ভ্রমণ মানুষের কত জ্ঞান বৃদ্ধি করে তা অঙ্কে বোঝাবার জিনিস নয়। ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা নব নব ব্যবসায়ের পন্থা ও সুযোগ আবিষ্কার করে। তা থেকে তৈরি হয় বড় বড় কলকারখানা, লোকের দু'পয়সা আয়ের পথ সুগম হয়। যে লোক তরুণ বয়সে একবার যন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য বুঝেচে সে আর হাত দিয়ে কাজ করতে চাইবে না, মস্তিষ্কের শক্তিকে সে নিয়োগ করবে দশের কাজে।

আমেরিকার অধিবাসীরা যাতায়াতের সুবিধার মূল্য এ যুগে যে কত বেশি তা ভাল ভাবেই

বোঝে এবং এজন্যে টাকা খরচ করতে দ্বিধা বোধ করে না। তারা তাদের আযের এক দশমাংশ ব্যয় করে গাড়ির জন্যে এবং গবর্ণমেণ্টের আয়ের শতকরা ১২ ভাগ রাস্তা তৈরির কাজে। তারা জানে এ পয়সা ব্যয় নিরর্থক হবে না।

ইংরেজ ও ইউরোপের অন্য অন্য জাতিও তাই করে। দেশের মধ্যের ভাল রাস্তা দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে এবং খারাপ রাস্তার ধুলো ও কাদা থেকে আমাদের উদ্ধার করে। জেলার কর্তারা পয়সার ভাগ নিযে চীৎকার ও গালিগালাজ করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁদের একত্র বসে এর উপায় খুঁজবার চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের সম্মুখে এই একটি বিরাট কর্তব্য। রাস্তার অভাবে আমরা আমাদের মহামূল্যবান সম্পত্তি 'সময়' অযথা বাঁকাচোরা রাস্তার এমোড়ে ওমোড়ে অনর্থক ঘুরে ব্যয় করচি এবং নিরীহ পথিকদের জীবন বিপন্ন করে বেড়াচ্চি। এর কারণ আমাদের রাস্তার উপবিভাগ যথেষ্ট কঠিন নয়, শক্ত ও মজবুত রাস্তা না করলে বারে বারে মেরামত করতে বহু টাকার অপব্যয় ঘটে। এভাবে দেশের রাস্তাগুলি ভাল করতে হ'লে ইংরেজ ও আমেরিকানদের মত আমাদেরও গবর্ণমেণ্টের আযের শতকরা ১২ ভাগ ব্যয় করতে হবে অর্থাৎ বার্ষিক ব্যয় পড়বে প্রায় এক মিলিয়ার্ড ক্রাউন। গত দশ বৎসরের ব্যয় স্বরূপ মোট যে দুই মিলিয়ার্ড ক্রাউন ধরা হয়েচে -ওতে কিছুই হবে না। নিম্নলিখিত কার্যকরী প্ল্যান আমরা ঠিক করেচি:—

অর্থনৈতিক— আবশ্যকমত অর্থাগমের সুবন্দোবস্ত।

শিল্পসংক্রান্ত—রাস্তা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কলকারখানা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা।

ব্যবসা—যে অঞ্চল থেকে অর্থাগম হয়, সে অঞ্চলের সঙ্গে নিজের দেশের যোগাযোগের জন্যে রাস্তা তৈরি করা।

অধিবাসীদের অন্নসমস্যা সব চেযে বড় সেদিকে নজর রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। যাতে অধিবাসীদের আয় বাড়ে যাতে অন্নসমস্যার মীমাংসা হয় এমন একটি উপায় আমাদের বের করতে হবে। আমাদের দেশে লোকের হাতে যা অর্থ আছে তাতে ভাল রাস্তাঘাট অনায়াসেই হতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভাল রাস্তা হ'লেই বড বড় কলকারখানা স্থাপিত হবে নব শিল্প প্রচেষ্টা সম্ভবপর হবে, কৃষিকার্যেরও উন্নতি হবে - গত কযেক বৎসর যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়েচে আমাদের দেশে তার উপযুক্ত সমাধান হবে—বিরাট চুম্বকের মত বড় বড় রাস্তা নানা দিক থেকে অর্থ আকর্ষণ করে আনবে।

রাস্তাঘাট, চলাচলের সুবিধা ও দেশের লোক

(১৯২৭ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

চক্রের আবিষ্কার আমাদের পূর্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ করেচে। চক্রের আবিষ্কারের পূর্বে বালকেরা পাশের গ্রামে যেতে ভীত হ'ত—প্রাচীন ছড়ার মধ্যে তার প্রমাণ আছে, "পোলাংকাতে যেও না যাদুমণি, তোমাকে মেরে ফেলে তোমার প্রণযিনীকে তারা কেড়ে নেবে।"

প্রত্যেক গ্রামের তরুণেরা সেই গ্রামের তরুণীদের বিবাহ করতো—একই গ্রামের মধ্যে বার বার বিবাহ করবার ফলে বংশ হীনবীর্য হযে পড়তো— কিন্তু ভিন্ন গ্রামে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। অন্য গ্রামের তরুণীদের ওপর অধিকার সেই গ্রামের তরুণদের—বিদেশী লোক সেখানে গেলেই মারামারি বেধে যেত।

চক্র আমাদের সে পঙ্গুতা দূর করেচে—রাস্তা ছোট করে এরা পরস্পরকে মিলিয়ে এনেচে, দূরকে করেচে নিকট, আমাদের চিরভ্রাম্যমান আত্মার অন্তরের তৃষ্ণা মিটিয়েচে। ক্রমে চক্র থেকে হ'ল ইঞ্জিনের জন্ম—দূরত্বের বাধা অতিক্রম করলে মানুষ। কিন্তু রাস্তার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল।

পূর্বে যারা রাস্তা তৈরি করেছিল, তাদের সাইকেল বা মোটরগাড়ি সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। রাস্তা ভাল করে মাপবার তাদের দরকার ছিল না। এক সরাইখানা থেকে অন্য সরাইখানা পর্যন্ত রাস্তা নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হ'ল—এই ছিল তাদের ধারণা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এর চেয়ে ভাল রাস্তা দেন নি আমাদের। সে রাস্ত, আমাদের উন্নতি করা দূরের কথা, পদে পদে বাধা দেয়, উন্নতিকে অবরুদ্ধ করে।

আর কি ভীষণ আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু রাস্তা আমাদের দেশের। সেই সব বাঁকা রাস্তাকে সোজা করতেই স্টেটের কমপক্ষে দুই মিলিয়ার্ড ক্রাউন খরচ হবে। আট মিলিয়ার্ড খরচ হবে পিচ্ দিতে। সাইকেল কিনতে বেশি খরচ নয়—কিন্তু আমাদের মানুষের অবস্থা ওতে ভাল হবে। জাতির উপকার আমাদের আত্মার আনন্দে, টাকার অংকে তার হিসেব লেখা যায় না।

রাস্তার উন্নতির সংগে সংগে জাতির অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি। আমাদের অনাগত বংশধরেরা আমাদের মানুষ বলেই ভাববে না নতুবা। ধুলো-কাদায় লুটোপুটি খেয়ে বেড়ায়, এমন অসহায় পূর্ব-পুরুষও ছিল তাদের। অনাগত উত্তরপুরুষদের ঘৃণা অর্জন করতে যদি না চাও, দশ মিলিয়ার্ড ক্রাউন ব্যয় কর ভাল রাস্তার জন্যে। সত্যিকার মানুষের মত উন্নত জীবনযাপন করতে আমাদের সংকোচ কিসের?

যখন গ্রামে গ্রামে তরুণেরা খুনোখুনি করচে তরুণীদের ওপর অধিকারের দাবি নিয়ে, তখন বৈজ্ঞানিকেরা টেবিলে বসে মোটা মোটা কেতাব লিখচেন, মানুষের উন্নতির উপায় বাৎলে। কিন্তু কথায় কি হয়? বাস্তব জীবনে গতিশীল চক্র সেই সমস্যার সমাধান করলে। কথায় কিছু হয় না—মানুষের মন হরণ করে কাজ।

আমাদের জাতির উন্নতির জন্য যদি আমাদের পথঘাট পাথর দিয়ে না বেঁধে সোনা দিয়ে বাঁধাবার দরকার হয়—তাও আমাদের করতে হবে।

আমার অর্থনৈতিক আদর্শ

[১৯৩০ সালে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সমিতি টমাস বাটাকে অনুরোধ করেন, তাঁর উন্নতির কারণ কি, সে সম্বন্ধে কিছু লিখতে। তদনুসারে টমাস বাটা নিম্নলিখিত রচনাটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ করেন]

আপনারা আমায় বলতে বলেচেন আমার ব্যবসাকে এত বড় করে তুললাম কি করে। আমি উন্নত ও কৃতবিদ্য মানুষ গড়ে নিয়েচি নিজের হাতে, তাদের কর্মশক্তিকে সঞ্জীবিত করেচি—তারা, সেই মানুষেরা আমার ব্যবসায়কে গড়েচে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা উল্টো ও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করি। আমাদের উচিত এমন একটি নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করা, যার মধ্যে মানুষের মন উন্নত হয়, কর্মপ্রণালী বিশুদ্ধ ও বাধাশূন্য হয়। এ করবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই বলেই আমি নিজের কর্মপ্রণালী নিজেই ঠিক করে নিলাম। দেশের সম্মুখে এই আদর্শকে স্থাপিত করতে হবে আমাকেই।

আমাদের শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা ও ব্যবসার অবস্থা ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠল। আমাদের হিসেব প্রকাশ করার পদ্ধতি সকল শ্রমিকের মনে উৎসাহ ও কর্মস্পৃহা জাগ্রত করলে। আমরা আমাদের শ্রমিক ও খরিদ্দারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ল—এটাই স্বাভাবিক। এই অবস্থাকে আনয়ন করার মধ্যেই কারখানার মালিকের অর্থনৈতিক সার্থকতা নিহিত।

যখন এভাবে কর্মপ্রণালী আমরা আরম্ভ করেছি, তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা আজকালকার অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতই। স্টেট মুদ্রার মূল্য কমিয়ে দিচ্ছে, বিনিময়ের উচ্চাহার এমন, যে মাল তৈরি করতে যে খরচ পড়ে, তার চেয়েও কমদরে মাল বিক্রী করতে হচ্ছে। তা কি দেশে, কি বিদেশে। কারখানার মালিকেরা দেখলে, মাল তৈরি বন্ধ করে বেকার শ্রমিকদের স্টেটের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই অধিকতর লাভজনক।

আমি দেখলাম এ পথে গেলে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং তা আরও জটিলতর হবে। তা'ছাড়া এ একধরণের কাপুরুষতা। এর ফলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হবে, জীবনযাত্রাপ্রণালী নিম্নস্তরে পৌঁছবে। এই যাদুর গণ্ডি চূর্ণ করে যদি কেউ দিতে পারে, তবে স্টেটের অর্থনৈতিক মুক্তি। আমিই সেই কর্তব্যভার নিজের হাতে তুলে নিলাম।

আমাদের অবস্থা তখন কি রকম? ঠিক ইংরেজ জুতো ব্যবসায়ীর আজ যে অবস্থা। ইংরেজ জুতো ব্যবসায়ীর জুতো হিন্দুরা কেনে না—কারণ হিন্দুরা ইউরোপের বাজারে তাদের চা'ন এমন দরে বিক্রী করতে পারে না—যার ফলে ইংরিজি জুতো কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব।

এই সব ব্যবসায়ীরা কম মাল তৈরি করে, তাতে খরচ পড়ে অনেক বেশি। কাজেই মালের দামও পড়ে বেশি।

এখন প্রশ্ন এই, জুতোর দাম কিভাবে কমান যায়, যাতে হিন্দুরাও ঐ জুতো কিনতে পারে? এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে জুতোর যা মূল্য, তার চেয়ে দাম না কমালে ভারতবর্ষের বাজার আমাদের পক্ষে বন্ধ।

১। যে মাল যে দরে কেনা আছে, ভারতবর্ষের বাজারে সে মালের যা মূল্য—এই দু'টির মধ্যে বিষম পার্থক্য। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সস্তায় বাজারের চাহিদার উপযুক্ত মাল কিনতে হবে।

২। কম পরিমাণে মাল তৈরির জন্যে ট্যাক্সের পরিমাণ দিতে হচ্ছে পড়তায় বেশি—সেটা বন্ধ করতে হবে।

৩। মূলধন ধীরে ধীরে ঘুরে আসার দরুন টাকার সুদের যে লোকসান, তা বন্ধ করতে হবে।

যদি ব্যবসাদার ও কারখানার মালিক বোঝেন, তাঁদের জিনিসের দাম বড় চড়া, তখন তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত কিসে খরচ বাড়ল। অতিরিক্ত অনাবশ্যক শ্রমিক পুষতে গেলে তৈরি মালের জিনিস বাড়াতেই হবে। কতকগুলি শিল্পসংক্রান্ত কারখানা এমনভাবে চালান হয় যে, যখন কতকগুলি করাখানার কাজ চলচে, সেই কাজের ওপর নির্ভর করে বাকী কারখানাগুলির কাজ বন্ধ, পূর্বোক্ত কারখানা অলস কারখানাকে সাহায্য করচে। শ্রমিকদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করচে। এর উদ্দেশ্যই হ'ল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি।

আমি এ ধরণের ব্যাপার আদৌ ভাল মনে করি না। শ্রমিকের নীতি এই হওয়া উচিত, সে যদি

খাটে তবে পয়সা পাবে—না খাটলে সে পয়সা নেবে না। এই একমাত্র উপায়ে দ্রব্যের মূল্য বাজারে তার অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রেখে চলতে পারে। যদি শ্রমিকের হাতে কাজ না থাকে, তবে অনেক সময় অবাঞ্ছিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও খাটতে হয় সুদিনের প্রতীক্ষায়।

১৯২২ সালে এই নীতি আমি অবলম্বন করি। আমার মজুরেরা আমার নীতি সমর্থন করে। জিনিসের দাম কমিয়ে অর্ধেক করে দিই, শ্রমিকেরা তাদের মজুরি ৪০ পার্সেণ্ট কমিয়ে নিতে রাজি হয়। সেদিন থেকে আজকার দিনের মধ্যে আমাদের মজুরদের বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, আমাদের মাল তৈরির পরিমাণ দশগুণ বেড়ে বিদেশের বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

এই উপায় দ্বারা আমরা আমাদের শ্রমিক ও খরিদ্দারদের উপকার সাধন করেছি বলেই মনে করি। এ না করলে বহুদিন ধরে আমাদের দেশে জুতোর বাজার মন্দা যেত। স্টেটেরও সুবিধা হ'ল এতে। ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যই এই, লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার সাধন করা। যেখানে যে জিনিস সস্তায় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে সে জিনিস তৈরি করতে হবে।

ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা, বিশেষ করে চামড়া ও জুতোর ব্যবসায়ের অবস্থা, খুব ভাল নয় যদি এদিক থেকে দেখা যায়। আমদানি মালের ওপর চড়া শুল্ক বসিয়ে প্রত্যেক দেশে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে। সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে ভেতরে ঢুকবার সাধ্য হয় না কোন বিদেশী ব্যবসায়ীর তার ফলে আমাদের দেশের দশলক্ষ লোকের পায়ে জুতো নেই। ইউরোপ একদিন সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল সেই ইউরোপের এ দুরবস্থায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কি ভাববে আজ?

আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ এ আমি বিবেচনা করি। তারা এমন কোন প্রাণীর সৃষ্টি করে নি তাদের দেশে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রিটীশ ও আমেরিকা বহু লোকের সেবা করে বলেই তাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল। শুধু তাদের ক্ষাত্রশক্তিতে আজ জগৎময় প্রভুত্ব স্থাপন করেছে—এ কথা ঠিক নয়। ইউরোপের কর্তব্য জগতের সব দেশের বাণিজ্যকে সাহায্য করা—উচ্চ কাস্টম শুল্কের পাঁচীল তুলে জাতির সঙ্গে জাতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা নয়।

ইউরোপের বড় বড় দেশে এরকম লোক দরকার যাঁরা ব্যবসাদারের চোখরাঙানো ও শ্রমিকের অসন্তোষকে ভয় না করে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তন করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের আবহাওয়াকে নির্মল করতে হ'লে এটা দরকার। তবেই দ্রব্যের মূল্য কমবে, মজুরির হার বাড়বে, সমগ্র দেশের উপকার হবে।

বন্ধুত্ব—হল্যাণ্ডে ও আমাদের দেশে

(১৯২৪ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমাদের দেশে নতুন কিছু শিখবার উপায় নেই প্রতিবার ভ্রমণের ফলে। গতবার হল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে আমি ওদেশের সভ্যতার একটি উৎকৃষ্ট দান লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি—সে দান হচ্ছে বন্ধুত্ব। এক শনিবারে সন্ধ্যার সময় আমাদের এক জুতোর দোকানে অনেক নতুন শ্রমিক দেখে দোকানের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ হঠাৎ এতগুলি লোক নিযুক্ত হওয়ার কারণ কি?" ম্যানেজার বললে, "কেউ তার চাকর নয়, ওরা তার বন্ধু। শনিবারের সন্ধ্যায় বন্ধুরা ওকে সাহায্য করতে আসে।"

এ বন্ধুত্ব আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশে বন্ধু সাহায্য করতে আসে মদ খাবার লোভে। হল্যান্ডে শনিবারে যখন দোকানে ক্রেতার বেজায় ভিড়, তখন বন্ধুরা শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই আসে সাহায্য করতে। রটার্ডামের এমন একটি দোকানে সাহায্যকারীদের মধ্যে একটি ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি নিজের দোকান বন্ধ করে ছুটে এসেছিলেন বন্ধুকে সাহায্যদান করতে।

আমাদের দেশের বন্ধুত্ব অন্যবিধ। বন্ধু এসেচে, দোকানদার অলসভাবে বসে বসে বন্ধুর সংগে আড্ডা দিচ্ছে, ধূমপান করচে—দোকানের কাজকর্ম ফেলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটা কি ক্রেতা? দোকানদার ইতস্তত করে উত্তর দিল—হ্যাঁ। পরে আমি জানতে পারলাম–আগন্তুক ক্রেতা হিসাবে অতি সামান্য, আড্ডাবাজ বন্ধু হিসাবেই বড়। হাতে যখন কাজ না থাকে (কাজ থাকে খুবই কম) তখন এই লোকটি এসে আমাদেব দোকানের ম্যানেজারেব সংগে বসে আড্ডা দেয়, সিগারেট টানে, ম্যানেজারেব সংগে সংগে ঘোরে—এক কথায় তার নিজের বাড়িব চেয়ে আমাদের দোকানেই বেশি সময় যাপন করে। এই বন্ধুর বিশেষ কোন ব্যবসায দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নেই, যা আমাদের ম্যানেজারেব কাজে আসতে পারে। বাজে গালগল্প ও ধূমপান ব্যতীত তাকে অন্য কোন কাজ কবতে দেখি নি দোকানে যখন ক্রেতার খুব ভিড়, তখনও দেখিনি তাকে তার বন্ধুর কাজে সাহায্য করতে।

এ ধরণের বন্ধুত্ব করে কোন লাভ নেই। এবা নেয অনেকখানি, দেয না কিছুই। ব্যবসাদারের পক্ষে বহুমূল্যবান সম্পত্তি হচ্ছে সময়, সেই সম্পত্তিকে তারা বৃথা নষ্ট কবে। ব্যবসাদাবেব উচিত শুধু ব্যবসাদারের সংগে বন্ধুত্ব কবা। কেরাণীর কাজ অন্যরকম-দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাজ, তারপব তার ছুটি। ব্যবসাদাবকে সর্বদা নিজের কাজ নিযে ব্যস্ত থাকতে হবে- এবকম লোকেব সংগে বন্ধুত্ব করে তার লাভ কি?

আমি কয়েক বৎসর একটি সহরে বাস কবতাম, সেখানে অনেক ব্যবসাযী থাকতো-তাদের মধ্যে প্রায সকলেই ইহুদী। আমাদের খৃস্টানদের মধ্যে যদি কেউ কোন ব্যবসা খুলত বা কারখানা স্থাপন করত, তবে দু'এক বছরের মধ্যেই ফেল মেরে বসত। তার কারণ, তখন তারা ভাবত—এখন আমাদের ভদ্রসমাজে মেশা দবকাব। তখন তারা সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশলাভ কববার চেষ্টায ঘুবতো। তাদেব বিশ্বাস ভদ্রলোকেরা শুধু বসে বসে বিয়াব খায, শিকার কবে, পার্টি দেয, পিকনিক কবে। এই কবে বেড়ানোর ফলে ব্যবসাযের সুনির্দিষ্ট মঙ্গলের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তারা উচ্ছন্ন যেত।

অথচ ইহুদীরা সে রকম নয, তাবা অন্য লোকের সংগে বন্ধুত্ব বড় একটা করতো না। নিজেদেব দলেব মধ্যেই থাকতো, সর্বদা ব্যবসাসংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া বলতো না। একজন ব্যবসায়ীর অনেক-কিছু শিখবার ছিল তাদেব কথাবার্তা থেকে যা সে নিজের ব্যবসাযে খাটিযে লাভবান হতে পারতো। আর আমাদের ব্যবসায়ীদের দেখ-তারা বন্ধুত্ব করে কেরাণীদের সংগে, কিংবা ব্যবসা করে যে ফেল মেবেচে, এমন ব্যবসাদারের সংগে। তাবা নিজের কাজকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না—গল্প করবার ও আড্ডা দেবার দিকেই তাদের ঝোঁক। এব ফলে লক্ষ্মী একদিন তাদের ছেড়ে যাবেন, একথা ধ্রুব সত্য।



শিক্ষক

যদি একজন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী ও নগরবাসীদের এমন শিক্ষা দেয় যার ফলে তারা জীবন যুদ্ধে সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সাফল্য অর্জন করে তবে তার স্বীকার করতেই হবে সে ব্যক্তির শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ।

টমাস বাটার সমস্ত জীবন নিয়োজিত ছিল নিজের শিক্ষায় এবং দেশবাসীর শিক্ষকতার কার্যে। যেমন প্রতিভাবান ভাস্কর একখণ্ড পাথরে বাটালি ও হাতুড়ির সাহায্যে একখানি মুখ কুঁদে বার করে, তিনিও তেমনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত লোকের মধ্যেও দক্ষতা ও কর্মশক্তির সঞ্চার করতে পারতেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি খুব রূঢ় শিক্ষক ছিলেন– কিন্তু কাজ আদায় করে নিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

তাঁর অসংখ্য রচনা ও বক্তব্য পাঠে লোকে মূলে অনুসন্ধান করতে কৌতূহলী হয়ে উঠতো। তাঁর বাণীসমূহের আদর্শ ছিল এই যে কর্মই শিক্ষার সুবিধাসুযোগ জুটিয়ে দেয়। কেতাবী বিদ্যা মানুষকে জীবনযাত্রায় জয়ী করতে পারে না। তাঁর কারখানা ছিল একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়, মানুষ গড়ার প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরি। যে কেউ এখানে কাজ শিখে জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত হতে পারতো এবং একথা সপ্রমাণ করতো যে, জ্ঞান যদি জনসেবার কার্যে নিযুক্ত করা যায় তবে তা থেকে পয়সা আসবেই।

ইদানীং তিনি বয়স্ক লোকদের শিক্ষা থেকে মন নিয়ে এসেছিলেন বালক ও যুবকদের শিক্ষার দিকে। জীবনকে তিনি প্রবহমান নদী বলে বিবেচনা করতেন, স্কুলকে বাস্তব জীবনের নিকটবর্তী করে এনেছিলেন -জিলন্ সহরে স্কুলকে তিনি পথে এনে ফেলেছিলেন এবং কারখানা ও পথকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন স্কুলে। এভাবে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতায় তাঁর বিদ্যামন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় জনসেবার নূতন মন্ত্রে। তার মত ছিল এই যে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্মস্পৃহানুযায়ী নিজ নিজ পথ বেছে নেবে, যার মধ্যে যেটুকুর বীজ নিহিত আছে তা ফলপ্রসূ হবে -নিজের ও অপরের উপকারে সে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করে দেশের ও দশের মঙ্গলসাধন করবে।

ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর বক্তব্য তিনি দুটি ক্ষুদ্র উক্তির মধ্যে নিবদ্ধ করেছিলেন। উক্তিদু'টি খুব সরল কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। শিক্ষকদের প্রতি তাঁর উপদেশ, 'নিজে উদাহরণস্বরূপ হও।" ছাত্রদের বলতেন, "চেষ্টা করে কর্ম সম্পন্ন কর।"

বিদ্যালয়ের লক্ষ্য

[চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মাসারিক ১৯২৮ সালে জিলন্ সহরে শুভাগমন করেন মাসারিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে। টমাস বাটা বহুব্যয়ে এই বিদ্যালয় তাঁর নগরবাসীর সুবিধার জন্য নির্মাণ করেন। পরপৃষ্ঠায় লিখিত বক্তৃতা এই উৎসব সভায় বাটা কর্তৃক প্রদত্ত হয়]

সভাপতি মহাশয়,

আপনি আজ আমাদের মধ্যে এসে আমাদিগকে সম্মানিত করেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

অতি সামান্য অবস্থা থেকে আমাদের এই কারখানা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, আমাদের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, আগ্রহ ও অধ্যবসায়ই তার মূলে বিদ্যমান। আমাদের মহামূল্য অভিজ্ঞতা নষ্ট না হয়ে যাতে দেশের তরুণ যুবক ও বালকদের কার্যে লাগে সেজন্যই এই বিদ্যালয় আমরা স্থাপন করেছি। আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্টের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বিদ্যালয় যেন দেশে প্রগতির প্রতীকস্বরূপ বর্তমান থাকে, এই আমাদের ইচ্ছা।

আপনি শিক্ষক হিসাবে চিরদিন চেষ্টা করেছেন জনগণকে জাগ্রত করতে ও তাদের কর্মক্ষমতা উদ্বুদ্ধ করতে। এমন মানুষ যাতে গড়ে ওঠে, যার কাছে কর্মই আনন্দপূর্ণ উৎসব ও নৈতিক কর্তব্য। যিনি জনসাধারণের সেবাকে জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

আমাদের তরুণদের মধ্যে এই শিক্ষা সঞ্চারিত করতে চাই এই মহৎ আদর্শ উত্থাপিত করতে চাই। কর্মে আস্থা—সব চেয়ে বড় শিক্ষা মানুষের জীবনের। এই শিক্ষাই এই বড় কারখানাকে গড়ে তুলেছে।

স্কুলকে আমরা কারখানার সঙ্গে যুক্ত করবো হাতের কাজ ও মন তৈরি করা একসঙ্গে কি ভাবে চলতে পারে কি ভাবে বিজ্ঞানকে লাগান যায় অন্নসংস্থানের কার্যে এখানে আমরা তা দেখাব।

আমরা কর্মের দ্বারা এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাই কি ভাবে মানুষ শ্রমের মর্যাদা হৃদয়ংগম করতে পারে আট ঘণ্টা হাসিমুখে কাজ করে কিভাবে সে তার নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকানির্বাহ করতে সমর্থ হয়।

সভাপতি মহাশয় আপনি দেখবেন আমাদের কারখানার কর্মপ্রণালীকে সহজ করেছে এক একটি যন্ত্র এক একটি বৈদ্যুতিক কলের মানুষ। এই কলের মানুষকে কাজে লাগাবার উপায় আমাদের পূর্বপুরুষদের অজানা ছিল। কিন্তু এখন সে আমাদের ভৃত্য এবং তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের জেলাকে প্রকৃতি কৃষি ও খনিজসম্পদে ধনী করেন নি অন্যান্য জেলার মত কিন্তু তবুও আমাদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক বেশি উন্নত অবস্থা অনেক সচ্ছল এবং অদূর ভবিষ্যতে শ্রম দ্বারা তাদের অবস্থা এমন উন্নত হবে যে জগতের সম্মুখে আমরা গর্ব করে সে কথা প্রচার করতে পারব।

আত্মশক্তিতে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে বলেই জগতের সব দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও আমাদের কারখানা টিঁকে আছে, সব দেশের বাজারে আমাদের দোকান বিজয়গর্বে মাথা তুলে আজ দাঁড়িয়ে।

আপনি আপনার জীবনব্যাপী যুদ্ধ ও সাধনার ফলে আমাদের দেশের যে সুনাম অর্জনে সাফল্যলাভ করেছেন, আমরাও আমাদের ব্যবসায়ের দিক থেকে সেই সুনাম বজায় রাখতে পেরেছি, এজন্য আমরা আজ সুখী।

আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—সভাপতি মহাশয়, আপনি দীর্ঘজীবী হয়ে বহু বহু বৎসর ধরে আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকুন।

শিক্ষার আদর্শ

(মাসারিক স্কুলের রিপোর্ট হইতে গৃহীত)

১৯৩০

যদি আমরা জীবনে বড় কাজ করতে চাই, বড় করে মানুষ গড়ে তুলতে হবে আমাদের। সামান্য মানুষ—সামান্য কাজ। বড় মানুষ—বড় কাজ।

এই জিলন্ সহরে আমরা সারা জগতের উপকারের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে যাব। শুধু আমাদের জন্যে নয়। আমাদের মধ্যে কেউ ইলেক্ট্রিক মোটর আবিষ্কার করে নি কিন্তু এখন সে জিনিসটা সারা দুনিয়ার উপকারে লাগচে। কেউ একার জন্যে কিছু করে না। আমাদের কাজও বিশ্ব-বাসীর জন্যে।

মানুষ প্রথমে ছোট থাকে, শিক্ষা দ্বারা সে বড় হয়। যার বয়স যত কম, তাকে শিক্ষা দেওয়া তত সহজ। সে বালক একদিন আমাদের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। আমার ছেলেবেলায় আমি বাবাকে ল্যাটিন অক্ষর শেখাই, কারণ বাবা তাঁর বাল্যে 'সোয়াবাক' (জার্মান ভাষার পুরাতন অক্ষর) ছাড়া আর কিছু শেখেন নি।

আমার ছেলে স্কুল থেকে যা শিখে আসে, আমি তার কাছে সেটা শিখে নি। স্কুল শুধু আমাদের সন্তানদের জন্যে নয়—আমাদের জন্যেও। জ্ঞান অর্জনের দ্বারাই আমাদের জীবনযাত্রা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে সব দিক দিয়ে- অন্য কিছু দ্বারা নয়। স্কুলের জন্যে যে পয়সাটি আমরা খরচ করি, তা বহুগুণ হয়ে আমাদের পকেটে ফিরে আসবে একদিন।

মানুষের সারাদিনের শারীরিক শ্রমের মূল্য কত? বড় জোর তিন ক্রাউন। কিন্তু তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শ্রমের মূল্য অসীম। একজন ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ ক্রাউন মূল্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শ্রম করতে সমর্থ। মানুষ বুদ্ধি দ্বারা অধিকতর অর্থ উপার্জন করতে পারে—তা করতে হ'লে উপার্জনের আসল যে উৎস জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা—এ দু'টির বৃদ্ধি করতে হবে, তবেই দেশের ও দশের উপকার।

১৯৩১

স্বাধীনভাবে সমাজের উপকার সকলেই করতে সমর্থ—কেউ বেশি, কেউ কম। কিন্তু বিনা শিক্ষায় কেউ মানুষ হয় না, দশের উপকারে আত্মনিয়োগ করবার প্রকৃষ্ট পন্থা তাকে কে বলে দেবে? অল্প বয়স থেকে এ শিক্ষা দরকার।

আমার এ শিক্ষা শৈশবেই হয়েছিল। বাবা বলতেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। আমার একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনিও তাই বলতেন।

প্রত্যেক পিতার কর্তব্য তাঁর পুত্রের মধ্যে নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা, দায়িত্বজ্ঞান জাগান। এর জন্যে যদি তাঁর বহু টাকা লোকসানও হয়, তবুও তিনি যেন দুঃখিত না হন। পিতা যদি তাঁর ছ' বছরের ছেলেকে দু' ক্রাউন আয় করতে শিক্ষা দেন, তবে তাঁর নিজের ২০০ ক্রাউন আয় করার চেয়েও তা মূল্যবান, কারণ এভাবেই আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার মূল্য শিখবে, নিজের উপার্জিত অর্থ ঠিকভাবে খরচ করতে শিখবে—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ম হবে এ থেকেই।

১৯৩২

আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন আমার পিতা ও শিক্ষকদেব সংগে আমার বিবাদ চলত, আমি এত বাজে বিষয় কেন শিখি? আমার মনে হয় ছাত্রকে এমন বিষয় শেখান উচিত, যা তার জীবনের কাজে লাগবে। তাকে জীবনযাত্রার উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আজকালের যে কাজ-কর্মের পরিবেশে তার জীবন বর্ধিত হচ্ছে, সেই কাজের সংগে তাকে পরিচিত করে নিতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত মাঠে, পথে, বাগানে, বনে—শুধু গাছপালা নিয়ে বক্তৃতা না দিযে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধেও বলতে হবে। ভূগোল শিক্ষা দেওয়া উচিত প্রত্যেক জেলার বিবরণ নিয়ে, ভূগোলের মাত্র কয়েকটি শাখা শেখানো উচিত। নীতিবাদ একেবাবে উঠিয়ে দেওয়া চাই শিক্ষার মধ্যে থেকে। দু'ঘণ্টা ধরে একথা শেখানোর সার্থকতা কি, যে অমুক কাঠ অমুক কাজে লাগে না? যা হয়, যা লাগে তাই শেখান হ'ক।

চেষ্টা ও মিতব্যয়িতা

অর্থনৈতিক চিন্তা ও মিতব্যযিতা সম্বন্ধে বাটা অনেক গবেষণা কবেচেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ মনেব গভীব গোপনতলে অর্থনৈতিক জ্ঞান জাগ্রত কববাব চেষ্টা কববে। অতি অল্প বযস থেকে প্রত্যেক বালকেব মনে এই শক্তি সৃষ্টি করতে হবে। টমাস বাটাব নিজেব ভাষায আমি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত কবচি:

ছাত্রেবা যে জীবন গৃহে যাপন কবে, তাব ওপব ভিত্তিস্থাপন কবে শিক্ষাদান কর্তব্য। শিক্ষাব উদ্দেশ্য হবে জীবনের উন্নতি সাধন। আমি একটি গ্রাম্যস্কুলে দেখেছিলাম ছাত্রেবা জ্যামিতিব কঠিন প্রশ্নের সমাধানে ব্যস্ত। শিক্ষকের অনুমতি নিযে ছাত্রদেব মধ্যে যে প্রথমে বসে তাকে বললাম কাল বাড়িতে কি খেযেচ?

সে বললে—আলু আর কপি।

আব একজনকে বললাম- তুমি?

সেও তাই খেযেচে—আলু আব কপি। দু'টি তিনটি ছাত্র বাদে ক্লাসের সকলেই সাবাসপ্তাহ ধবে আলু আর কপি ছাড়া আর কোন খাদ্য পায না। সে জেলাব সাধাবণ শ্রেণীব লোক কাঠ কাটা, পাথব কাটা, ও গোপালন প্রভৃতি দ্বাবা জীবিকা নির্বাহ কবে। অথচ সেখানকার লোক যে কাঠ কাটে, তাব ঘনকালি কসতে জানে না -কেরাণিরা যা কালি কসে দেয, দাম পাবার সময তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয।

কেউ জানে না তাদেব গরুর দুধে কত পার্সেণ্ট্ মাখন আছে, বা কোন গরুটা ভাল দুধ দেয়। ছেলেবা যদি এই সব শিক্ষা পায তবে বাপমাযেব কত সুবিধা। যার সংগে তাব জীবনের কোন যোগ নেই এমন শিক্ষায় তাব কি হবে? এই সব শিক্ষা পেলে, এই সব বালকের পরবর্তী বংশধরেরা আর শুধু আলু-কপি খাবে না।

কিংবা:

তুমি নিশ্চযই জানো লোকে সংসারের দৈনন্দিন হিসাব হেলাগোছাভাবে রাখে। যদি বাবা কি মা একখানা রসিদ খুঁজে বাব করতে যায় তো সে টেবিল, আলমারি, সিন্দুক সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পায় না। ট্যাক্স দেওয়ার বিষয়েও তাই। কেউ বোঝে না কেন ট্যাক্স দেওয়া হয়, কি হারে ট্যাক্স দেওয়া

হয়। হয়তো এক বছরেই দু'বার ট্যাক্স আদায়কারী ফাঁকি দিয়ে ট্যাক্স আদায় করে নিয়ে গেল। এই সব হেলাগোছাভাবে চললে কি সংসারের উন্নতি হয়?

ভেবে দেখ—এবিষয়ে স্কুল কত সাহায্য করতে পারে। ছেলেরা স্কুলে গিয়ে হামবুর্গ থেকে বুনোস্ আয়ার্স পর্যন্ত মালের ভাড়া কসে—কিন্তু তারা যদি বাড়ির হিসেব কসতে শেখে, দশ বছরের একটি ছেলে যদি বাড়ি এসে বলে- "স্কুলে আমরা অঙ্ক শিখি। আমি বাড়ির সব হিসেব রাখবো, তোমরা আমাকে তার জন্যে এত করে প্রতি মাসে দেবে।" তা হ'লে ছেলের উন্নতি হয়, সংসারের উন্নতি হয়, স্কুলও বোঝে কি শেখানো দরকার।

তৃতীয় মন্তব্যটি এরূপঃ—

স্কুলের বাগান সমস্ত স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বল, এই জমিটুকু তোমার, এর জন্যে তুমি দায়ী। এর উৎপন্ন ফসলে তোমার অধিকার। সে ছেলেকে বাগান খুঁড়ে ঘাস বেছে, বীজ পুঁতে ফসল তৈরি করতে দাও। বাজারে সে ফসল বিক্রী করে নিজের হিসেব নিজে লিখতে শিখুক। তাকে পরামর্শ দাও, শিক্ষা দাও কাজটি কিভাবে করতে হবে, কাগজে কি করে তার হিসেব রাখতে হবে।

অনেকে বলবেন বাটার শিক্ষার আদর্শ বৈষয়িকতা দোষদুষ্ট।

কখনই না। জীবন যুদ্ধে অপারগ হয়ে কত লোক আজ পথে পথে গৃহহীন নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে তিনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। অর্থনৈতিক ভিত্তির দৃঢ়তা ভিন্ন নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না মানুষের। যে মানুষ দিন আনে, দিন খায়, তার নতুন কিছু করবার সাহস বা সময় কোথায়? এ ধরণের দুর্বল ভিত্তির উপর যে পরিবার প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে থেকে মানুষ গড়ে ওঠে না। সমাজের মঙ্গল মানুষের মঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল আর সে মঙ্গলের পথ নির্দেশ করবে বিদ্যালয়।

শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্য

(১৯২১ সালে ব্রনো সহরে শিক্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমাদের বিদ্যালয়সমূহে মোটা বেতনভোগী ভাল শিক্ষকের নিতান্ত অভাব। সকলেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে চায় না। স্কুল সম্বন্ধেও একথা খাটে। স্টেটের স্কুলগুলি আদৌ ভাল নয় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়। শিক্ষকেরা নিজের দায়িত্বে ব্যক্তিগত-ভাবে যে সব স্কুল চালান, সেগুলি অনেক উন্নত।

একথা ঠিক, ভাল শিক্ষকের বেতন দেয় কে? দেওয়া উচিত ছাত্রের পিতার। কিন্তু আমাদের দেশে পিতা পুত্রের জন্যে বার্ষিক বড় জোর ৪০.৮৯ ক্রাউন খরচ করতে রাজি—কিন্তু কলেজের ভাল শিক্ষা দিতে বার্ষিক প্রায় ৪০,০০০ ক্রাউন খরচ হয়।

মানুষ সেখানেই অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়, যেখানে সে উপকার পায়। আমাদের দেশে শিক্ষকেরা তাদের কোন উপকারেই আসে না। আইন অনুসারে শুধু বৃদ্ধ শিক্ষকেরা মোটা বেতন পেয়ে থাকেন, যাঁরা কাজ ভাল করেন, তাঁরা নয়। স্কুলের উন্নতি হতে পারে, যদি শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষকতা করে ধনী হন, লক্ষপতি হন, নিজের আয়লব্ধ পুস্তক ও যন্ত্রাদি দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে সমর্থ হন। তবেই শিক্ষকতার উন্নতি সম্ভব যখন এই কাজ করে লোকে দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের উন্নতি অন্যান্য শিল্পের উন্নতির মতই একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি দাম দিয়ে ভাল ছবি কেনবার লোভ না থাকে দেশে, তবে সে দেশে বড় চিত্রশিল্পী তৈরি হয় না, তেমনি ছাত্রের পিতা যদি উৎকৃষ্ট শিক্ষকের দক্ষিণাস্বরূপ হাজার হাজার ক্রাউন খরচ করতে কুণ্ঠিত হন তবে দেশে ভাল শিক্ষক তৈরি হবে কোথা থেকে?

শিক্ষকদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে যে সব স্কুল আছে, তার উপকারিতা স্টেটের স্কুলের ছেলেরাও পায়। বড় ছবি প্রেসে ছাপিয়ে নিয়ে যেমন চিত্রের মালিক ছাড়াও বহুলোক তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে।

ফ্র্যাঙ্কফোর্টে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর ছেলেকে ইংলণ্ডে রেখে পড়াতেন। আমি একদিন তাঁকে বলি, "আপনি থাকেন এখানে, অথচ অতটুকু ছেলেকে ইংলণ্ডে রেখে পড়ান কেন?"

তিনি বললেন, "জার্মান স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ভালই। কিন্তু এখানে একজন শিক্ষকও দেখলাম না যিনি এই কাজে দু'পয়সা রোজগার করেছেন। আমার ছেলে ব্যবসাদার হবে, সম্পত্তি তৈরি করবে। যে শিক্ষকের নিজের সম্পত্তি নেই—তিনি আমার ছেলেকে টাকা রোজগার করতে শেখাবেন কেমন করে?"

আমাদের পাটিগণিতেই এর প্রমাণ আছে। শিক্ষক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, "পাঁচ পাঁচে কত?" একজন ছাত্র অঙ্কটা কসে বার করলে, অন্য সব ছেলে তার সঙ্গে চীৎকার করে বলে উঠলো "পাঁচ পাঁচে পঁচিশ।"

এই হ'ল সস্তা শিক্ষা। ৪০.৮১ ক্রাউন ব্যয়ে যা হয়, তাই। এভাবে গণিতশাস্ত্র শেখালে ছেলেদের গণিতের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হবে কি করে? না বুঝে গোলে হরিবোল দিয়ে চীৎকার করে ছাত্র পাটিগণিতের কতটুকু শিখতে পাবে? ছেলেকে অঙ্ক শেখাতে হবে তার জীবনের সঙ্গে যে সব জিনিস জড়িত, যা সে সব সময় প্রত্যক্ষ করছে, তার মায়ের ক'টি হাঁস আছে সে রোজ ক'টি পেনি জমায়—এই সব সুপরিচিত বস্তু ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে।

একবার একটি পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র গ্রাম্য স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে শিক্ষক বই দেখে অঙ্ক দিচ্ছেন ক্লাসে, "৫৮ টন আলু থেকে যদি ১১০.৭৫৪ কিলোগ্রাম শ্বেতসার পাওয়া যায়, তবে আলুতে শতকরা কতভাগ শ্বেতসার আছে?"

অঙ্কের মধ্যে যে ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ঐ অঙ্ক একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে করা সুকঠিন। কাজেই ক্লাসের সর্বোৎকৃষ্ট ছেলেটিও ব্লাকবোর্ডে অঙ্ক কসতে পারলে না। ছেলেদের পক্ষে সে অঙ্কটি শাস্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

আমি শেষ পর্যন্ত দেখেশুনে হেড মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাছাকাছির মধ্যে কোথায়ও শ্বেতসারের কারখানা আছে?" তিনি বললেন, "কোথাও নেই। এ অঞ্চলে যা আলু হয় তা লোকের খেতেই কুলোয় না।"

এই সব থেকে আমার মনে হ'ল, শিক্ষকেরা ছাত্রদের এ পণ্ডশ্রম করাবেন কেন? শ্বেতসার সংক্রান্ত কঠিন সমস্যা ছেলেদের সামনে না উত্থাপিত করে বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষা দেওয়া তাদের পক্ষে উপকারী।

যেমন,—মা যদি ২৮ লিটার দুধ থেকে এক লিটার মাখন বের করেন, তবে দুধে শতকরা কত ভাগ মাখন আছে? গ্রামে দুধ ও মাখন তৈরি হয়। ছাত্রেরা এ নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করবে, নিজে

অঙ্ক কসে দেখুক তাদের মা হিসেবের চেয়ে বেশি বা কম মাখন তৈরি করলেন। এতে সব ছাত্র কৌতূহলের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্র শিখবে, কারণ তার বাড়ির কাজে জিনিসটা লাগচে। এতে জিনিসটা তার শিক্ষা হবে, সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনের ক্ষমতা জাগ্রত হবে—স্কুলের সঙ্গে ছাত্রের বাড়ির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে।

সঞ্চয়ের নীতি

(১৯২৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রিয় ছাত্রগণ,

সেভিং ব্যাঙ্কের যে ব্যবস্থা আমাদের কারখানা থেকে করা হয়েচে, তাতে সঞ্চয় তোমাদের সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে, এর পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের উচ্চহারে সুদ দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক সাফল্য সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে না। সঞ্চয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে এক্ষেত্রে।

প্রথম, উপার্জন, দ্বিতীয় বিবেচনামত ব্যয়, তৃতীয়, সঞ্চয়। তোমাদের বয়স এমন কম নয় যে তোমরা উপার্জন করতে পারো না। আমি একটি ন' বছরের ছেলে দেখেছিলাম যে খবরের কাগজ বিক্রী করে দৈনিক এক ডলার উপার্জন করে। সে ধনী পিতামাতার সন্তান, তার নিজের উপার্জন সবই তার নিজের।

আর একটি ছেলে একটি ব্যবসাদারের কাছে চাকরী করতো—তার চিঠি বিলোর কাজ করতো। কাজ ভালভাবে করা অভ্যাস ছিল তার। ক্রমে সে রাস্তার সকলেই তাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করলে। একটি বালক গাছ থেকে শুঁয়োপোকা উচ্ছেদ করবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। তবে আমি ভালবাসতাম সব চেয়ে একটি ছেলেকে সে মশককুল ধ্বংস করবার ভার নিয়েছিল।

এই সব ছেলে কর্মী কর্মেই তাদের আনন্দ।

উপার্জন কর। ভিক্ষা কোরো না। আত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ কোরো না। আত্মসম্মান বজায় রেখে চল। আত্মসম্মান টাকার চেয়েও বড় জিনিস বলে ভেব।

খুব ভেবে খরচ করবে। খরচ যদি করতেই হয়, বৃদ্ধ লোকের পরামর্শ নাও। সকলের চেয়ে ভাল তোমার পিতামাতা ও শিক্ষকের কাছে পরামর্শ নেওয়া।

সঞ্চয় দ্বারা স্বাধীনতাকে লাভ কর। যে সব ছেলেদের কথা আমি তোমার কাছে বলেচি, তারা একদিন সাফল্য অর্জন করবে। ইউনিভার্সিটির ছেলেদের চেয়ে তারা অনেক ভাল তারা পরের পয়সা ব্যয় করে, নিজেরা একপয়সা আয় করতে আজও শেখে নি। বিশ বৎসর পরে তারা উপার্জন আরম্ভ করবে অত বেশি বয়সে আরম্ভ করে তারা বিশেষ কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয় না।

সম্পত্তি ও জ্ঞান

(১৯৩১ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

তরুণ বন্ধুগণ,

আমাদের স্কুলের উদ্দেশ্য তোমাদের কম পরিশ্রমে বেশি আয়ের পথ দেখিয়ে দেওয়া। এই কৌশল এখন থেকেই আয়ত্ত কর। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট যে, সেও কিছু সম্পত্তির মালিক হ'ক।

জনসেবা দ্বারা অর্থ উপার্জন কর। যে পয়সা তুমি আয় কর নি, তা গ্রহণ কোরো না। প্রত্যেক বালককে কিছু না কিছু আয়ের সুযোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্য। বাড়ির অব্যবহার্য জিনিস বিক্রী এর মধ্যে একটি।

অতএব আমরা গুদামে পরের শনিবার থেকে পুরানো কাগজ, পুরানো পোষাক, পুরানো রবারের জুতো, পুরানো লোহা, কাঁচ ইত্যাদি কিনব। এতে তোমাদের বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, তোমাদের পিতামাতার সাহায্য হবে, তোমাদের অর্জিত অর্থের হিসাব রেখে তোমাদের অঙ্কের জ্ঞান বাড়বে।

নিজের রোজগার পাঁচজনের সামনে গর্ব করে বলতে পার।

কলকব্জার শিক্ষার্নবিশদের প্রতি

আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, তোমরা আমাদের কারখানার কলকারখানাসংক্রান্ত স্কুলের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি। স্কুলে তোমরা থিওরি শিখবে অনেক, কিন্তু মনে রেখো, আসল বিদ্যালয় হ'ল কারখানা, সেখানে হাতেকলমে কাজ না শিখলে তোমরা পাকা মিস্ত্রি হতে পারবে না। তোমরা অনেকে জান না এ স্কুল তোমাদের পক্ষে কত দরকার। বর্তমান জগতের প্রতিযোগিতায় টি'কে থাকতে হ'লে চাই জ্ঞান, চাই অভিজ্ঞতা। এই দু'টিকে যত বেশি পরিমাণ পার, আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর। আমরা উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের স্কুলে নিযুক্ত করেছি- যত পার শিখে নাও তাদের কাছ থেকে। তাদের ভুল ধরতে যেও না, তাদের প্রিয় হও, তাদের কাছ থেকে শিখে নাও। অন্য স্কুলের ছেলেদের মত হয়ো না, তারা তাদের শিক্ষকদের প্রত্যেক ভুলটি জানে। আমি একটি ছেলেকে জানতাম এ বিষয়ে তার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। অনেক বৎসর পরে আমেরিকা থেকে ফিরে তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। সে আমেরিকা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না, সেখানকার লোকের অনেক দোষের কথা সে শুনেচে--কিন্তু তাদের গুণের কথা সে কিছুই জানে না। আমি আমেরিকা থেকে অনেক কিছু শিখে এলাম কারণ তাদের ভাল জিনিস নিয়ে আমার কারবার--সে খুঁৎ ধরতে ওস্তাদ, সুতরাং ওদের কাছে এর কিছুই শিখবার নেই। এধরণের লোকের দ্বারা সৎকার্য কি হবে? কারো কোন উপকারে সে কোন দিন আসবে না।

আমাদের প্রেসিডেন্ট মাসারিকের জীবনী আলোচনা করে দেখ। জনসাধারণের মধ্যে থেকেই তিনি উঠেচেন। তাঁর মত হবার চেষ্টা কর। তোমাদের কাজ যন্ত্র তৈরি করা। পূর্বে ক্রীতদাসেরা শ্রমসাধ্য কার্য সম্পাদন করত--এখন করে যন্ত্রে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই জানো আমাদের কারখানায় এমন যন্ত্র আছে, যা ৩,০০০ ঘোড়ার কাজ করতে পারে--তোমাদের কর্তব্য এই সব কর্মকুশল যন্ত্র তৈরি করা।

মন দিয়ে কাজ শেখো। কাজকে ভালবাস। কর্ম তোমার জীবনকে নষ্ট করচে এ কথা আদৌ ভেবো না। তোমার ও তোমার প্রতিবেশির উন্নতি তোমার হাতে।

ব্যবসায় শিক্ষার সান্ধ্য-বিদ্যালয়

(১৯২৪ সালে কারখানার সান্ধ্য-বিদ্যালয়)

ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের এই সান্ধ্য-বিদ্যালয়কে সাধারণ ব্যবসায়-বিদ্যালয় অপেক্ষাও দরকারী বিবেচনা করি। শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে, নতুন জিনিস শিখতে হবে—কোন স্কুলে সে শিক্ষা হ'তে পারে না। স্কুলের কাজ হচ্ছে অতীতে কি ছিল তাই শেখান। কিন্তু শুধু অতীত গৌরবের অনুষ্ঠান আমাদিগের জীবনে সাফল্য আনয়ন করবে না। ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকের নজর রাখতে হবে বর্তমান যুগের দিকে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার দিকে।

এই গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষমতা আসে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে। এখনকার স্কুলে এ সমস্ত শিক্ষা দেয় না। তরুণ বয়সে, যখন মানুষের মন নমনীয়, যে কোন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, তখনই এই সমস্ত জিনিস শিখতে হয়। যে তরুণ যুবক কখনও একপয়সা আয় করে নি, পিতামাতা দ্বারা অনেক বয়স পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়ে এসেছে, সে তারই বয়সী অন্য কোন উপার্জনক্ষম যুবকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না—কারখানা বা ব্যবসায়ের কাজে।

আমাদের এ স্কুলের কাজ হচ্ছে ব্যবসায় নিযুক্ত বালক ও যুবকদের হাতেকলমে কাজ শেখান। আমি আশা করি তাদের সাফল্য নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারব। তারা জনসেবা দ্বারা প্রমাণ করবে আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীর সার্থকতা।

ব্যবসায়-বিদ্যালয়

('ট্রেড্‌স্ রিভিউ' পত্রে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ)

ব্যবসায় বিদ্যালয় ও সান্ধ্য বিদ্যালয়ের আমি যে তুলনামূলক সমালোচনা করেছিলাম, সেটা নিয়ে তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সেই তর্কের প্রত্যুত্তর আপনার কাগজে দয়া করে প্রকাশ করলে বাধিত হব।

আপনার পত্রে এ বিষয়ে পূর্বে যিনি লিখেছেন তিনিও স্বীকার করেছেন বাণিজ্য বিদ্যালয়ের সংস্কার আবশ্যক। আমিও তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে, কিছু কিছু ব্যবসায়ের থিওরি ছেলেদের শেখান উচিত।

আমার বক্তব্য এই যে, কেতাবী বিদ্যা বহুদিন ধরে শিখবার ফলে এই সব ছাত্র কার্যক্ষেত্রে নেমে কোন শিল্পে বা ব্যবসায়ে প্রায়ই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এই সব স্কুলে ছেলেরা হাই স্কুলের ছেলেদের মত জীবনযাপন করে। কিন্তু তা করলে চলবে না। হাই স্কুলের ছাত্রেরা হবে পাদ্রি, উকীল, অধ্যাপক প্রভৃতি। তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে একজন ব্যবসায়ীর জীবনযাত্রাপ্রণালী খাপ খাবে না। ব্যবসায়ীর জীবনে খাটুনি অনেক বেশি, আয়াস বেশি, আরাম কম। এই শ্রমপূর্ণ জীবনের জন্যে তাকে প্রস্তুত হতে হবে তরুণ বয়স থেকে। অনেক সকালে উঠে তাকে কাজে বেরুতে হবে হাই স্কুলের ছাত্রের চেয়ে। ২২ বৎসর বয়সে এ জীবন আরম্ভ করা যায় না, আরও তরুণ বয়স থেকে পরিশ্রমের অভ্যাস করা আবশ্যক। এরকম হয় না বলেই বাণিজ্য-বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বার হয়ে ছাত্রেরা ব্যাঙ্কে কিংবা সওদাগরি আপিসে চাকরী নেয়, নিজেরা ব্যবসা আরম্ভ করে না। যারা করে, তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

আমাদের চেক্ সহরগুলিতে অনেক ব্যবসায়ী আছে, যারা জীবনে কিছু করতে পারে নি শুধু সৌখীন সমাজের লোকের মত জীবন যাপন নকল করতে গিয়ে। ব্যবসায়ীর জীবন বিলাসীর জীবন নয়।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যে সব ছাত্র অধ্যয়ন করচে, তাদের জীবন এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরা ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে বা বড় ফার্মের সংগে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারে। ব্যবসায়ের স্কুলের অধ্যক্ষদের উচিত তরুণ ছাত্রদিগকে ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ীরূপে গড়ে তোলা।

অতএব দু'মাস তিনমাস ছুটির কোন প্রয়োজন নেই ষোল বছর আঠারো বছর বয়সের তরুণদের। ব্যবসাদারের কাজ দড়িবাজি খেলা দেখানোর মত। একজন দড়িবাজি খেলোয়াড়কে দড়ির ওপর নাচতে শিখিয়ে তাকে বাইশ বছর বয়সে দড়ির নাচ দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পাঠালে তার শরীর শক্ত হয়ে গিয়েচে বলে সে সাফল্যলাভ করতে পারবে না, এই বয়সে সে বিপদের মুখে যেতে ভয়ও পাবে।

সাধুপথে চলে ব্যবসা দ্বারা ধন উপার্জন শেখানই ব্যবসায় বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। কাজেই এখানকার ছাত্রদের জীবন অন্য পথে পরিচালিত হওয়া দরকার। সাত বছরের ছেলেটিও এখানে নিজের উপার্জন নিজে করতে শিখবে। বাইশ বছর বয়সে ব্যবসা-বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরবার পূর্বে যে ছাত্র উপার্জন কিছু না করবে, কিছু টাকা না জমিয়ে রাখবে—সে ভাল নম্বর পাবে না। ছুটিগুলিতে স্ফূর্তি করে বাপমায়ের পয়সা ওড়াবে না যে ছাত্র, পয়সা রোজগার করবে, কিছু কিছু জমাবে-সেই ছাত্র ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করবে।

বিদ্যালয় ও বাসগৃহ নির্মাণ

(১৯৩১ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমাদের গুদামঘর তৈরির সময়ে বহুকালের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বিশেষজ্ঞগণ নতুন বাড়িগুলির আভ্যন্তরীণ গঠনের ব্যাপার নিয়ে গুরুতর আপত্তি তুলেছিলেন—বিশেষত স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে।

পুরান আমলের মিস্ত্রিদের আমরা বলেছিলাম এই সব গঠনের কাজে আমাদের সাহায্য করতে কিন্তু তারা হাতের কাজ ভালই জানে, কাগজে-কলমে অঙ্ক বা নক্সা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। এ জ্ঞানের অভাবে তারা কাজ আরম্ভ করতে পারলে না। স্কুলে প্রত্যেক বালক যেন এই জিনিসটা শেখে। হাতের কাজ যতই ভাল করতে পারুক, যদি সে মনের ভাব কাগজে প্রকাশ করতে না পারে—তবে তার দ্বারা উচ্চস্তরের কোন কাজ হওয়া কি সম্ভব?

আমি শিল্প-বিদ্যালয় তখনি পরিদর্শন করি। এই বিদ্যালয় কারখানা থেকে সাহায্য পেয়ে আসচে। গৃহনির্মাণের শ্রেণীতে গিয়ে দেখি ছাত্রেরা গ্রীক স্তম্ভ নির্মাণ বিষয়ে পাঠ প্রাপ্ত হচ্চে। কিন্তু দেখি, সেই দিনে সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা পায়খানার নলের নক্সা আঁকতে পারলে না। শিক্ষকের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট করাতে তিনি ও আমি এক সংগে স্বীকার করলাম গ্রীক স্তম্ভের অপেক্ষা এ সমস্যার সমাধান সংসারে বেশি দরকারী।

আমি তাঁদের বললাম, আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ডের একটি প্রধান কারণ চিমনির ভুল মাপ। যদি চিমনির সঠিক উচ্চতা ও অন্যান্য মাপ ছাত্রদের শেখানো হয়, তবে কোন মিস্ত্রি বাড়ি তৈরির সময় ভুল ও বিপজ্জনক চিমনি তৈরি করতে পারবে না—কারণ ছেলেরা তখুনি তা ধরে ফেলবে।

মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধারণা থেকে আমাদের গৃহনির্মাতাদের মুক্ত করতে গেলে নতুন বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে তরুণদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে। তরুণ ছাত্রদল স্কুল থেকে নতুন ধরণের প্রণালী শিখে বার হবে। সহরের বাহিরে প্রত্যেক পরিবারের উচিত নবাধরণের স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্মাণ করে বাস করা।

বাড়ি একদিনের জন্যে নয়, ৫০০ বছরের জন্যে অন্ততঃ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আলো বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর বাড়ি তৈরি করে যেমন আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে গিয়েছেন আমরা আমাদের বংশধরের বেলায় তেমনি না করি।

৫০০ বছর ধরে যে বাড়ি টি'কবে, তা একজন লোকের বিশ বৎসরের উপার্জনলব্ধ অর্থে তৈরি হয়। সুতরাং বহু পরিবার অর্থাভাবে অস্বাস্থ্যকর বাড়িতে বাস করে। সস্তায় স্বাস্থ্যকর বাড়িঘর তৈরি করলে এই সব দরিদ্র পরিবার সেগুলি কম দামে কিনতে পারে কিংবা কম ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারে।

তরুণদের জন্য বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি তরুণদের ব্যবসায়ের সন্ধান না জানায় নিজের অভিজ্ঞতা বিবৃত না করে তবে কোন ব্যবসার উন্নতি সম্ভব নয়। মধ্যযুগেও লোকে এটা জানতো জানতো বলেই প্রত্যেক ব্যবসায়ে তরুণ শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করা হ'ত এই ভাবে ব্যবসায়ীসংঘ কর্তৃক শিক্ষিত তরুণদল এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করত।

কিন্তু হায়! শিল্পের অবস্থা অন্য রকম। কারখানায় তরুণ মজুরেরা যখন আসে তখন বয়োজ্যেষ্ঠগণের কোন সহানুভূতি তারা পায় না। নিজেদের অতি স্বল্প অবকাশে যা কিছু সামান্য শিক্ষা করে। যে সময়ে তাদের মন ও শরীরের সুশিক্ষা আবশ্যক, সেই অতি প্রয়োজনীয় সময়েই তাদের জীবন অবহেলিত হয়ে নষ্ট হতে বসে। উদ্ধত বয়স্কগণ তাদের দিকে চেয়েও দেখে না।

কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সব চেয়ে কারা? শিল্প কারখানার মালিকেরা। আর ক্ষতি হয় সেই মজুরদের যারা ঐ সব কারখানায় কাজ করে। বাল্যে যদি গণিতশাস্ত্র শিক্ষা না করে থাকে তবে কলকারখানায় মজুরেরা মজুরই থেকে যায় উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা কারখানার মালিকদের সম্বাদি সম্বন্ধে কোন সুপরামর্শ দিতে পারে না।

বাটার শিক্ষাদানপ্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি লক্ষ্য করলেন, শিক্ষা ব্যতিরেকে মজুরের দল কারখানার কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারবে না। তাদের আয় হবে সামান্য। ১৪—১৭ বছরের বালকদের শিক্ষার্থে তিনি ত্রৈবার্ষিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ভারতবর্ষ থেকে কুড়িজন তরুণ ছাত্র এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরেছে। এখন তারা বাটানগরে দায়িত্বপূর্ণ পদে বাহাল হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছে। যারা বাটানগর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে, তারাও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

নূতন শিক্ষা

[চেকোশ্লোভাক সাধারণতন্ত্রের তরুণদের উদ্দেশে টমাস বাটার বক্তৃতা। বাটার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত]

'পুরুষ' কথার অর্থ অন্যভাবে ধরলে এই দাঁড়ায়, পরিবারের অন্নসংস্থান যে করে সেই পুরুষ।

চৌদ্দ বছরের বালক শুধু নিজের জন্য উপার্জন করে, সুতরাং সে তরুণ পুরুষ। ধনী পিতামাতার সন্তান সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়, তারা এক পয়সা রোজগার করে না। তবে অনেক বালক ভুল করে ভাবে যে তারাও ধনী পরিবারের সন্তান। আশা করি, তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

তরুণ দল! সাহসের সংগে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়! তোমাদের পিতামাতা তোমাদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করতে অপারক ভেবে কিছুমাত্র দুঃখিত হয়ো না। সারাদুনিয়া শিক্ষাগার, কর্মই শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক, দারিদ্র্য শ্রেষ্ঠ সহায়ক। আমাদের দেশে এখন যারা বড় লোক, তারা একদিন তোমাদের মতই নিঃসম্বলে পিতামাতার গৃহ পরিত্যাগ করেছিল। আমাদের দেশে এখন দরিদ্র ব্যক্তিও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে- কেবল চাই অধ্যবসায়, চাই কর্মদক্ষতা।

যে কোন স্বাধীন ব্যবসা বেছে নাও---কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকর্ম। স্বাধীন ব্যবসা ভিন্ন মানবমনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না। দেহ ও আত্মার শক্তি অর্জন কর। ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি পাপ প্রবেশ করে দেহ দুর্বল করে না দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। পাপে অধঃপতন ও পরাজয়, পুণ্যে ও ধর্মে অভ্যুদয়।

তোমরা তোমাদের জীবিকা নির্বাহের পন্থা বেছে নিতে চলেচ। শিল্প বা বাণিজ্য বেছে নাও। এ দুটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হবার ভয় ক'রো না। জীবনের যুদ্ধে দু'পাঁচটা জখম হবে, দু'একটা মারাও পড়বে তাতে ভয় কি? যেখানে লড়াই, সেখানে এগিয়ে যাও পিছু হঠে এসো না। সংগ্রামেই মানুষ গড়ে তোলে।

চারিদিকে সবাই বলচে, "এদিকে এসো না। খালি নেই।" তারা ঠিক বলচে। চাকরি খালি নেই---গবর্ণমেন্টের চাকরিতে মাইনে কম, ঠাসাঠাসি ভীড়। তুমি ভেবো না, স্কুল-কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেচ বলে গবর্ণমেণ্ট তোমার জন্যে চাকরি নিয়ে বসে আছে। মাস্টারি বা সামান্য কেরাণীগিরি দুর্বল ব্যক্তির কাজ- ওগুলো মেয়েদের কাজ। তুমি পুরুষমানুষ, বড় ব্যবসা ও কলকারখানার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা কর। আগে সামান্য বেতনে কোথাও ব্যবসা শেখো - অভিজ্ঞতা-লাভের পর বেশি মাইনের দাবি জানাও। খুব ভাল করে কাজ শিখবার চেষ্টা কর, নিজের ব্যবসায়ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হও---ব্যবসায়ী ফার্মের বৈদেশিক প্রতিনিধি হও- নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা তাদের ও নিজের আয় বৃদ্ধি কর।

যারা এখানে কাজ জোটাতে পারবে না-- পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলে যাও। দুনিয়া ভ্রমণ করে দেখ, সর্বত্র তোমাদের দেশের লোক ব্যবসা করচে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ডেনমার্কের বড় বড় সহরগুলি দেখ, তোমাদের দেশের চেয়ে সে সব স্থানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। এই সব নগরের উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর দেশের ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি নির্ভর করচে।

তরুণ দল

(বাটার স্কুলের তরুণ ছাত্রদের প্রতি ১৯২৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

তোমরা এক হিসাবে তুলনাহীন, আমাদের দেশে এরকম আর একটি তরুণ ছাত্রদল নেই। ১৪/১৫ বছরের বালক আরও আছে, যারা তাদের শিক্ষার সময় কিছু কিছু উপার্জন করে, তারা তাদের সমস্ত উপার্জন দেয় পিতামাতার হাতে তুলে, পিতামাতা তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চালান।

'পুরুষ মানুষ' মানে 'অন্নসংস্থানকারী'। পুরুষের কর্তব্য অতি কঠিন ও অতি মহৎ।

দুঃখের কারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে। যদি মানুষ ঠিকমত তার কর্তব্য করে যায়, তবে জগতে দুঃখ-কষ্ট থাকে না। অর্থনীতি অনুযায়ী মনোবৃত্তি হওয়া উচিত তার। কিন্তু অনেকেরই এ বিষয়ে তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন সাংসারিক মনোবৃত্তির উদ্ভব হয় না। অনেকে বেশি বয়স পর্যন্ত বাপমায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে, ফলে টাকাকড়ির দায়িত্ব কোন দিনই নিজে নেয় না, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতেও জানে না। সংসার পেতে পূর্ব অভ্যাসবশত নিজে টাকাকড়ির দায়িত্ব না রেখে স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়।

আমাদের পরিবারে যথেষ্ট কম্যুনিজম বর্তমান। তবে প্রাচ্য অঞ্চলে আরও বেশি। আমি এক জায়গায় ৫০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে তার ৮০ বছর বয়স্ক অতি বৃদ্ধ পিতার নিকট বিনম্রভাবে সংসার খরচের টাকা থেকে কিছু প্রার্থনা করতে শুনেছি। এই টাকা কিন্তু সেই বৃদ্ধ পুত্রের উপার্জিত।

আমাদের পশ্চিম অঞ্চলে এরকম নয়। ইংলণ্ডে ছ' বছরের বালক নিজের সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে। অর্থনৈতিক মনোবৃত্তির অনুশীলন তরুণ বয়স থেকে হওয়া আবশ্যক। ২৪ বছর বয়স বড্ড বেশি। তার অনেক আগেই এ অনুশীলন আরম্ভ করা উচিত। পরিবারের শিক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় কমিয়ে অর্থ সঞ্চয় করা অত্যন্ত অন্যায়। আমি বরাবর বলে এসেছি সঞ্চয় অর্থনীতির ব্যবস্থায় তৃতীয় স্থান অধিকার করবে। উপার্জনের জ্ঞান বিবেচনাসম্মত ব্যয় তারপর সঞ্চয়।

অর্থ উপার্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না হলে সেটাও দেখতে হবে। 'খাদ্যের চেয়েও জীবন বড়' বাইবেলের একথা ধ্রুব সত্য। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ, পারিবারিক সুখের একটি প্রধান উপাদান। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেই সম্বন্ধ স্থাপনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেকেই উপার্জন করুক যদি পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নিদের মধ্যে পরস্পরের আর্থিক সাহায্য দরকার হয়, তবে সেটা যেন ঋণস্বরূপ গৃহীত বা প্রদত্ত হয়।

আমার পিতার নিকট আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে তিনি অল্পবয়স থেকেই আমায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে আমি পুতুলের জুতো তৈরি করে ৫ থেকে ২০ ক্রিউজার মূল্যে বিক্রয় করেছি। এই টাকা বাবা আমাকে নিজের কাছে রাখতে দিতেন। আমার অর্থ-নৈতিক মনোবৃত্তির জন্ম এভাবে।

সম্মান, শক্তি ও মঙ্গলের পথ

(১৯২৭ সালে 'মাসারিক একাডেমি অফ ওয়ার্ক' নামক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা)

তোমরা শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্র। তোমাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করাই আমার এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য। তোমাদের নিজেদের ও জনসাধারণের সেবা ও মঙ্গল নির্ভর করছে তোমাদের কর্মের উপর– মাল তৈরি ও ব্যবসায় ভিন্ন দেশের প্রত্যেকের মঙ্গল সম্ভব হয় না। লোকের পায়ে যদি এক জোড়া ভাল জুতো থাকে, তবে সে শীতাতপ সহ্য করতে পারে অনেক বেশি। খালি পায়ে বেড়ানর চেয়ে ভাল জুতো পরে বেড়ালে অনেক বেশি কাজ করা যায়। সাইকেলারোহী ব্যক্তি পাদচারী ব্যক্তির চেয়ে চারগুণ বেশি জোরে যায়, তার চেয়ে পনেরোগুণ বেগে যায় মোটরারোহী। আর বিমানারোহীর তো কথাই নেই-- ভীত বিহঙ্গকুল ত্রস্তভাবে তার বেগগামী বিমানের পাশ কাটিয়ে উড়ে পালায় –মানুষের নতুন পাখার কাছে হার স্বীকার করে।

আমাদের কারখানায় একজন পাকা কারিগর ৮ ঘণ্টায় এক জোড়া জুতো তৈরি করার মজুরি পায়—মহাযুদ্ধের পূর্বে এই কাজে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগত। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা শ্রেষ্ঠ আমেরিকান জুতোর কারখানার সমান কাজ করতে পারি। আমেরিকান মোটর কারখানার একজন মজুর ৫০/৬০ দিনে যা আয় করে, আমাদের দেশে আলস্যের দরুন মজুরেরা ৬০০ দিন কাজ করেও সে আয় করতে পারে না। প্রত্যেকের কর্তব্য শক্তিমান হওয়া, ধনী হওয়া। এখন থেকেই উপার্জন করতে শেখো। যথেষ্ট আয় কর, বুঝে ব্যয় কর এবং সঞ্চয় কর। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালী যারা পরীক্ষা করে কখনো দেখেনি—তাদেব কোন অধিকার নেই অসাফল্য ঘোষণা করবার।

উপার্জনকারী ছাত্র আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ক। আমরা তার আয় থেকে দাম কেটে নিয়ে তাকে জুতো ও পোষাক সরবরাহ করবো। তাদের মা তাদের পোষাক কিনবেন, এটা ভাল দেখায় না। আমি কলেজের ডিগ্রিধারী এমন অনেক লোকের কথা জানি, যারা সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের পোষাকের খরচ কত বা গত বৎসর কত তাদের খরচ হয়েচে—এ বিষয়ে কোন খবর রাখে না তারা।

ছ' বছরের একটি শিশুকেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শিক্ষা দাও। পিতামাতা যা তাকে দেবেন, সেটা উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ করতে শেখাও। তার আসল হবে, যা সে জনসেবা দ্বারা লাভ করে।

শিক্ষানবিশির সময় প্রত্যেক মিস্ত্রি ছোটখাট কোন কাজ করে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবে। এই কাজ থেকে তার যে আয় দাঁড়াবে, এইটি যেন তার ব্যক্তিগত বাজেটে প্রধান আয় হয়। তার নিজেব কার্যের ছোটখাট সমস্যাগুলির সমাধান তাকে নিজেই করতে হবে। এই সমস্যাই হ'ক তার শিক্ষক। কারখানায় যদি ক্রেন্ বা অন্য কোন যন্ত্র না থাকে--তবে তার কেতাবী বিদ্যা এ বিষয়ে তাকে কোন সাহায্য করবে না। সুতরাং তাকে আবিষ্কারক হতে হবে। তবেই তার প্রকৃত সাফল্য। স্কুলে এ কাজ শেখা যায় না- তরুণ বয়স থেকে হাতে-কলমে কাজ না করলে আবিষ্কারের ক্ষমতা জন্মায় না। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হ'লে বহু কৌশল জানা দরকার। এই কাজে যে আয় হবে--আমাদের বর্তমান সাচ্ছল্য ও ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য তার ওপর নির্ভর করবে মনে রেখো। ব্যবহারিক জ্ঞান সমাজে নতুন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। এই স্কুলের যে ছাত্র বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার এক বৎসরের মধ্যে কোন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার না করবে—অন্তত জনসেবা দ্বারা অর্থ উপার্জনের কোন পন্থা খুঁজে না পাবে—বুঝতে হবে এই কার্যে তার কোন বিশেষ যোগ্যতা নেই।

নিজেকে আগে বদলাও

তোমরা জনগণের নেতা ও পরিচালক হতে চলেচ—আগে নিজের জীবন এমনভাবে তৈরি কর, যাতে তোমরা বৃহত্তর শারীরিক ও মানসিক কর্মের উপযুক্ত হতে পার। আমাদের পাকযন্ত্রকে প্রথমে ঠিক করে নেওয়া দরকার। সকালে পাকস্থলীকে পূর্ণ করবার পূর্বে আগে তাকে খালি করা দরকার। আমাদের চেক্ প্রাতরাশ, কফি ও রুটি, সকালের কাজে আমাদের উপযুক্ত শক্তি যোগায় না। কারণ ও খেয়ে পেট ভরে না। বিকালের দিকে গুরুভোজনের ফলে কাজ করা যায় না। মস্তিষ্কের ব্যবহার যারা বেশি করে, তাদের পক্ষে দুগ্ধ, ফলমূল, শাকসব্জি, পুডিং, অল্পসল্প মাংস—এই খাওয়া উচিত। শারীরিক পরিশ্রম যারা বেশি করে, তাদের বেশি পরিমাণে মাংস খাওয়া মন্দ নয়।

যে কাজ করতে আমাদের যত বেশি কষ্ট, সেই কষ্ট আমাদের আগে করতে হবে। যে সময় সে কাজ করবে, সমস্ত মনপ্রাণ তাতেই ঢেলে দেবে, অন্যদিকে মন না যায়, কাজ সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত।

কাজের উপযুক্ত তোড়জোড় আগে ঠিক করে রাখবে। ঘড়ির চেনে এই দেখ পেন্সিল বাঁধা, এটা ধরতে অনেক সুবিধা। খোলা কাগজের পকেট-বই সঙ্গে থাকলে আরও ভাল। এই দুটি বন্ধু সঙ্গে থাকলে, কোন চিন্তা বৃথা যাবে না। যখন যেটি মনে হবে, পকেট-বইয়ে টুকে রাখ। প্রথম মোটরগাড়ি আমি এদের সাহায্যেই কিনতে সমর্থ হই। বন্ধুবান্ধবদের দেখে শিখলাম-মোটরগাড়ি কাজের চেয়ে আমোদের জন্যে বেশি ব্যবহার হয়। ১৪ দিন গাড়ি গ্যারাজে বন্ধ করে রেখে সংযম অভ্যাস করলাম।

ব্যবসায়ক্ষেত্রকে সারা পৃথিবীতে প্রসারিত কর। মনে রেখ, পৃথিবী তোমার জন্যে সৃষ্টি হয়েচে, তুমি পৃথিবীর জনগণের সেবা করবার জন্যে তৈরি হয়েচ। ভাল জিনিস তৈরি করবার চেষ্টা কর। "ভাল ইঁদুর কল তৈরি কর, পৃথিবীর লোক ভেঙে পড়বে তোমার দোরে।" এমার্সনের এ বাণীর সত্যতা আমি অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করেচি।

অনেকে ভাবতে পারেন বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের স্বপ্ন তাদের কোন দিন সার্থক হবে না। ম্যাসাচুসেট্স্ অঞ্চলের লিন্ সহরের আমার এক বন্ধু মিঃ ইয়ং এর কথা বলি। ২৫ বছর আগে আমি তাদের এক মূল্যতালিকা পাই, গোড়ালি সেলাইয়ের যন্ত্রের। আমি তখন সামান্য মুচি মাত্র, তবুও সে যন্ত্রের অর্ডার দিই। ভ্রমণের সময় সর্বত্র সে নাম শুনেচি-দুনিয়ার সর্বত্র তারা মাল বিক্রী করে। আমেরিকায় গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলাম। ছোট্ট কারখানা, পিতাপুত্রে জামার আস্তিন গুটিয়ে খাটচে। দুনিয়াময় বিজ্ঞাপন ছড়ায়। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, কারখানায় তারা দু'জন ছাড়া আর কোন মজুর নেই। যে ছোট্ট ঘরে তারা কাজ করে—তাই তাদের একমাত্র কারখানা। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের ব্যবসায় সম্বন্ধ গড়ে উঠেচে শুধু প্রেসের মধ্যে দিয়ে।

খবরের কাগজ কত বড় যন্ত্র, এমন কি আলুর চাষ যারা করে, তাদের পক্ষেও কোদালের চেয়ে খবরের কাগজ যে অধিকতর উপকারী যন্ত্র, একথা লোকে ভুলে যায়। আমাদের ক্ষেতে ভাল আলু ফলে, সে সংবাদ খবরের কাগজ পৃথিবীময় রটিয়ে দেবে।

ডাচ্ কৃষক এক বুশেল জমি থেকে ২০,০০০ ক্রাউনের মাল পায়। খবরের কাগজের সাহায্য নেয় বলেই তার এত আয়। পুরানো ধরণের কৃষক বিজ্ঞাপন ব্যয় করতো না, বুশেল পিছু তার আয়ও ছিল যৎসামান্য।

শ্রেষ্ঠ কর্মীদের নিকট কাজ শেখ

যারা কাজ খুব ভালভাবে সম্পাদন করে, তারা যদি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও বাস করে, আমাদের দলে তাদের টেনে নেব। শ্রেষ্ঠ কর্মীদের কাছে কাজ শেখা ভাল—উচ্চ শুল্কের বাধা সৃষ্টি করে তাদের ঠেকিয়ে রাখা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। বিনা শুল্কে আমাদের দেশে বিদেশী জুতো বিক্রয়ার্থ আসে, আমি এর পক্ষপাতী। মোটরগাড়িও আমদানী হ'ক বিনা শুল্কে। যে কারখানার মালিক এতে বাধা দেয়, সে জনগণের ক্ষতিসাধন করে।

আমি যদি মোটরগাড়ি তৈরি করতাম, তবে আমি একধরণের গাড়িই তৈরি করতাম। তবে যা করতাম, খুব ভাল করে তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করতাম। যদি পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পারতাম, তবে গাড়ির একটা অংশ ভাল করে তৈরি করতাম। পৃথিবী আমার দোরগোড়ায়

আসত এগিয়ে আমার জিনিস কিনতে। আমাদের দেশের প্রত্যেকেই মোটর কিনবার অধিকারী— শুধু বাটা বা স্কোডা কারখানার মালিকের যে সে অধিকার আছে—তা নয়। অনেক দেশেই রাজনীতিজ্ঞ ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ রক্ষণশীল শুল্কের পক্ষপাতী—তাঁদের বিশ্বাস এ ভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়।

মানুষ নিজের অবস্থায় কোন দিন সন্তুষ্ট নয়। সবাই ঐশ্বর্যের জন্যে অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্যে সংগ্রাম করে, কিন্তু সে সাফল্য অর্জন করে ক'জন? ভগবান সকলকে ধনদান করেন না। তাই পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা বিদ্যমান। দ্বেষ হিংসাকেও সৎ কাজে লাগানো যায়—এদের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। পাখীকে উড়তে দেখে হিংসা করেছিল বলেই মানুষ আজ এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছে।

ব্যবসায়ে সেবাধর্ম

হে তরুণ দল, যখন তোমরা ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধনৈশ্বর্য অর্জন করবে, খৃষ্টের সেই অমর বাণী স্মরণ কর, "যদি শক্তিমান হতে চাও, প্রথমে নিজের সেবা করতে শেখ।" মনে রেখ তোমার শক্তি, তোমার কর্মশক্তি জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করাতেই তোমার সার্থকতা। তোমার সম্পত্তি, তোমার অর্থ তোমার নিজের যেমন দরকার, তোমার সহকর্মীর পক্ষেও তার সমানই প্রয়োজন।

দেশের আইন তোমাকে তোমার অর্জিত সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। তোমার নামেই সে সম্পত্তি লেখা আছে গবর্ণমেণ্টের দলিলে। কিন্তু সে সম্পত্তি তুমি এমনভাবে ব্যবহার করবে, যেন তা দেশের হাজার হাজার লোকের কাজে লাগে। তোমার একার ভোগে সে ঐশ্বর্য লাগাবার কোন অধিকার তোমার নেই মনে রেখ।

সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করতে শেখো। একটি পয়সা যদি অযথা ব্যয় কর, তবে অপরকে তুমি ঠকাচ্ছ, মনে থাকে যেন। সেই পয়সার সাহায্যে অপরের উপার্জন বৃদ্ধি করতে সাহায্য কর। তাদের কাজ থেকে পরিশ্রমের অংশ দূর কর। যন্ত্রকে পরিশ্রমের কাজে ব্যবহার কর—কারখানায় এবং কৃষিকার্যে। মানুষের শক্তিকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে নিযুক্ত করবার জন্যে তাকে পৃথক করে রেখে দাও—তার ভার কমিয়ে দাও।

তোমার শ্রমের ও কর্মের সিংহাসন থেকে তোমাকে কেউ টলাতে পারে না—যদি তুমি জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।

আত্মসংযমই শান্তি ও স্বাস্থ্যের পথ

(১৯৩০ সালে টমাস বাটা কর্তৃক প্রদত্ত বেতার বক্তৃতা।)

মানবজাতির অবাধ প্রগতিতে আমি বিশ্বাসবান। মানুষের বর্তমান যুগের যে আবিষ্কার, তা শিশুর খেলনা মাত্র—ভবিষ্যৎ বিরাটত্বের ইঙ্গিত আনয়ন করার মধ্যেই তাদের সার্থকতা। কর্ম দ্বারা মানুষের শক্তি বৃহত্তর হয়, সাহস ও বুদ্ধি বর্ধিত হয়, জীবনে আনন্দ ও সাফল্য আনয়ন করে।

আজ আপনারা এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বেতার যন্ত্রের সাহায্যে নিজের বাড়ি বসে আমার কথা শুনচেন। এর ফলে তার পারিবারিক জীবন পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে। সরাইখানার সমাজ থেকে তার উপকার হ'তে পারে—কিন্তু তার স্ত্রীপুত্রের কোন সুবিধা নেই।

আজ জগতের যে সমস্ত জাতি অভাব অভিযোগের উর্ধে বাস করে, যাদের জীবন সব দিক

থেকে সমৃদ্ধ, নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা জগতের মহদুপকার সাধন করেছে, শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে সে সব জাতি। দারিদ্র্য ও অভাবের দ্বারা তাদের জীবন উৎপীড়িত নয়।

অনেক লোক যান্ত্রিক উন্নতির যুগকে ভয়ের চোখে দেখে—মানুষ যন্ত্রের ক্রীতদাস হয়ে পড়বে, এই তাদের ধারণা। যখন আমাদের দেশে প্রত্যেক লোক একখানি মোটরগাড়ি ও দশটি ঘোড়া রাখতে পারবে, আমাদের সাধারণতন্ত্র শক্তি ও প্রগতির পথে অনেকখানি এগিয়ে যাবে। আমি অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি—আমার অভিজ্ঞতা এই, জীবনে তারাই উন্নতি করে যাদের আত্মসংযম আছে। যার মধ্যে সংযম নেই, সে ব্যক্তি দু'দিনের জন্যে শক্তির অধিকারী হতে পারে বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক, তাতে সে নিজে অসুখীই হয়। তখন সে কোন সংযমী ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে নিজেকে রাখে তাতে তার ও জনসাধারণের মঙ্গল -ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে সর্বত্রই এই সত্য প্রযোজ্য—সংযম ও শৃঙ্খলা, জীবন ও প্রগতির পথ বাধামুক্ত করে। অন্যথা মৃত্যু ও ধ্বংস।

সংযমশিক্ষা বই থেকে হয় না, জীবনই তার শিক্ষাক্ষেত্র। প্রত্যেক দিনই বিদ্যালয়। আত্মসংযম আমাদের দৈনিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের আহার-বিহার অভ্যাস ইত্যাদি সংযত করে। কর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কর্মের সম্পাদনে একাগ্রতা আনয়ন করে। আমাদের শিক্ষা ও আমোদ প্রমোদ সংযম দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ হয় এমন বই পড়া দরকার, যাতে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়, মনকে কঠিন কর্মলিপ্ত করে। যে উপন্যাস ব্যর্থ জীবনের পরিচয় ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে, তা যত সুনিপুণ ভাবেই লিখিত হ'ক, জয়ের পথে চালিত করতে পারবে না আমাদের। যে গল্পে জীবনের আনন্দ ও দুঃসাহসের বর্ণনা আছে তাই যেন আমরা পাঠ করি।

নিজের চিন্তাপ্রণালীর ওপর কর্তৃত্ব করে এই সব লোকই বড় বড় যন্ত্র নিপুণতার সহিত পরিচালনা করতে সমর্থ। এতে আমাদের শক্তি বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও জাতির শক্তিও বর্ধিত হয়।

নাগরিক

আমার ও জনসাধারণের সম্পত্তি পবিত্র।

নাগরিকের কর্তব্য শাসন করা—তিরস্কার করা নয়।

"আমি যেমন চাই আমার কারখানার প্রত্যেক মজুর তার নিজের মালিক হবে, তেমনই আমি চাই প্রত্যেক নাগরিক তার নিজের মেয়র হবে।"

বাটা তাঁর নিজের সহর, বিভাগ, স্টেট এবং তাঁর সহরবাসী বন্ধু সম্বন্ধে পুরোনো যুগের রোমানদের মত ব্যবহার করতেন। সহরের রাস্তা সোজা ও ভাল হওয়া চাই, বিদ্যালয়, ড্রেন, হাঁসপাতাল, শাসনপ্রণালী সব বিষয়ে উন্নতি চাই। পুরানো ধরণের রাজনীতি তিনি বুঝতেন না। তাঁর রাজনীতির মূলে উদ্দেশ্য ছিল জনসেবা।

"প্রত্যেক লোক নিজের ধরণে সুখী হ'ক—বাটা যখন একথা লিখেছিলেন, তিনি জানতেন না

একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি অবিকল এই উক্তিই করে গিয়েছেন—১৫ বৎসর পূর্বে সেই রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি পরলোকগমন করেন। রাজনৈতিক বক্তার ওপর তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না—কথার মোহে লোক ভুলানোর পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। যে যত বড় বক্তা, তাব ওপর তাঁর তত অবিশ্বাস ছিল। জীবনের বড় বড় ব্যাখ্যার বাগ্মিতা প্রদর্শনকে তিনি ঘৃণা করতেন। একজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে যাবে, আর একজন শুধু শুনে যাবে—এ ব্যাপার ঠিক নয়। ভাবের ও চিন্তার বিনিময় এবং কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসাব খতানো দরকার।

রাজনীতি প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে চলবে, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। ফাউস্তের মত ছিল তাঁরও মত, "এই পৃথিবী আমার সকল সুখ ও আনন্দের আকর। এই সূর্য আমার মনের সুখ-দুঃখের সাক্ষী।" রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা যেন এই নীতি প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষা দেয়, প্রত্যেকে নিজের পায়ে দাঁড়াও, আয় অনুসারে ব্যয় কর, সবাই মিলে বৃহত্তর জনসেবাব কার্যে যোগ দাও।

বাটা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক গ্রাম, সহর, জেলা ও রাজ্য নিজের শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করবার অধিকারী। স্টেটের সাহায্যেব ওপর নির্ভর করে চলা তিনি পছন্দ করতেন না। নিজের গ্রামের সাহায্যভিক্ষার জন্যে টুপি হাতে এক আপিস থেকে অন্য আপিসে ছুটোছুটি করবে লোকে—এর অন্তর্নিহিত অপমানের দিক তিনি যেমন বুঝতেন এরকম কেউ বুঝতো না। গ্রাম্য বাজেটে মিথ্যা হিসাবের সৃষ্টি করে স্টেট্ থেকে সাহায্য প্রার্থনাব মূলে মানবাত্মাব দৈন্য ও অপমান বর্তমান। এতে নাগরিকের চরিত্র দিন দিন অবনত হয়ে যায়। শক্তিমান নাগবিক ভিন্ন কোন্ রাজ্য উন্নত হতে পারে?

বিভিন্ন স্টেট্ ও প্রাদেশিক দল স্থানীয় নির্বাচনেব জন্য প্রতিযোগিতা কবে। বাটা চাইতেন প্রত্যেক গ্রাম, জেলা ও প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। তিনি তাঁব জন্মভূমি জিলন্‌কে আদর্শ সহরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। পরে নিজের শক্তিতে তাঁব দরিদ্র জেলা উন্নত হয়ে দেশেব আদর্শস্থানীয় হবে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বাটা তাঁর জিলন্ সহরেব জন্যে স্বায়ত্তশাসনেব অধিকার প্রার্থনা কবলেন এবং এত শীঘ্র সে ব্যাপাব বাস্তবে পরিণত করেছিলেন যাতে তাঁব আন্তরিকতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হ'ল।

জিলন্ সহরে ১৯২৩ সালের নির্বাচন

টমাস বাটা উপলব্ধি কবেছিলেন নিজেব সহবেব সমগ্র অধিবাসীর বিশ্বাস অর্জন করতে পাবার মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক সাফল্য বর্তমান। সহরের পূর্বতন শাসকবর্গের সঙ্গে অনবরত দ্বন্দ্বের ফলে তিনি নিজেব লোক শাসন পরিষদে ঢোকাবাব চেষ্টা করলেন। জিলন্ সহবের রাস্তাগুলি ছিল অত্যন্ত খারাপ ও কর্দমে পরিপূর্ণ, অথচ শাসন পরিষদেব আপিস ৬০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ হ'ত সহরে, বাটা প্রস্তাব করলেন তার বসানো বিনামূল্যে করা হ'ক, ইউনিট পিছু বিদ্যুৎ খরচের দাম কমানো হ'ক। শাসন পরিষদ সহরে সরাইখানা খুলতে চাইলেন, বাটা চাইলেন লাইব্রেরী খুলতে। তিনি সমগ্র অধিবাসীবর্গের কাছে তাঁর সব ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাদেরই বিচার করতে বললেন, ভবিষ্যতে তাদের সহরকে যে ভাবে ইচ্ছা পরিবর্তিত করে করুক। অবশেষে নগরের নির্বাচনদ্বন্দ্বে বাটার দল জয়লাভ করে নগরের শাসনকর্তৃত্ব নিজেরা গ্রহণ করে জিলন্ সহরের চেহারা বদলে দিলেন। এ উপলক্ষে বাটার বক্তৃতা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল:—

আমাদের কারখানা এবং জিলন্ সহর

গতবার আমাদের কাজ খুব ভালই হয়েছিল। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হিসেব যে নিখুঁত, তার প্রমাণ এ থেকে পাওয়া গেল। গত বৎসর আমাদের মজুরদের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েচে—তার মাপ ১০০ থেকে ১৫৮ পয়েন্ট্। আমাদের জিনিসের মূল্য ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ পয়েন্টে দাঁড় করিয়েচি, দেশের অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও ২০০ পয়েন্ট থেকে ১৩০ পয়েন্ট হয়েচে। এ দ্বারা বোঝা গেল, দেশের উন্নতি ও সাধারণের সুখ সুবিধার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেচি এবং কৃতকার্য হতে পেরেচি।

মাল তৈরির খরচ আমরা কমাতে পেরেচি বলেই সস্তায় মাল দিতে পারি। এর জন্যে আমাদের মজুরদের যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশক্তি প্রদর্শন করতে হয়েচে- এর জন্যে প্রশংসা তাদেরই প্রাপ্য। তবুও এখনও কিছু হয় নি—বড় বড় আমেরিকান কারখানার সঙ্গে তুলনা করে যখন দেখি তখন নিজেদের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করে লজ্জিত হই। জনসেবার দিক থেকে তারা অনেক বেশি উন্নত।

অতএব আমাদের দেশ থেকে অধ্যবসায়ী তরুণের দল দলে দলে আমেরিকায় ছুটে যাবে, এটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়। আমেরিকার কারখানায় মজুরেরা যে সুখ সুবিধা ভোগ করে, তাতে ভাগ বসাতে যাওয়ার লোভেই তাদের সপ্তসাগর পার করে দূর বিদেশে নিয়ে চলে।

অনেকে বলেন আমাদের দেশে কয়লা নেই পেট্রোল নেই দেশের কাছে সমুদ্র নেই কি করে আমাদের উন্নতি সম্ভব? এর উত্তরে আমি বলবো আমেরিকার চেয়েও প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী এমন বহু দেশ আছে তাদের দেশের লোক দারিদ্র্য ও অনাহারে কষ্ট পায় কেন? অধিবাসীদের মূর্খতা ও আলস্যতার কারণ।

আমি দেখাতে চাই আমাদের দেশেও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। এর জন্যে দরকার আমাদের শ্রমিকদের উৎসাহ ও মতামত। জিলন্ সহরের কতকগুলি অসুবিধা আছে এখানে জল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা নেই। বড় রেল লাইন থেকে এ সহর অনেক দূরে। বড় ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল স্কুল গ্যাসের কারখানা কিছুই নেই এখানে।

এ সবের জন্য সহরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে একযোগে কাজ করা দরকার। কিন্তু এই কাউন্সিলের সঙ্গে একত্র কাজ করা প্রায় অসম্ভব। এরা কিছু বোঝে না বা বুঝতে চায় না - জনসেবার দিকে এদের লক্ষ্য নেই। আমাদের নিজের লোক যতদিন কাউন্সিলে নির্বাচিত না হবে, ততদিন সহরের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হবে না।

১৯১৯ সালের নির্বাচনে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েচে। আইন অনুসারে ময়দা চিনি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সেই সব গুদামে দেওয়া হ'ত, যাদের পরিচালন ভার নিজের দলভুক্ত ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত। আমার কোন হাত ছিল না এসব বিষয়ে, সুতরাং ঐ সব ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না—নতুবা আমাদের শ্রমিকেরা খাদ্যদ্রব্য পায় না।

১২নং পার্টি আমাদের কারখানার বিরুদ্ধে বহু কুৎসা প্রচার করতে লাগল। তারা আমাদের গুদামের ম্যানেজারকে কর্মচ্যুত করতে বললে, কারণ সে ব্যক্তি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক। শত্রুপক্ষ প্রচার করে বেড়ালে—বিদেশ থেকে আমরা ত্রিশ গাড়ি খাদ্য আমদানী করেচি। লোকে এসব বিশ্বাস করলে। ফলে নির্বাচনে ১২নং পার্টি বিজয়ী হ'ল। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই হ'ল যে আমাদের

মজুরদের সাহায্যে তারা আমাদের হারিয়ে দিলে। কারণ এই দলের মূলমন্ত্র ছিল, "বাটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।"

তারপর তারা দেখলে বাটার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই নির্বাচনে জয়লাভ সহজ ও সুনাম। আমাদের কারখানা ও ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তারা শত রকমের অপপ্রচার আরম্ভ করে দিলে।

আমি তোমাদের কাছে কি চাই? এই রাজনৈতিক দলকে অপসারিত করে তোমরা নিজেদের লোক পাঠাও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে। আমাদের সহরের পক্ষে এই সব শঠতা ও দলাদলি অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সহর কোন আইন করচে না, শুধু ন্যায্য ও অন্যান্য ভাবে টাকা খরচ করে চলেচে। গত চার বৎসর আমাদের সহরে টাকা খরচ হয়েচে এই ভাবে, "যতই খরচ হ'ক, বাটা দেবে।"

কিন্তু আমি যা দিই, আমার শ্রমিকেরা তা আসলে দেয় অন্য ভাবে; টাকাটা তাদের পকেট থেকেই খরচ হয়। আমি অর্থ চাই না, সম্পত্তি বাড়াতে চাই না—যা আমার আছে, তারই পরিচালন-ভার গ্রহণ করেই আমি সন্তুষ্ট। আমার ও আমার পরিবারের জন্য যা খরচ হয়, তা একজন শ্রমিকের চেয়ে বেশি নয়। জনসেবায় আমি আমার সম্পত্তি ব্যয় করতে চাই।

বাটার টাকা হ'ক, তাও ন্যায্যভাবে ব্যয় করার দিকে আপনাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। ৬০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে টাউন হল তৈরি করতে কে চান আপনাদের মধ্যে? অনেক সামান্য খরচে টাউন হল নির্মাণ করলেই কাজ চলে যেতে পারে। বাকি টাকা অধিকতর হিতকর কার্যে ব্যয়িত হ'ক, আমার এই ইচ্ছা। কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে স্টেশনের রাস্তা মেরামত করে নিলে চার বৎসর ভালভাবে চলে যাবে। স্কুল, হাসপাতাল আরও অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠান ঐ টাকায় নির্মিত হতে পারে।

ভোটের তালিকায় ঠিকমত লোকের নাম দাও!

পরাজয়ের ভয় কোরো না!

জিলনের প্রত্যেক লোক জানে ব্যবসায় তাঁদের কি উপকার করচে এবং সহরের অধিবাসিগণের অর্থ ন্যায্যভাবে খরচ করার অর্থ কি। যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঝগড়া-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে, যদি আমরা মিতব্যয়ী হতে পারি, তবে আমাদের সহরে এমন শান্তি ও শৃঙ্খলা আসবে, যা আমাদের সমগ্র স্টেটের আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

বন্ধুগণ!

টমাস বাটার শত্রুদল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত অপপ্রচার করতে কুণ্ঠিত হয় নি। যে টাউন-হল বাটার শ্রমলব্ধ অর্থে নির্মিত, তার প্রাচীরগাত্রে তারা প্রচারপত্র টাঙিয়ে দিলে। তাতে লেখা ছিল, যুদ্ধের সময় বাটা তাঁর কারখানাকে শ্রমিকদের কারাগারে পরিণত করেছিলেন। বাটার হাতে এই কাগজ পড়তে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে কাগজখানার ওপরে কলমের বাঁট দিয়ে লিখলেন—"মিথ্যা কথা! ধিক্!" তখনি তিনি সহরের খোলা ময়দানে নাগরিকদের এক সভা আহ্বান করে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন।

তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি আমার কারখানার শ্রমিক, আমার আহ্বানে তোমরা সত্য প্রচার করবার জন্যে সমবেত হয়েচ। গত যুদ্ধে যে সব শ্রমিক আমাদের নিকট উপকৃত, তারা একদিন বলেছিল, 'আপনাকে আমাদের প্রণতি জানাই।'

আজ আমি তোমাদের কাছে প্রণতি জানিয়ে বলতে চাই, আমি জনসাধারণের ভৃত্য, তোমাদের সকলের ভৃত্য।

তোমাদের আজ ডেকেছি আমার কৈফিয়ৎ শোনাতে—কেন আমি কলমের বাঁট দিয়ে কাগজে লিখেছিলাম, "মিথ্যা কথা! ধিক্!" আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আমাকেই রোধ করতে হবে, নতুবা উত্তর-পুরুষদের প্রতি আমরা অবিচার করব।

তারা প্রচার করেছে, যুদ্ধের সময় আমার কারখানায় তোমরা বন্দী ছিলে। বন্দীশালা বলতে বোধহয় বোঝাচ্ছে আমাদের কারখানার সিঁড়ির নীচেকার ছোট্ট ঘরটি যে রকম ঘর প্রত্যেক বাড়িতে থাকে, আলু রাখবার জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

তারা একথা বলে নি যে সেই ছোট ঘরের নিকটবর্তী স্থানে কারখানার ১৫০০ মজুর মাথাপিছু দু' পয়সা মাত্র ব্যয়ে প্রতিদিন জলযোগ করতো তারা একথাও বলে নি যে যুদ্ধের সময় খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে আমরা সহরের দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসীকে খেতে দিয়েছি।

আমি তোমাদের আহ্বান করেছি আমার স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করতে। তোমরা এত অধিক সংখ্যায় সভায় যোগ দিয়েছ দেখে আমি আনন্দিত। আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অটুট আছে দেখে আমি তোমাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

মানুষের সম্মান তার রাজনৈতিক পদমর্যাদা বা ব্যবসায়ের ওপর নির্ভর করে না। আমরা সম্মিলিতভাবে মিউনিসিপ্যাল বইয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ ঘোষণা করি আমরা জানাই যে এটি বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার মাত্র।

'সহরের প্রতিনিধিগণ ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থির করেছেন মিউনিসিপ্যাল স্মৃতি পুস্তক জিলন্ সহরের টাউন হলের প্রাচীর গাত্রে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের অনুমোদন তাঁরা এক ভোট দ্বারা বিপক্ষ দলকে পরাজিত করেছেন।"

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সহরের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাবের বিরোধী। যুদ্ধকালীন দৃষ্টিভঙ্গি বড় একপেশে, তা দিয়ে বিচার করা চলে না। আমরা আজ এখানে সম্মিলিত হয়েছি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করবার জন্যে—এই সব মিথ্যা প্রচার ও মানহানিমূলক কাগজ দেওয়ালে টাঙানো আমরা হীনকার্য বলে মনে করি। মিউনিসিপ্যাল খাতায় সত্য কথা লেখা হ'ক এই আমাদের প্রস্তাব। লেখার পরে অধিবাসীদের প্রত্যেককে খাতা দেখানো হ'ক, যদি দেওয়ালে সেটা টাঙাতে হয় তারপর টাঙানো যাবে।

তোমরা এই প্রতিবাদে সম্মতি জ্ঞাপন কর কি?

উচ্চৈঃস্বরে—হাঁ।

তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাস্থ সব ব্যক্তিকে শান্তভাবে সভাস্থল ত্যাগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের কর্মতালিকা

[টমাস বাটার এই ইস্তাহার তাঁহার স্বাক্ষরিত। তাঁর অঙ্গীকৃত কর্মগুলির সব ক'টিই তিনি সম্পাদন করেছিলেন, বরং তার অতিরিক্তও করেছিলেন]

আমি আজ আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি কেন? কারণ এই নগরে আপনাদের মধ্যে আমার জন্ম—অন্য কোন লোককে আমি চিনি না, জানি না—যাঁরা এই বিপদে আমার সাহায্য করতে পারেন।

আইন অনুসারে সহরের মেয়র নির্বাচন গৌণভাবে নিষ্পন্ন হয়। টাউন বোর্ডের সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে মেয়র নির্বাচন করেন। আমি মেয়র হতে চাই—নয়তো আমি টাউন বোর্ডেই থাকতে চাই না। যদি নগরের অধিবাসিগণ আমাকে বিশ্বাস করেন, তখন আমি জেলা বোর্ডের মেম্বরদের বিষয় চিন্তা করবো, যাঁরা আমায় পরামর্শ দিয়ে বা আমার কার্যের ওপর নজর রেখে আমায় সাহায্য করতে পারেন। আমার এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কালীন যে সব ঘটনা ঘটবে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

আমি অনর্থক বিবাদ করতে চাই না। যদি আপনারা মনে করেন এ কার্যে আমার যোগ্যতা নেই, আমার মেয়র হবার মত কর্মশক্তির অভাব—আমায় আপনারা নির্বাচিত করবেন না। আমি আমার কারখানা ও শ্রমিকদের উন্নতি করেই সন্তুষ্ট থাকব।

যাঁরা আমায় অবিশ্বাস করেন, তাঁদের জন্য আমি এই স্বাক্ষরিত ইস্তাহার বার করলাম। আমি প্রথমে টাকার সুদ বাঁচাতে চাই। আমরা বর্তমানে ৩৫০½ হাজার ক্রাউন সুদ ব্যয় করি। সহরের ট্যাক্স থেকে যা আয় হয়, তাতে এই সুদ শোধ হয় না। আমার বাজারে যে ক্রেডিট্ ও জনপ্রিয়তা আছে তার বলে অল্প দিনের জন্যে চার পার্সেণ্ট্ সুদে আমি টাকা ধার করতে পারি। এক পার্সেণ্ট্ সুদ বাঁচানোর অর্থ বাৎসরিক ৭০,০০০ ক্রাউন বাঁচানো। মিউনিসিপ্যালিটির অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৯২২ সালের হিসাবে ১২,৭৩২ ক্রাউন। চার পার্সেণ্ট্ সুদে এই সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে আমরা টাকা ধার নিতে পারি। কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও আর এক সম্পত্তি হ'ল নাগরিকগণের ব্যয়ের ক্ষমতা। এই ক্রেডিটের যোগ্যতা আমি মনে মনে হিসেব করেছি ৮০ পার্সেণ্ট্। আমি এই ঋণের জন্য গ্যারান্টি দাঁড়াতে পারি, যদি সহরের কর্তৃত্বভার আপনারা আমার ওপর ন্যস্ত করেন।

আমরা আমাদের খরচে সমস্ত সহরে ও নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবো—অন্য ইলেকট্রিক কোম্পানী ২,৭০০,০০০ ক্রাউনের কম যা করবে না আমরা সেটি বিনামূল্যে করে দিতে রাজি। অন্য অন্য ইলেকট্রিক কোম্পানীর চেয়ে আমরা পারিবারিক ব্যবহারে ২০ পার্সেণ্ট্ ও কলকারখানার ব্যবহারে ৩০ পার্সেণ্ট্ দাম কমিয়ে দেব। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আপিস যত শীঘ্র হয় তৈরি করা হবে এবং ভাল রাস্তাঘাটের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করবো। আমার কারখানার জন্যে যে সব শ্রমিকের বাসগৃহ তৈরি হবে, তার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে আমি কিছুই নেব না। আমাদের ফার্মের খরচে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হবে। আমাদের ফার্মে সহরে মাল সরবরাহ করবার জন্য যে বিল দেবে, আমরা নিজের খরচে সেটি প্রকাশ করবো, যাতে সকলেই তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

১৯২৩ সালের জিলন্ মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের ফলাফলঃ—

	ভোট	পদ
বাটার দলের লোক	১৩২২	১৭
সোস্যালিস্ট	২১৬	৩
ক্যাথলিক	১৮৮	৩
কমিউনিস্ট	৪৫৪	৬
ব্যবসায়ী দল	১৫৭	১

বন্ধুগণ

(নির্বাচনের পরে বাটার ইস্তাহার)

আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই, আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাসই আমাকে আপনাদের সেবায় অনুপ্রাণিত করেছে। অদ্যকার ভোটের সময় আপনারা বলেছেন, 'কাজ কর'। আমি সেই কাজ করবো।

আমাদের মত সহর আর দ্বিতীয় নেই, সাধুতা ও শ্রমের পুরস্কার এখানে ভালভাবেই দেওয়া হয়। অলস লোককে আমরা ঘৃণা করি—তাদের একপয়সাও দিই না।

বৃহত্তর জিলন্

(১৯২৩ সালে নির্বাচনের পর সহকর্মীদের প্রতি বাটার বক্তৃতা)

আমার কারখানার লোক দু'বার জয়লাভ করেছে। বাইরের লোককে তোমরা দেখিয়েছ তোমাদের মধ্যে একতা আছে। ইলেক্সনের পূর্বে অনেকে আমায় বলেছিল আমার শ্রমিকগণ আমায় হতাশ করবে। আমি তোমাদের বুঝি নে তোমরাও আমাকে বোঝো না। কিন্তু এখন সে সব কথার অসারত্ব প্রমাণ হয়ে গেল। কথা আমাদের শেষ হ'ক, কর্মের আরম্ভ হ'ক। যখন নির্বাচনের সময় আমার কর্মতালিকা এমন বিশেষ কিছু ছিল না, যা ছিল তা নিতান্ত সামান্য। কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাই দেখে বলেছিলেন, আমি যা কাগজে লিখেচি, তা যদি কাজে করি তবে তিনিও আমাকে ভোট দেবেন।

বৃহত্তর জিলন্ গড়ে উঠবার জন্যে মহত্তর মানুষের প্রয়োজন। ছোট লোক আর বড় লোকের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? ক্ষুদ্র ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যে খাটে, নিজের পেটের চিন্তায় আকুল।

যে শুধু নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করে সে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি। যে নিজের দেশ, আশপাশের সব দেশ এমন কি সারা দুনিয়ার জন্য খাটে সেই হ'ল প্রকৃত বড় লোক। বৃহত্তর জিলনের অধিবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক এই আমরা চাই। তাদের খাবার অভাব ঘটবে না, কারণ চাকরি সব সময়েই এখানে মিলবে। ভাল পোষাক পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ির কিন্তু নিতান্ত অভাব আমাদের এখানে। আমাদের বাড়ির মেয়েরা ক্ষুদ্র বাসগৃহে সারাদিন আবদ্ধ থেকে কাজ করে, তাতে তাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তারা সন্তানদের শিক্ষা ও প্রতিপালন মন দিয়ে করতে পারে না সারাদিন খাটুনির পরে স্বামীরও উপযুক্ত সঙ্গিনী হতে পারে না। আমরা ভাল বাড়ি তৈরি করে দিতে চাই—একজন লোকের দ্বারা পাওয়ার হাউস, গ্যাস কারখানা জলের পাইপ বসানো ইত্যাদি হয় না। আমরা জগতে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি, তিনি সব জায়গা ঘুরে এসে আমাদের জানাবেন অন্য অন্য স্থানে কি করা হচ্চে। নতুন নতুন যে সব আবিষ্ক্রিয়া জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত করেচে সে সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই। আমাদের নারী ও শিশুগণের জীবনে আনন্দ ও মঙ্গল আনয়ন করতে চাই আমরা।

নির্বাচনের সময় আমাদের এ কর্মতালিকার কথা আমরা বলি নি। কিন্তু এ আমরা করবো - তবেই আমাদের জিলন্ সহর আমাদের দেশের আদর্শ ও গৌরবস্থল হয়ে দাঁড়াতে পারবে -বিদেশ থেকে যাঁরা দেখতে আসবেন, তাঁরাও আমাদের শ্রমিক ও অধিবাসীদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য দেখে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করবেন।

১৯২৭ সালের নির্বাচন (দ্বিতীয়)
কৃত কর্মসমূহের তালিকা

টমাস বাটার ইস্তাহারঃ

১৯৩২ সালে আমরা নিম্নলিখিত অঙ্গীকার করেছিলামঃ—

১। টাউনের জন্যে ৪ পার্সেণ্ট্ সুদে টাকা ধার করা...সম্পাদিত।

২। নিজেদের খরচে ইলেক্ট্রিসিটি করে দেওয়া...করা হয়েচে।

৩। রাস্তাঘাটের জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপন করা...করা হয়েচে।

৪। জিল্‌ন্ সহরের নতুন অংশে রাস্তা, ড্রেন ও খাল তৈরি করা...সম্পাদিত।

৫। নিজেদের খরচে সহরের রাস্তা মেরামত ও পরিষ্কার .সম্পাদিত।

৬। সহর ও আমাদের মধ্যে যে সব চুক্তি তা প্রকাশ করা সম্পাদিত।

৭। বাটাদলের লোক বিনা বেতনে সহরের উন্নতির জন্য খাটবে. .তারা করেচে।

৮। সহর সরবরাহের সমস্ত বিল আমরা নিজের খরচে প্রকাশ করবো . করা হয় নি, কারণ সহরের সব জিনিসই আমরা বিনা ব্যয়ে দিয়েচি।

বিশ্বাস

[১৯২৭ সালের ৯ই অক্টোবর বাটার দল চার বছর কার্যের পর একটি সভা আহ্বান করে আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে। সেই উপলক্ষে টমাস বাটার ইস্তাহার।]

বন্ধুগণ,

আমি পুনরায় আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্চি—আপনাদের বিশ্বাস কতটা আকর্ষণ করতে পেরেচি, জানবার জন্যে। আমি গত চার বৎসরে আপনাদের নিকট থেকে যে বিশ্বাস পেয়ে এসেচি, এখনও তার চেয়েও আমাকে অধিকতর বিশ্বাস করুন, এই আমি চাই। সে সময়ের অর্ধেকটা দলাদলি ও ঝগড়াতে ব্যয় হয়েছিল টাউন বোর্ডের বিভিন্ন দলের সঙ্গে।

বিপক্ষদল সম্মিলিতভাবে আমার কাজ নষ্ট করতে চেয়েছিল। সহরের উপকারজনক কোন কাজে তারা যোগ দেয় নি। বিপক্ষদলের নেতা আমায় নির্বাচনের সময় বলেছিলেন, যদি আমি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করি, তবে তিনি আমায় নিজেই ভোট দেবেন। কিন্তু তত্রাপি তিনি দল পাকিয়ে আমার বিরোধিতা করে এসেচেন। বিপক্ষদল থেকে ডেপুটি-মেয়রের পদ সৃষ্টি হয়, কারণ আপনারা ঐ দলের ১১ জনকে নির্বাচিত করেছিলেন।

সভাস্থ লোকঃ "আমরা তাদের নির্বাচন করি নি।"

বাটাঃ আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি। তবে যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের বুঝিয়ে দেবেন এ কার্যের দ্বারা তাঁরা তাঁদের নিজেদের বা আপনাদের উপকার সাধন করেন নি।

এই ডেপুটি-মেয়র পদে পদে আমায় বাধা দিয়েচেন। টাউন বোর্ডের সভাগুলির কার্যতালিকা দেখুন। মেয়র বাটা পানশালা তুলে দিয়ে সেখানে লাইব্রেরি করতে চাইলেন। তাঁর প্রস্তাব, নগরের অধিবাসিগণ পানশালা চান না, কারণ তাতে তাঁদের পারিবারিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। এ নিয়ে বিষম দ্বন্দ্ব চললো, এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গত নির্বাচনে সহরের জনগণ আমাদের দলের

১৭ জনকে নির্বাচিত করেন। যদি এখন আপনারা ২০ জন পদপ্রার্থীকে মনোনীত করেন, তবে আমার অনুপস্থিতিতে বর্তমান ডেপুটি-মেয়র কাজ চালিয়ে যাবেন—ভূতপূর্ব ডেপুটি-মেয়রের মত কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না। টাউন বোর্ডের প্রত্যেক কার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল গতবার সহরের নারী ও শিশুগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি।

নির্বাচনী সভার অধিবেশন হ'ত গুদামঘরের হলগুলিতে -প্রত্যেকটি হলে ৪,০০০ হাজার লোক ধরে। এই সভাগুলিতে রাজনীতির থিওরি আলোচিত হ'ত না বা দলাদলি প্রশ্রয় পেত না। অধিবাসীদের অবস্থার অধিকতর উন্নতিসাধন এবং সস্তায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন এই দু'টিই ছিল এই সভার আলোচনার বিষয়।

জিলন্ সহরের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে বহুসংখ্যক কৃষক, স্ত্রীলোক ও মজুর সভাগুলিতে সমবেত হ'ত। বহু সরল ও সহজ প্রশ্নাবলী উত্থাপিত ও আলোচিত হ'ত -সুশিক্ষিত পেশাদার রাজনৈতিক বক্তাগণ যে সব বিষয় আলোচনা করা তাঁদের উচ্চশিক্ষা ও পদগৌরবের অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন।

একটি সভায় এই প্রস্তাবটি আলোচিত হয়, "কি ভাবে সহরের কার্য পরিচালনা করলে আমরা আমাদের আয়ের অনুপাতে বেশি জিনিস পেতে পারি।" দেখা গেল এ সম্বন্ধে পুরুষদের এক মত, মেয়েদের মত সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। যেমন, একটি সবলা কৃষক রমণী অভিযোগ করে, অনেক সময় সহরের দোকানে পচা ডিম, পচা কিংবা খুব দামী মাখন বিক্রয় হয়।

কিভাবে এ বন্ধ করা যায়? নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল-অধিকতর কড়াকড়ি, পুলিশের সতর্কতা, শাস্তি ইত্যাদি। বাজারের ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবও উত্থাপিত হ'ল, যাতে অধিকসংখ্যক কৃষক তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে বাজারে আসে—তাতে ফল ভাল হবে। প্রতিযোগিতা যেখানে বেশি, সেখানে উচিত মূল্যে খাঁটি জিনিসের প্রত্যাশা করা যায়।

আলোচনা ঘনীভূত হ'ল স্ত্রীলোক, পুরুষ, কৃষক, শ্রমিক, বাটা, ব্যবসায়ী মিস্ত্রি—সবাই যোগ দিলে। ফলে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লঃ জিলন্ সহরের বোর্ড ঠিক করলেন বাজারের খাজনা একদম উঠিয়ে দেওয়া হবে।

বাটার এ সব সভায় বাজে বক্তৃতার স্থান ছিল না। স্ত্রী পুরুষ একত্র হয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কথা আলোচনা করতো, নিজেরা পরস্পরের সেবা করতে ব্যগ্র ছিল, কর্মের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

আমাদের প্রয়োজন ও কৃষি

কৃষকগণ! কম পরিশ্রমে বেশি রোজগার করবার চেষ্টা কর।

মানুষ কাজ করবার জন্য জন্মেছে স্বীকার করি, কিন্তু মানুষে গরুর মত না খেটেও বাঁচতে পারে। কৃষিকার্যেও এ ব্যাপার সম্ভব, এ শুধু নির্ভর করে দেশের লোকের উন্নতির ওপর।

জিলন্ সহরের একজন পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি কি আহার করতে চায়?

১। মাংস
২। দুগ্ধজাত খাদ্য
৩। ফল
৪। শাক-সব্জি
৫। পুডিং



এ-খাদ্য তার শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ এতে মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই খাদ্য কৃষকেরা সহজেই উৎপাদন করতে পারে, এর জন্যে বেশি পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। গরু-বাছুর বছরের অধিকাংশ সময় নিজেরাই খেয়ে বেড়ায়—দুধ দোয়াও কলে হয়। ফল সম্বন্ধেও তাই—এর জন্যে মস্তিষ্কের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

এমন দ্রব্য উৎপাদন কর, যা লোকে পছন্দ করে এবং যে কোন দামে কিনতে রাজি। জিনিসের ভাঙ্গ বাজার আছে, সে জন্যে ভয় ক'রো না। যাতে জিলন্ সহরের প্রত্যেক অধিবাসী ও আমার কারখানার প্রত্যেক শ্রমিক যথেষ্ট দুধ খেতে পায়, যাতে তারা দুধ দিয়ে কফি না খেয়ে দুধের মাটা দিয়ে কফি খেতে পায়—এরকম ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে।

আমাদের শ্রমিকেরা যাতে ব্রেকফাস্টের সময় ফল, ডিম খেতে পায়, যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট মাখন ও জ্যাম মাখিয়ে রুটির টুকরো খেতে পায়—এ ব্যবস্থাও আমরা করতে চাই।

ত্রিশবছর পূর্বে আমাদের সহরে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রী হ'ত না, কারণ বাড়ির খাবারের জন্যে সবাই বাড়িতে এসব জিনিসের চাষ করতো। কলকারখানা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্য যাতে টাটকা অবস্থায় সহরের বাজারে আসে, এবং প্রচুর পরিমাণে আসে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। দুধ, মাংস, শাক-সব্জি, ফল প্রভৃতি বহুদূর থেকে এলে নষ্ট হয়ে যায়।

কৃষকেরা ভাবতে পারে কলকারখানার অবস্থা যদি খারাপ হয়ে পড়ে? হয়তো এরকম সময় আসতে পারে—তবে আপাতত তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পৃথিবীময় কলকারখানার উন্নতিই দৃষ্ট হয়, কলকারখানার সুবর্ণ যুগ আসছে সামনে। তার লক্ষণ এখন থেকেই দেখা গিয়েছে।

অতএব নির্ভয়ে কৃষিকার্যে মন দাও। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে নতুন ধরণের লোক দেখা দেবে—তাদের অভাব পূর্ণ করবার জন্যে তৈরি হও।

নবতর চিন্তার পথ

এই জেলা আমাদের জুতোর কারখানা খোলাতে বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল, কারণ তার আগে এ অঞ্চলে কৃষিকার্য ছাড়া আর কিছু করতো না। জমি কিনে বৃদ্ধ বয়সের অন্নসংস্থান করে রাখতো। তাদের বিশ্বাস ছিল জীবিকা নির্বাহের নিরাপদ উপায় কৃষিকার্য। তারা বুঝতে পারতো না যে শিল্প-বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ না দেওয়াতে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে শিল্প-বাণিজ্য, এর সত্যতা উপলব্ধি না করলে দেশের মঙ্গল কোথায়?

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে চাই নবতর চিন্তাপ্রণালী। আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতি হওয়ার পূর্বে এ অঞ্চলের অধিবাসিগণের মনোভাব ও চিন্তাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। এ থেকে যে অর্থাগম হবে, তা যেন জমি কেনার কাজে ব্যয় না হয়ে শিল্প-বাণিজ্যের জ্ঞান সঞ্চয়ে ব্যয়িত হয়। তরুণ দলকে তৈরি করে তুলতে হবে কলকারখানার কাজে। কৃষকের কাছে জমির যে মূল্য, ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকের কাছে ব্যবহারিক জ্ঞান ও যোগ্যতার সেই মূল্য। অতএব সঞ্চিত অর্থে জমি ক্রয় না করে আমাদের দেশের লোক যদি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করে, তবেই দেশের মঙ্গল। জমির দাম ক্রমে বেড়ে যাবে, সুতরাং জমি যে কিনবে, তার এতে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই হবে বেশি।

আমাদের কর্মতালিকা

এই সহরকে আমরা এমন করে গড়ে তুলবো, যাতে সমস্ত দেশের গর্বের বিষয় হতে পারে। মাল উৎপাদন ভাল ভাবে যদি করি, তবে আমাদের জীবন বিজয়ের পথে, আনন্দের পথে অগ্রসর হবে।

বড় বড় রাস্তা পিচ ঢালাই করতে হবে যেমন কারখানায় আমরা করেচি। ছোট ছোট রাস্তা ও গলি ধুলো ও কাদা বর্জিত করতে হবে, যেমন কলোনিতে করা হয়েচে। যাতে পাদচারিগণের সুবিধা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জীবনের গতি সহরের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, সহরের সর্বত্র ব্যবসায়ের সুবিধা হয়—ভাল রাস্তার এই হ'ল উদ্দেশ্য। সহরের মধ্যে ভাল ড্রেন প্রস্তুত করতে হবে। আদর্শ স্কুল গড়ে তুলতে হবে সহরের জন্যে, মোটা বেতনে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিযুক্ত করতে হবে। ছেলেদের খেলার মাঠ ও আবাসবাটি স্থানে স্থানে নির্মাণ করতে হবে। মেয়েদের রান্নার সুবিধার জন্যে গ্যাসের কারখানা স্থাপন করতে হবে। সব ট্যাক্স উঠিয়ে দিতে হবে।

নাগরিকগণ! নির্বাচনের দিন সমাগত অতএব আমাদের কর্মতালিকা প্রাণপণে সম্পন্ন করে তুলতে হবে। গত ইলেক্‌সনের পূর্বে আমরা চার বৎসরের কর্মতালিকা প্রস্তুত করেছিলাম, সেই স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে যেন আমরা আমাদের কর্ম নির্বাহ করি।

এ বৎসরও জীবনের সর্বাঙ্গীন কুশল ও উন্নতির জন্যে আমাদের কর্মতালিকা প্রস্তুত করা দরকার। আমাকে দিয়ে আপনাদের যা করবার ইচ্ছা, তা এক টুক্‌রো কাগজে লিপিবদ্ধ করে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, হয়তো সব সময় আমি আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হব না, কিন্তু অজ্ঞাত ইচ্ছা তো কোন দিনই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই?

শিল্প সমস্যা

আমি ও আমার পূর্বপুরুষ সবাই হাতেকলমে কারিকর। সুতরাং শিল্প-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার আমার আছে। ভাল মিস্ত্রি ছিলাম বলেই আজ এত বড় কারখানা খুলতে সমর্থ হয়েচি। আমার মতে শিল্প-সমস্যার সমাধান এ ভাবে হওয়া উচিত, যাতে ক্ষুদ্র শিল্পী বড় হয়ে উঠতে পারে। শিল্পীসংঘের রাজনৈতিক মতও এই দিকেই ক্রমশ গড়ে উঠবে। আজ তারা ছোট, তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও সামান্য। বর্তমানের নীতি অনুযায়ী মহত্ত্ব জিনিসটা অপরাধের পর্যায়ে এনে ফেলা হয়েচে। শিল্প শিক্ষা এ পথে যদি চলে, তবে বড় লোক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে, যারা দুর্বল, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কারিকরদের মধ্যে অনেকে এ সত্য উপলব্ধি করেচে, তাই আজ তারা কোন বড় কারখানার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে রেখে ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায়। তার ফলও ফলেচে, গত চার বৎসরে জিলুন্ সহরের ব্যবসাদার ও মিস্ত্রির উন্নতি হয়েচে আমাদের কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—শিল্পেরও উন্নতি হয়েচে।

উদাহরণ দিই। উর্সেক হ্রাদিস্ত্ জেলার মেয়রদের সভায় যে সব লোক এসেছিল, তারা কেউ গাড়িতে করে আসে নি, ট্যাক্সি ভাড়া করেও আসে নি। কিন্তু জিলুন্ সহরের অধিকাংশ মিস্ত্রী গত ইলেক্‌সনের মিটিং-এ নিজের মোটরে এসেছিল।

যে কারিকর নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর শিল্পীকে হিংসা করে, তার অসীম দুর্দশা। সন্তানদের মধ্যে পর্যন্ত এ দোষ সংক্রমিত হয়। আমি আমার পিতার নিকট আমার বর্তমান উন্নতির জন্য কৃতজ্ঞ। একদিন আমার পিতা জুতো ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মে'র কারখানার চিমনি দেখিয়ে বলেছিলেন,

"আমার ছেলেরা একদিন অমন চিমনি করবে তাদের কারখানায়।" তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হয়েচে। কিন্তু এজন্য আমার বাবাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল, জুতো ব্যবসায়ীরা রাগ করে তাঁর সংগে কয়েকদিন কথা বলে নি- কারণ তাদের অবস্থা ছিল তখন খারাপ। বাবার এই কথা তারা অপমানজনক বলে বিবেচনা করেছিল-কিন্তু তাঁর সন্তানদের কাছে এই বাণী জ্বলন্ত উৎসাহ বহন করে এনেছিল, এ কথা মুক্তকণ্ঠে আজ স্বীকার করবো। অতএব ছেলেদের মধ্যে উচ্চভাব প্রচার কর। তারা যেন তাদের চেয়ে বড়কে ঘৃণা না করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ না হয়।

কারিকরদের মধ্যে যারা আজ অবস্থাপন্ন, তারা শিল্পীসংঘের সভ্য। তবুও আমি জানি সময়াভাবে তারা এই সংঘের রাজনৈতিক মতামত নিজেরা গড়ে তুলতে সাহায্য করে নি। তারা জানে এই সংঘ আমাদের কার্যে অনবরত বাধা সৃষ্টি করচে। যদিও কেন যে তারা আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করে, তার কারণ আমরা জানি না, বোধ হয় তারা নিজেরাও জানে না।

পুরাতন জিলন্

সহরের অনেক নাগরিক সহরের বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয় কারণ টাউন বোর্ড তাদের ইচ্ছামত বাড়িঘর তৈরি করতে দেয় না। তারা একথা স্বীকার করে, যেখানে বহুলোকের বাস, সেখানে যখন জিলন্ একটি বড় গ্রাম মাত্র ছিল- সেই পুরানো দিনের মত সংকীর্ণ ও অন্ধকার গলিঘুঁজি করেচে. যে ঋণের অনুভূতি আমাকে প্রবন্ধ করতে সহরের ও সহরের অধিবাসিগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির টাউন বোর্ড উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত। জমি না দিলে চওড়া রাস্তা ও অন্যান্য হিতকর কার্য কি প্রকারে সম্ভব?

পুরাতন জিলন্ সহরে আমরা কি দেখতে পাই? একটি মাত্র পথ সাধারণের যাতায়াতের জন্যে - কলহপরায়ণ প্রতিবেশীদল। সারা দুনিয়ার ওপর তারা বিরক্ত। এ ধরণের পথ কলহ বিবাদ ডেকে আনে, একথা আমদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন না। ঘরে ঘরে দুঃখের সৃষ্টি হয় এর দ্বারা।

আমরা চাই সুখ ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করতে-যাতে প্রত্যেকের মুখে হাসি দেখা দেয়, যাতে মানুষের জীবনানন্দ স্ফূর্ত হয়ে ওঠে প্রতি কার্যের মধ্যে। স্বাধীন মানুষ গড়তে চাই আমরা। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও নিজের বিছানায় অপরকে স্থান দিতে চায় না। আমরা শ্যামল তৃণখণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক অধিবাসীদের জন্য পৃথক পৃথক বাসগৃহ নির্মাণ করে দিতে চাই—কোন পরিবারের সংগে কোন পরিবারের সংস্রব থাকবে না, ঘরগুলিতে যথেষ্ট আলো-বাতাস আসবে—যেমন আমরা আমাদের কারখানার শ্রমিকদের জন্যে করেচি। লম্বা লম্বা একটানা বাড়িগুলি রোগের বীজ ছড়ায়।

অবশ্য বড় পার্ক করা সম্ভব হবে না সহরের মধ্যে। প্রত্যেক বাড়ির পাশের চওড়া রাস্তা যাতে বাড়ি পর্যন্ত যায়, প্রত্যেক রাস্তা দোকান ও ব্যবসার উদ্দেশে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব দোকানে সব রকম জিনিস বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকবে--সহরের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সহায় হবে এই দোকানগুলি।

১৯২৭ সালে জিলন্ সহরের নির্বাচনের ফলাফলঃ -

	ভোট	পদ
বাটাদলের লোক	৪৫৫৩	২৫
চেকোশ্লোভাক সোস্যালিস্ট	১৫৫	১

কমিউনিস্ট	৩২৬	২
ক্যাথলিক	১৯৫	১
সোস্যাল ডিমোক্র্যাট্	৬৯	
শিল্পীসংঘ	২২৮	১

নাগরিকগণ!

আপনাদিগকে ধন্যবাদ। আপনাদের সেবায় পুনরায় আপনারা আমায় বাধ্য করেছেন। বিশ্বাস করেছেন, সুতরাং বিশ্বাস পাবেন। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন বৃহত্তর জিলিন। এভাবে আমরা গড়ে তুলব যাতে এই নগরের অধিবাসী হওয়াকে সকলে গর্বের বিষয় বিবেচনা করে। আমি সকলেরই যশ ও উন্নতি কামনা করি।

বৃহত্তর জিল্‌ন্ কেন গড়বো?

১৯৩১ সালের নির্বাচনের সময় টমাস বাটা বক্তৃতা করেন নি তিনি একটা বড় খাতা হাতে সভায় যেতেন এবং নাগরিকগণের সকল অভিযোগের কথা তাতে লিপিবদ্ধ করতেন। একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তাঁর নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেনঃ জিলিন্ সহর বাড়িয়ে আমাদের কি লাভ?

১৯২৩ সালে যখন আমাদের কারখানার উন্নতি হতে সুরু হয়েছে, জালুডেক এই প্রশ্নই আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলেছিলঃ আমরা কারখানার পুরাতন শ্রমিক, সারা দুনিয়া থেকে ক্ষুধার্ত জনগণ চাকরি খুঁজতে এ সহরে ছুটে যদি আসে তবে আমাদের কি লাভ?

জালুডেক বুদ্ধিমান লোক। সে শীঘ্রই বুঝলে সে সময়ে আমাদের কারখানায় যে দু'হাজার শ্রমিক ছিল, তাদের জীবন বিশ হাজার লোকের একত্র বাসের দুর্দশার চেয়েও বেশি।

দু'হাজার লোকে এত বড় পাওয়ার হাউস গড়ে তুলতে পারে না। দু'হাজার লোকে গ্যাস কারখানা গড়ে তুলতে পারে না। গ্যাস উনুনে ৮ হেলার লাগে যে রান্না হয়, কয়লার আগুনে সেই রান্নার খরচ পড়ে ৪৫ হেলার তা ছাড়া কালিঝুলি ও পরিশ্রম তো আছেই। বন্দর থেকে কয়লা আমদানি করে সস্তায় বিক্রি করতে পারতো না তারা। হাসপাতাল, স্কুল রাস্তাঘাট এক কথায় জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবর্ধনকারী কোন জিনিসই অত কম লোকে সম্পন্ন করতে পারতো না—বড় নেতার দ্বারা চালিত বহুলোক ভিন্ন এ সব উন্নতি সম্ভবপর নয়।

টমাস বাটা তার অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেছিলেন কর্ম বক্তৃতার চেয়ে মূল্যবান। স্বায়ত্তশাসনের ভারপ্রাপ্ত নেতৃদল নাগরিকগণের নিকট কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ দাখিল করবেন প্রতিবৎসর এই ছিল তাঁর মত। বক্তৃতা নয় আঁকজোঁক সমেত হিসাব।

তৃতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি পূর্ব পূর্ব বারে কি কাজ করেছিলেন, তার এক হিসাব নাগরিকদের নিকট দাখিল করেন। নির্বাচনের ফলাফল দেখে তিনি বুঝলেন লোকে বক্তৃতা ও লম্বা লম্বা কথার চেয়ে বাস্তব ঘটনা বোঝে অনেক বেশি।

আমার কর্তব্য

বিগত নির্বাচনে আপনারা আমাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বৃহত্তর জিলন্ নগর নির্মাণ করবার ভার দিয়েছিলেন, যেখানে বাস আনন্দ ও শান্তির আকর হয়ে উঠবে। এই সহরে ৫০,০০০ হাজার লোকের বাস। ব্যারাক তৈরি করে এদের স্থান দেওয়া যায় কিন্তু সে সংকীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নারী ও শিশুদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য একটি আদর্শ নগরী নির্মাণ। আলো, বাতাস, সবুজ ঘাস ও গাছপালার যেখানে প্রাচুর্য থাকবে। উদ্যানের মধ্যে নগর প্রতিষ্ঠা। সকলেই মোটা বেতন পাবে, শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হবে, উৎকৃষ্ট বিদ্যায়তন থাকবে।

মেয়েদের জীবন থেকে পরিশ্রমের নির্বাসন করতে হবে, যাতে তারা ঘরগৃহস্থালী সাজাতে সময় পায়।

যদি আমরা আমাদের আদর্শে অটুট থাকি, আমাদের সহর থেকে দুঃখকষ্টের চিরনির্বাসন ঘটবে। বিষম অর্থনৈতিক বিপ্লব বা শত্রুপক্ষের শত আক্রমণেও আমাদের আদর্শচ্যুতি ঘটবে না—আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিই আমাদের জয়ের পথে, মঙ্গলের পথে এগিয়ে দেবে।

১৯৩১ সালের তৃতীয় বার নির্বাচিত হবার পরে

তৃতীয় বারের জন্য আপনারা আমাকে এ নগরের মেয়রপদে নির্বাচিত করেছেন এজন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আমাদের নির্বাচনক্ষেত্রে অধিবাসিগণের যে সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, তা জগতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এ দিক থেকে দেখলে জগতে আমাদের দৃষ্টান্ত সত্যই অতুলনীয়—প্রত্যেকের গুপ্ত ও সম্মিলিত ভোটে আমাদের দল আজ টাউন বোর্ডে নির্বাচিত—আমাদের বিরোধী লোক একটিও ছিল না। আমাদের অদ্যকার সভাপতি রেভারেণ্ড উলেহ্লা আমাদের বিরোধী প্রতিপক্ষ নন, যদিও ক্যাথলিক পার্টি তাঁকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল।

আপনাদের এই অসীম বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা আমাকে আপনাদের প্রতি ঋণপাশে আবদ্ধ করেছে, যে ঋণের অনুভূতি আমাকে প্রবুদ্ধ করবে সহরের ও সহরের অধিবাসিগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে।

যাঁরা আজ টাউন বোর্ডে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন নি, সে সব দলের প্রতিও আমরা সুবিচার করবো কারণ শাসকের ধর্ম সুবিচার। যে কোন লোক বিচার প্রার্থনা করে, তাদের অভাব অভিযোগ শোনবার জন্যে আমরা সব সময় যেন সতর্ক থাকি, যে কোন অভাব অভিযোগের কাহিনী এই কমিটিতে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা উচ্চারিত হবে—আমাদের কর্তব্য হবে সেগুলি শুনে উপযুক্ত প্রতিকার করা।

আমাদের অধিবাসীরা এখনও অনেকে জমি দিতে নারাজ। সহরের পরিবর্ধনের জন্য এই জমির প্রয়োজন, এ ত্যাগ সকলকেই স্বীকার করতে হবে—পরস্পরের স্বার্থ প্রত্যেকেরই স্বার্থ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কিছু অংশ ত্যাগ দ্বারা যদি সহরের তাবৎ অধিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধিত হয়, তবে অকুণ্ঠিত চিত্তে সে ত্যাগ আমাদের করতেই হবে। এ আমাদের কর্তব্য।

আমরা টাউন বোর্ডের সদস্যগণ আগে পথ দেখাব। আমাদের উচিত সহরের অধিবাসিগণের সম্মুখে এই উদাহরণ উপস্থাপিত করা। এতে অনেক ঝগড়াদ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

সমস্ত জগতের কাছে আমাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে। যদি আমাদের ব্যাপারের উন্নতি এই ভাবেই হ'তে থাকে, তবে সহরের চেহারা বদলে যাবে অদূর ভবিষ্যতে, এ আশা আমি পোষণ করি।

এর জন্যে চাই অধিকতর যোগ্যতা, স্বাধীনতা—অধিকার। স্টেট্ এখনও সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের হাতে দেন নি, যদিও তার প্রতিশ্রুতি রাজ্যের উচ্চস্তর থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। আমাদের ঐক্য দেশের গবর্ণমেন্টের মনে আমাদের যোগ্যতার প্রতি আস্থা এনে দেবে আশা করি।

রাজনীতিজ্ঞ

মোরেভিয়া ও সাইলেসিয়া প্রদেশদ্বয় শাসনের কার্যে সাহায্য করবার সময়ে বাটা নিম্নলিখিত বক্তৃতা কয়েকটি প্রদান করেন। এই বক্তৃতার মধ্যে আমরা একটি নির্ভীক সত্যপ্রিয়, সেবাপরায়ণ রাজনীতিজ্ঞের সন্ধান পাই যিনি তাঁর দেশের গৌরব ও মঙ্গল বৃদ্ধি করবার দিকে একলক্ষ্য, যাঁর কাছে দেশের কোন অভাব অভিযোগ অজ্ঞাত নেই। তাঁর বাণীগুলি মহত্ত্বে ও সারল্যে এব্রাহাম লিন্‌কনের সমান যে বাণী মানুষের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করে, নাগরিকগণের ঐক্য আনয়নে সহায়তা করে। তাঁর কর্মতালিকা সহানুভূতি ও প্রেমের সহিত রচিত হয়েছিল বলেই জিলন্ সহর অল্পদিনের মধ্যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়, দেশ সমৃদ্ধ হয়, অধিবাসিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন বাস্তবতায় পরিণত হয়।

টমাস বাটা প্রাদেশিক বোর্ডে সন্ধ্যাকাল ও রবিবারগুলি কাটাতেন। তাঁর কাজ ছিল স্থানীয় বাজেট, হিসাব, প্রাদেশিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে চর্চা ও বিতর্ক। বাটা চেয়েছিলেন:—

১। যাঁরা স্বাক্ষর দ্বারা টাকা মঞ্জুর করবার অধিকার রাখেন, তাঁরা সে টাকার নিখুঁত হিসাব দেবেন জনসাধারণের কাছে।

২। গ্রাম ও নগরের যে আয়ের অংশ স্টেটের সাহায্য পেয়ে বর্ধিত হবে, সেগুলি থেকে কিছু খাজনা ধার্য করা।

৩। প্রাদেশিক ও স্টেট্ ঋণগুলি নাগরিকগণের সম্মতি ও উপস্থিতিতে মীমাংসা করা। স্টেট্ ও নাগরিকের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকে। নাগরিকগণ স্টেট্‌কে অর্থ-সাহায্যের সঙ্গে তাদের সহানুভূতিও দান করবে—তারা অনুভব করবে, স্টেটের উন্নতিতে তাদেরও উন্নতি। স্টেটের ভাগ্যের সঙ্গে তাদের ভাগ্য বিজড়িত।

৪। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার।

৫। ব্যবসাগুলিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বৃদ্ধি করে তাদের আয় বাড়িয়ে তোলা।

জনসাধারণের নিকট হিসাব নিকাশ

নাগরিকগণ!

১৯২৮ সালের আয়-ব্যয়-তালিকা আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেচি। খুব সোজাভাবে হিসাব লেখা আছে এতে, প্রত্যেক লোকেই যাতে জিনিসটা বুঝতে পাবে।

আইনানুসারে আমাদের সহর হিসাবপত্র থাকবে ক্যামেরাল নীতি অনুসারে—কিন্তু এই নীতি অনুযায়ী কাগজ লিখলে তা কেবল হিসাব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বোঝে। আমাব মতে হিসাব জিনিসটা সকলেই বুঝবে।

সুতরাং আমি নিয়ম করেচি কাগজপত্র ক্যামেরাল নীতি অনুসারে লেখা হবে, অথচ মোট অংকগুলি সাধারণ হিসাবের খাতার মত 'জমা' ও 'খরচ'-এর ঘরে লেখা হবে; যাতে সকলেই সেটা বোঝে।

নব বর্ষের পরেই আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা আমার উচিত ছিল—কিন্তু জনসাধারণের বোধগম্য করে প্রকাশ করতে দেরি হয়ে গেল। পুরানো ক্যামেরাল নীতি অনুসারেই পূর্বে হিসাব লেখা হয়েছিল—কিন্তু প্রাদেশিক বোর্ড বা অর্থনৈতিক বোর্ডেব এমন একজন সভাও নেই যে সে জিনিসটা বোঝে। যে তার দায়িত্ব নেবে, সে যদি জিনিসটা না বোঝে তবে সে হিসাব রাখার অর্থ হয় না।

১৯২৮ সালের বাজেট ঠিক নেই এমন কথা আমি বলচি না—কিন্তু ঐ জটিল হিসাবের প্রণালী না বোঝার দরুন তা ঠিক হ'ল কি হ'ল না আমি কিছু জানি না।

এ ব্যাপারটা ঠিক নয়। যদি কেউ আমার কাছ থেকে টাকা নেয়, তবে সে বুঝে নেবে তাব পাওনাগণ্ডা, শুধু আমার সততার ওপর নির্ভর করবে না—এটাই আমি চাই। সহরের আয়-ব্যয়েব ব্যাপারও এভাবে দেখা উচিত, যাতে সকলেই সেটা বোঝে, তা কেন হবে না?

উভয় নীতির পার্থক্য বোঝাতে আমি একটি গল্প বলচি, এটা আমরা অর্থনৈতিক বোর্ডে বলাবলি কবতাম। গল্পটা এই:—

এক গ্রাম্য মোড়ল জেলার প্রধান সহরে গিয়েচে গ্রাম্য কোন ব্যাপার মীমাংসা করতে। ফিরবার পথে ঝড়ে তার টুপি হারিয়ে গেল, সে হারানো টুপিটার বিল করে দিলে। গ্রাম্য বোর্ড সব খরচ দিতে চাইলে— টুপিটার ছাড়া। মোড়ল রাগ করে বিল ফিরিয়ে নিয়ে এসে ক্যামেরাল নিয়ম অনুসারে বিল লিখে আবার হাজির করলে। টাকার অংক একই আছে—কিন্তু টুপিটার দাম কোথায় ধরা হয়েচে—কেউ বুঝতে পারলে না। মেয়র বললে, ওর মধ্যেই আছে, খুঁজে বার কর।

আমারও তাই মত। আমাদের প্রাদেশিক বাজেটের মধ্যে হ্যাটের খরচ গুপ্তভাবে আছে, আমরা তা ধরতে পারি নে। অতএব সহজ নিয়ম বের করতে হবে, যাতে সকলেই হিসাব বুঝতে পারে। জটিলতা হিসাবের কলের সাহায্যে সরল করে ফেলতে হবে, যার ব্যবহার ক্যামেরাল পদ্ধতি অনুসারে সম্ভব নয়।

এ রকম জটিল পদ্ধতির অনুসরণ করার কারণ কি? এর উত্তর সব সময়েই দেওয়া হয়—এই হিসাব দ্বারা আমাদের বেশি ট্যাক্স দিতে হয় না। অর্থাৎ হিসাব ট্যাক্স কালেক্টরের কাছে বোধগম্য হবে না। অত্যন্ত সহজ হ'লে সবাই বুঝতে পারবে, ক্রেতারা জিনিসের দাম কমিয়ে দিতে বলবে।

যে ব্যবসায়ী এরকম করে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে ট্যাক্স-কালেক্টরকে ফাঁকি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু শেষে নিজেরাই বুঝতে পারে না তাদের হিসাব। অনেকে বলবেন এই ভাল—কারণ বোঝাতে

গেলেই অর্থব্যয়। মজুরেরা বেশি বেতন চাইবে, স্টেট্ মোটা ট্যাক্স চাইবে। কিন্তু এ থেকে কি মজুর, কি ট্যাক্স-কালেক্টর কি ব্যবসায়ী—সকলের দুর্দশা সুরু হয়।

মিউনিসিপ্যালিটির ভাল লোকেরাও এ ব্যাপারের সমাধান করতে অসমর্থ, যদি তারা হিসাব না বোঝে তবে তারা কি করবে? আমাদের পথ দেখানো উচিত, আমাদের আদর্শে যদি অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি ও স্টেট্ অনুপ্রাণিত হয়, তবে দেশের মঙ্গল সাধিত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাদেশিক বাজেট ও টাকা খাটান

একবার বাটা দশলক্ষ ক্রাউন মঞ্জুর করেছিলেন, প্রাদেশিক বাজেটে বাড়তি খরচ হিসাবে টেলিফোনের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে। এই উপলক্ষে তাঁর বক্তৃতা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল:-

আমাদের বাজেটের অবস্থা খুব খারাপ। আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা সকলেই জানেন ক্রমশ দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে।

এই দুর্দিনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে প্রদেশের ওপর গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতির অভাব, মিউনিসিপ্যালিটির ওপর প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাব। স্টেট্ প্রাদেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সযত্নে রক্ষা না করে যেন শত্রুর মত ব্যবহার করছেন। ট্যাক্স আদায় করবার খরচ ট্যাক্সের চেয়ে বেশি দাঁড়াচ্ছে অথচ মিউনিসিপ্যালিটি বিনা খরচে ট্যাক্স আদায় করতে সমর্থ। সংগীত ট্যাক্স মাছ ধরবার ট্যাক্স প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করা হয়েছিল অথচ প্রাদেশিক ট্যাক্স আপিসকে ১৫ পার্সেণ্ট আদায়ী টাকা দিতে হয় আদায়ের খরচের দরুন যদিও মিউনিসিপ্যালিটির আদায় করতে একটি পয়সাও ব্যয় হয় না। আমাদের প্রদেশকে এবিষয়ে আদর্শস্থানীয় করা উচিত। মিউনিসিপ্যালিটিকে সেগুলি আমাদের দেওয়া উচিত যে খাজনা আদায় করতে প্রাদেশিক আপিসের লাভের চেয়ে খরচ হয় বেশি।

আমাদের বাজেটের আর এক দোষ এতে কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিবদ্ধ থাকে না অনামী ব্যাপারের মত চলে আসছে এতদিন। অবশ্য সভাপতি ও রেভারেণ্ড স্রোনিনের সই থাকে বটে—কিন্তু প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভার যাঁর ওপর ন্যস্ত তাঁদের নামও থাকে না সাক্ষরও থাকে না। আমি স্বীকার করি তাঁরা অত্যন্ত সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে আমার অবিশ্বাস নেই- কিন্তু এই অনামী বাজেট তাঁদের যোগ্যতা ও সাফল্যের প্রতিও সুবিচার করছে না।

আধুনিক কালের উন্নতি নির্ভর করছে টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, ড্রেন রাস্তা, রেলপথ প্রভৃতির ওপর। মাল উৎপাদনের কাজও এতে অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু আমাদের দারিদ্র্যবশত বড় বড় ব্যাপারের কথা না ভেবে অল্পব্যয়সাধ্য জিনিসগুলির কথাই এখন ভাবতে হবে।

টেলিফোন আমাদের এখানে নেই বললে হয়। এখানে ১৪০ জনের পিছু একটা টেলিফোন, অথচ অন্যান্য দেশে ৮/১০ জন লোক পিছু একটা টেলিফোন। টেলিফোন থাকলে একজন মূর্খ অসভ্য লোকও ব্যবসাদার হয়ে পড়ে এবং সে নিজের অবস্থা সচ্ছল করে তুলতে পারে।

আফ্রিকার এক ওয়েসিসে আমি একটি লোককে দেখেছিলাম এক টেলিফোন কানে দিয়ে বসে আছে। তার ব্যবসা জল বিক্রি করা এবং চামড়া কেনা। কি করে সে টেলিফোন পেলে সে গল্প বললে, "একবার এক প্রাইভেট টেলিফোন ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে একটা লোক এসে তার খাটিয়ে তার হাতে যন্ত্রটা তুলে দিয়ে বললে, ছ'মাস পরে আমি এসে হয় টাকা নয় টেলিফোন নিয়ে যাব।"

এখন লোকটা টেলিফোনের মজা বুঝেছে, সে বলছে কথা বলার কল সে কিছুতেই ছাড়বে না।

খুবই স্বাভাবিক। এই কল তার সংগে রেল, ডাকঘর, স্টেশনের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেচে। সে লিখতে জানে না, মুখে বলে ব্যবসার কথাবার্তা ঠিক করে।

আমাদের বর্তমান অবস্থায় এটা খুবই স্বাভাবিক—আমরা পরের ওপর নির্ভরশীল—আমাদের জীবনের প্রত্যেক কাজে পরস্পরের সহযোগিতা দরকার। টেলিফোন আবিষ্কারও হয়েচে সেজন্যে।

আমরা কৃষিকার্য শিক্ষার স্কুল খুলেচি। প্রাদেশিক বাজেটে সে খরচ মঞ্জুর করা হয়েচে। এই স্কুলে টেলিফোন থাকা দরকার। কৃষকের ছেলেরা স্কুলে আসবে, তাদের পিতামাতার কোন সমস্যা সমাধান করবার দরকার হ'ল--স্কুলে ফোন করলে। শিক্ষক বলে দিলেন, "গত বৎসর অমুক কৃষকের এই সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, আমরা তার এই সমাধান করেছিলাম।"

প্রত্যেক গ্রামে টেলিফোন না থাকলে বহু অসুবিধায় পড়তে হয়। যত ছোট গ্রাম, তত বেশি দরকার, ডাক্তার ডাকা, ফায়ার ব্রিগেড ডাকা--কত সাহায্য হয় ফোন থাকলে।

প্রাদেশিক বোর্ড একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করে বিচার করবেন, কোন কোন গ্রামে টেলিফোন হওয়া আবশ্যক, কেন সেখানকার অধিবাসীরা টেলিফোন নেয় না, দারিদ্র্য না অজ্ঞতা-কি এর কারণ? এই বোর্ড ডাক বিভাগের সংগে একযোগে গ্রামে গ্রামে টেলিফোন বসাবার আনুমানিক খরচ ঠিক করবেন।

আমাদের ব্যবসায়ের উন্নতির মূলে টেলিফোন। আমরা এই আবিষ্কারের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ দরিদ্র গ্রাম ও স্কুলগুলিতে তিনহাজার যন্ত্র বা দশলক্ষ ক্রাউন দান করতে রাজি আছি। আমি প্রস্তাব করি একটি বিশেষ টেলিফোন কমিটি গঠন করে প্রাদেশিক বোর্ড আমার সামান্য আর্থিক সাহায্যের দ্বারা প্রত্যেক দরিদ্র গ্রামে টেলিফোন বসাবার ভার নেবেন।

প্রাদেশিক রাজস্ব

[১৯২৯ সালে এই ইস্তাহার বাহির হয়---এর সংগে ছিল খুঁটিনাটি হিসাব অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স্ ও দলিল, রেকর্ড ইত্যাদি]

প্রাদেশিক রাজস্বের অবস্থা আমাদের নৈতিক চরিত্র ও ইচ্ছাশক্তির সংগে জড়িত। আমরা সকলেই চাই প্রাদেশিক রাজস্বের অবস্থা ভাল করতে, কিন্তু তা করবার শক্তি ও মনোবৃত্তি আমাদের নেই।

আমরা গ্রামগুলিকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়েচি, তাদের টাকা কম হ'লেই সেট্‌লমেন্ট তহবিল থেকে টাকা চায়---যেমন আমাদের টাকার ঘাট্‌তি হ'লে স্টেটের তহবিল থেকে টাকা চাইতাম।

এর অপমানের দিকটা তাদের স্পর্শ করে না-নিজেদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য সকলের কাছে প্রকাশ করার মধ্যে নিজেদের দেউলে স্বীকার করায় হীনতা এদের বোধগম্য হয় না কেন তাই ভাবি।

৭৭নং আইন অংশত এজন্যে দায়ী। এই আইন দরিদ্র ও দেউলে গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বায়ভারের কিয়দংশ প্রাদেশিক বোর্ডের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচে। আমরা জানিয়ে দেব প্রাদেশিক রাজস্ব কি ভাবে বিলি হয়, যাতে গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এ আশা না করতে পারে, তারা যত বেশি খরচ করবে, আমরা তত বেশি দেব।

এর জন্যে যথেষ্ট সৎসাহস প্রয়োজন। এই সৎসাহস আমাদের দেখাতে হবে গ্রামগুলিকে ভিক্ষা-বৃত্তি থেকে নিষ্কৃত করবার জন্যে। স্টেট্ আমাদের অপমান ও দারিদ্র্য দেখতে চায় না—আমরা

গ্রামগুলির প্রতি এই মনোভাব অবলম্বন করেছি বলেই স্টেট্ প্রাদেশিক রাজস্বের প্রতি বর্তমান মনোভাব পোষণ করেন।

প্রাদেশিক বোর্ডের কতিপয় সাহসী ও উৎসাহী মেম্বরদের একত্র হয়ে এরূপ কর্মতালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক, যার ফলে প্রদেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। কি ভাবে পাগন্তী প্রাদেশিক বাজেট গঠিত হবে, তার কতকগুলি নীতি আমি নিম্নে প্রদর্শন করচি। এর দ্বারা প্রাদেশিক ব্যয় ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ক্রাউন কমে যাবে।

প্রাদেশিক রাজস্ব ব্যয় হবে শুধু প্রদেশের অধিবাসীদের উন্নতির কার্যে। যে সব ব্যবসায় গড়ে উঠচে—তাই থেকে প্রাদেশিক রাজস্ব আদায় হবে। প্রাদেশিক যে সব খরচ বিদ্যালয়, ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি খাতে ধরা হয় তা সম্পূর্ণ ন্যায্য, কারণ তাদের উদ্দেশ্য অধিবাসীদের আয়বৃদ্ধি। ভাল স্কুল, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, কৃষির উন্নতি—এ সব থেকে স্টেটের ভাণ্ডারে আয়কর জমা হতে থাকে।

অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের দিকে সব সময়ে নজর রাখতে হবে। এই জিনিসটাই প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল এ বাবদ প্রাদেশিক রাজস্বের যে অংশ ব্যয়িত হবে সেটা ইনভেস্টমেণ্ট বলে ভাবতে হবে। স্টেট প্রদেশকে যে টাকা ভিক্ষা দেয়—তা দ্বারা প্রদেশের আর্থিক অবনতি বন্ধ হয় বটে কিন্তু নৈতিক অবনতির পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রাদেশিক বোর্ডে এজন্য উৎসাহী কর্মীর দরকার। যারা মন দিয়ে খেটে প্রাদেশিক রাজস্বের অবস্থা ভাল করবার চেষ্টা করবে অর্থনৈতিক পরাধীনতা দূর করবে নিজের প্রদেশের বড় লোক ভিন্ন বড় কত হয় না। যারা সফল্য অর্জন করবে এ ব্যাপারে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে তাদের উপযুক্ত পুরস্কারের বন্দোবস্ত করতে হবে, কারণ তাদের কর্মস্পৃহা ও যোগ্যতার ওপর আমাদের প্রদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নির্ভর করে।

টেলিফোনের জন্য আমি সে সব গ্রামে অর্থ মঞ্জুর করতে রাজি, যারা এখনও টেলিফোন পায় নি।

আমি প্রাদেশিক ঋণের বিপক্ষে কেন?

১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের সভায় এই ঋণের অনুমতি নাকচ করার প্রস্তাব আমি কেন করেছিলাম, তা আপনাদের জানা দরকার।

তখন অনেক সভ্য এই ঋণগ্রহণের সপক্ষে ভোট দেন। আমাদের দেনা শোধ করবার জন্যেই এই ঋণগ্রহণের প্রয়োজন ছিল। স্টেট্ আমাদের কতকগুলি আয় নিজেরা নিয়ে কতকগুলি ব্যয়সাধ্য দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়েছিলেন—তা থেকেই এই দেনার সৃষ্টি।

আমি স্টেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে চাই না। ঋণগ্রহণ অস্বীকার করার দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করাও যাবে না। আমাদের গবর্ণমেণ্টের উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা বিদ্যমান। আমি বিশ্বাস করি প্রাদেশিক রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা যুক্তিসংগত আপোষ করা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

আমার মনে হয় না আমাদের প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ স্টেটের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন না। অধিবাসিগণের সুখসুবিধা সম্বন্ধে তাঁরা মিলেমিশে যদি কোন বোঝাপড়া করেন, সেটা আইনে পরিণত করা কঠিন কাজ নয়।

মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়া প্রদেশদ্বয়ের উন্নতি সম্ভব হবে এই দুই প্রদেশের অধিবাসীর

ইচ্ছাশক্তি, পৌরুষ ও অধ্যবসায় দ্বারা। স্টেটের গবর্ণমেণ্টেরও ঠিক এই গুলি থাকা চাই—উভয় পক্ষের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিতে এ কার্য সম্ভব হবে।

এই ধরণের চুক্তি হওয়া উচিত যে আমাদের ঋণের কিছু অংশ গ্রহণ করবেন—যে ঋণের জন্যে আমরা আদৌ দায়ী নই। আদায়ী ট্যাক্সের শতকরা কত অংশ স্টেট্ প্রদেশকে দেবেন, তার সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার উভয়পক্ষে। প্রদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সদৃঢ় না হ'লে তার পক্ষে ঋণগ্রহণ সম্ভব নয়। আমরা কম সুদে অধিবাসিগণের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারি ব্যাঙ্কের কমিশন না দিয়ে। লোকে এ ঋণ দিতে আপত্তি করবে না, কারণ তাদের দেশপ্রীতি প্রদর্শনের এ একটি উপায়। প্রাদেশিক ঋণের কাগজ প্রত্যেক স্কুলে পাঠানো হবে, প্রত্যেক ক্লাসে এ বিষয় শেখানো উচিত ছেলেদের, যাতে স্কুলের ছাত্রেরা খরচ বাঁচিয়ে অন্তত একখানা প্রাদেশিক ঋণের কাগজও কিনতে পারে। এ থেকে তাদের সুদ আসবে, নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে গর্ব অনুভব করতে পারবে। কোন ব্যাঙ্ক এই নৈতিক চেতনা অধিবাসীদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারে না।

প্রদেশের সঙ্গে স্টেটের বোঝাপড়া হ'তে বেশিদিন লাগবে বলে আমার মনে হয় না। যে সব লোক আমাদের প্রাদেশিক অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ, তাঁরা যদি এমন প্রস্তাব আনেন যে নিজেরা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাতে স্বাক্ষর করতে পারবেন, যদি তাঁরা মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের মত দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে এ সমস্যার সমাধান করতে কতদিন লাগে?

অর্থনৈতিক কমিশন ও প্রাদেশিক বোর্ডে রাশি রাশি প্রস্তাব আসে অর্থনৈতিক সাহায্য সম্বন্ধে। তাদের বিবরণে ভোট দেওয়া শক্ত সাহায্য যে তাদের দরকার এটা খুব ভালই বুঝি। সঞ্চয়ের বিশেষ প্রয়োজন, এবং অনাথাশ্রম, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত। কারণ এইগুলির উন্নতির ওপর প্রদেশের অর্থনৈতিক, শারীরিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করছে।

গতবার এ বিষয়ে প্রাদেশিক বোর্ডের সভ্যগণ সভাপতি ডাঃ সর্ণিকে নিয়ে স্টেটের মন্ত্রীসভায় ডেপুটেশনে গিয়ে প্রাদেশিক ঋণের সম্বন্ধে বোঝাপড়া করেন। প্রাদেশিক বাজেট এই নীতি অনুযায়ী দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়া প্রদেশবাসীদের এজন্যে স্টেটের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং আমাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারকে উন্নত করবার দিকে মন দিতে হবে।

মোরাভিয়া প্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত। অর্থসচিব ঘাটতি বাজেট বন্ধ করবার যতই চেষ্টা করুন, যে প্রদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশি, সেইগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার না করলে দেশের বাজেটে ঘাটতি বন্ধ করা যাবে না। কতকগুলি ট্যাক্স এখন স্টেট আদায় করেন -এই আদায়ী ট্যাক্সের শতকরা কিছু অংশ আমাদের প্রদেশের হাতে না এলেও বাজেটে ঘাটতি বন্ধ হতে পারে না। এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদের প্রয়োজন হবে না প্রতিবৎসর—যদি উভয়পক্ষ মিলে সেই শতকরা হারটা নির্ধারিত করে ফেলা যায়। ঝগড়া-বিবাদ করে কোন সময়েই লাভ নেই। প্রদেশগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবার চেষ্টা করুক।

আমি অনেকবার বলেছি স্টেটের তহবিল থেকে ভিক্ষা চাওয়া প্রদেশের কর্তব্য নয়, এতে প্রদেশগুলি চিরকাল স্টেটের মুখাপেক্ষী থাকবে। স্টেটের সাহায্য ভিন্ন প্রদেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার উপায় নেই স্বীকার করি। এর জন্যে যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন, প্রাদেশিক তহবিলে সে টাকা নেই।

১৯৩০ সালের বাজেটে প্রাদেশিক রাজস্বের পরিমাণ ৩ কোটি মুদ্রা। এ টাকার পরিমাণ নিতান্তই কম, স্টেট্ ও প্রদেশের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হ'লে এই টাকার অংক বৃদ্ধি পাবে, অধিবাসীদের অবস্থা আরও সচ্ছল হবে, তাদের আয় বৃদ্ধি হ'লে স্টেটের আয়ও বাড়বে।

অনেক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তারা নিতান্ত দরিদ্র, নিজেরা স্কুল করতে পারে না। সেই গ্রামের আয় থেকে সেখানে স্কুল হওয়া সম্ভব নয়।

আমি একটা গ্রামের কথা জানি। জারোশ্লোভিস্ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেখানে স্কুল নেই। ছাত্রছাত্রীরা তিন মাইল দূরবর্তী একটা স্কুলে যায়। ৮০ জন ছাত্র এ গ্রাম থেকে যায়- তাদের জন্যে আপাতত দু'টি ক্লাস খুললেই চলে—তারপর ছাত্রসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সংগে ক্লাসের সংখ্যা বাড়ালেই চলত।

এই গ্রামের আয় বার্ষিক ২৭০০ ক্রাউন। তারা ১৯,০০০ ক্রাউন মূলধন নিয়ে স্কুলের জন্যে বাড়ি সুরু করে দিলে। তাদের চেয়ারম্যান বা কোন সভা বা গ্রামের কোন অধিবাসী এধরণের বাড়ি জীবনে কোন দিন তৈরি করে নি—তাদের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব।

তিনটি শ্রেণী থাকবে এমন স্কুলের জন্য তারা ২৫৭,০০০ ক্রাউন বরাদ্দ করেছিল, গৃহনির্মাণ শেষ হ'লে দেখা গেল খরচ পড়েছে ৫২৬,০০০ ক্রাউন।

এই টাকাটা দেবে কে? গ্রামের সামান্য আয় থেকে এ টাকা দেওয়া চলে না—সুতরাং প্রাদেশিক ও স্টেটের সাহায্য নিতেই হবে। অথচ এই খরচ একটি গ্রামকে দিতে গিয়ে আরও তিনটি গ্রাম বিদ্যালয়শূন্য করে রাখতে হচ্ছে।

অনভিজ্ঞতার এই বিষময় ফল। ২০০ বছর ধরে চেষ্টা করেও জারোশ্লোভিস্ গ্রাম স্টেটের এই দেনা শোধ করতে পারবে না, অথচ অন্য তিনটি গ্রাম স্টেটের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হ'ল এদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে।

অথচ আমরা যদি হাত গুটিয়ে থাকি, তবে দেশে স্কুল হয় না, সুতরাং এ ক্ষতি আমাদের সহ্য করতেই হবে, উপায় নেই। আমার মনে হয় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়-গৃহের কতকগুলি নক্সা ও তাদের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা তৈরি করে রাখুন। অধিবাসিগণ এ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারবেন।

জিলন্ সহরে আমরা যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছি, সে ধরণের স্কুলের ব্যয় ৪০,০০০ ক্রাউন। এতে একটি মাত্র শ্রেণী থাকবে। আর একটি শ্রেণী বাড়ালে বাড়তি খরচ হবে ৩৬,০০০ ক্রাউন।

জারোশ্লোভিস্ গ্রামের লোকে যদি এই স্কুল-গৃহের নক্সা ও ব্যয়ের হিসাব আগে থেকে জানত, তবে ৭৬,০০০ ক্রাউনের মধ্যে তাদের স্কুলবাড়ি তৈরি হয়ে যেত—প্রিন্সিপ্যালের আবাসগৃহ সমেত বড় জোর ১১৪,০০০ ক্রাউন খরচ পড়ত।

আমরা এধরণের স্কুলের ১০০টি নক্সা প্রাদেশিক আপিসগুলিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। টাকার চেয়েও প্ল্যান ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব অধিকতর প্রয়োজনীয়। অনেক অযথা খরচের হাত থেকে তা হ'লে উদ্ধার পাওয়া যায়। দু'বৎসরে জারোশ্লোভিস্ গ্রামকে ঋণের সুদ বাবদ দিতে হবে ৫০,০০০-৭০,০০০ ক্রাউন, এই টাকাতে প্রিন্সিপ্যালের বাড়িশুদ্ধ স্কুল হয়ে যেত তাদের। অনভিজ্ঞতার দরুন এই অযথা ক্ষতি তাদের সহ্য করতে হ'ল।

আমরা এই নক্সা যখন বিশেষজ্ঞদের দেখালাম, তারা বললে, আমেরিকাতে এ ধরণের স্কুলের

চলন অনেক আগেই হয়েছিল। সব বিভাগেই বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রয়োজন আছে।

প্রাদেশিক বোর্ডের গত সভায় ভূতপূর্ব পরিচালকবর্গ যখন এই প্রদেশের গ্রামগুলিতে টেলিফোন বসাবার একটা কর্মপ্রণালী ছ'মাসের মধ্যে প্রস্তুত করে দাখিল করবার প্রস্তাব তুললেন—তখন আমার মনে আর কোন দুঃখ ছিল না।

এ ধরণের কর্মতালিকা নানা বিষয়ে প্রস্তুত করার আবশ্যক আছে, যেমন—ড্রেন, হাসপাতাল তৈরি, নদীর গতি পরিচালনা করা ইত্যাদি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি এবং অধিকতর মাল উৎপাদনও হওয়া আবশ্যক। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত এই সংগে হওয়া ব্যবসার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু সকলের উচিত জনসাধারণের মধ্যকার সুপ্ত চেতনার ও শক্তির উদ্বোধন করা—উদ্বুদ্ধ নব জাগরিত শক্তিই দেশকে সমৃদ্ধি ও মংগলের পথে নিয়ে যাবে। গ্রামগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক, স্বাধীন ইউনিয়নগুলির সৃষ্টি দ্বারা স্টেটের তহবিল থেকে দেনার বোঝা অনেকটা কমে যাবে—দুর্বল গ্রামগুলি স্টেট্ থেকে বেশি পরিমাণ সাহায্য পাবে।

আমাদের মধ্যে ঝগড়া-দ্বন্দ্বের অবসান এভাবে ঘটবে, আজকাল যেমন প্রত্যেকেই কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় ঘোরে, তখন প্রত্যেকেই নিজের শ্রমের ফলভোগ করবে বলে ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করবে।

নাগরিকগণের আত্মসম্মানের মূল্য

(জেলা-শিক্ষক সম্মেলনে বাটার প্রদত্ত বক্তৃতা—১৫-১১-১৯৩০)

একটি জিনিসের প্রচলন আমাদের মধ্যে আদৌ হয় নি, সেটি আত্মসম্মান। অর্থের অপেক্ষাও আত্মসম্মানেব মূল্য অনেক বেশি।

আত্মসম্মান জিনিসটা যদি দেশে না চলে—তবে দেশে কোন প্রকার উন্নতির সম্ভাবনা নেই। প্রাদেশিক বোর্ডের গত সভায় কর্তৃপক্ষ ধার্য করেন ব্যাঙ্কের নিকট ২॥৹ কোটি টাকা ধার করতে হবে। আমি তখন বলি প্রদেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে পাঁচ পার্সেণ্ট্ সুদে টাকা ধার নেওয়া হ'ক।

জিলন্ সহরের প্রত্যেক অধিবাসী প্রাদেশিক ঋণের কাগজ কিনতে রাজি আছে—এতে অনাবশ্যক সুদ দেওয়ার হাত থেকে প্রাদেশিক বোর্ড রক্ষা পাবে।

আমাদের ব্যাঙ্কারদের ছাত্র হয়ে শিখতে হবে, শিক্ষক হয়ে শেখাতে হবে। মহাজনদের কাছে হাত পাতার মানে আত্মসম্মানের কিছু অংশ তাদের কাছে বিক্রী করা। যেদিন মহাজন ও অধিবাসীবর্গ উভয়েই এই আত্মসম্মানের মূল্য দিতে শিখবে, সে দিন মহাজনেরা কম সুদে সন্তুষ্ট থাকবে, অধিবাসিগণ টাকা ধার করতে হাত পাতবে না।

এই টাকা বিদ্যালয় বাবদ খরচ করতে হবে সকলের আগে। দেশপ্রেম অল্প বয়স থেকেই শিক্ষা দেওয়া দরকার—প্রত্যেক শিক্ষক যেন মনে রাখেন প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছাত্রদের। ছাত্রেরা তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের থেকে প্রদেশের ঋণের কাগজ যাতে কিছু কিছু কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা করা চাই।

ছাত্রদের পক্ষে ২॥৹ কোটি টাকা ঋণদান সম্ভব নয় জানি, ঋণদান করলে প্রাদেশিক অর্থনীতি সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা জন্মাবে। তারা তাদের পিতামাতাকে বলতে পারে তাদেব প্রদেশের অধিবাসিগণ বৎসরে দেড় কোটি থেকে দু' কোটি ক্রাউন বাঁচাতে পারে—যদি তারা এভাবে ঋণদান করে প্রাদেশিক বোর্ডকে।

প্রথম বৎসরেই আমাদের বাঁচবে ১৫,০০০,০০০ ক্রাউন, যদি আত্মসম্মানরূপ মুদ্রার আমরা প্রচলন করি দেশে। এর টাঁকশাল হবে অধিবাসীদের মন এই কার্যের সাফল্যের ওপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করছে।

জিলন্ সহর ও আশপাশের লোক আমরা দৈনিক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত কে যে আমাদের প্রদেশদ্বয় শাসন করে এর সুব্যবস্থা করে সে বিষয়ে কোন খবরই রাখে না প্রদেশদ্বয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি যে একটি মাত্র ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফল এ সব ভেবে দেখবার অবসরও অনেকের নেই।

আমরা অনেকে ভাবি না যে এর মূল্য আমাদের দিতে হবে কিন্তু এর মূল্য অর্থ দ্বারা দেওয়া যায় না দিতে হবে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বার্থত্যাগে। দৈনিক ৮ ঘণ্টা খাটলে বড় বড় লোকদের চলে না এদের পরিশ্রমের ওপর আমাদের নিরাপত্তা উন্নতি সমৃদ্ধি সব কিছুই নির্ভর করছে। কাজেই তাদের শুধু ৮ ঘণ্টা খেটে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

এই জ্ঞান ও শিক্ষা প্রত্যেক স্কুলে ছড়িয়ে দিতে হবে সেখান থেকে তা যেন ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেক নাগরিকের মনে। বড়লোকদের খাটুনির মূল্য আমরা অর্থে না দিতে পারি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দ্বারা যেন দিই।

আমাদের প্রেসিডেন্ট মাসারিকের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি গতবারে। তাঁর কাছে আমাদের বিপুল ঋণভারের এক কণাও তাতে শোধ হয় নি। আমরা কিস্তিতে কিস্তিতে এই মূল্য শোধ করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু শুধু আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট নন আরও অনেক লোক আছেন যাঁদের ঋণের এখনও আমরা এক কিস্তিও শোধ করি নি।

মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়ায় প্রাদেশিক সভাপতি মিঃ জ্যান সার্নি এবং জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ জার্নস্টিক আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। প্রেসিডেন্ট সার্নি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন এবং আমরা আশা করি অনেক দিন আমাদের মধ্যে থেকে তাঁর সততা ঔদার্য ও কর্মকুশলতা দ্বারা দেশের সেবা করে প্রদেশের তাবৎ অধিবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হবেন।

এর মূল্য অর্থে নির্ধারণ করা যায় না—কোন দিন যাবেও না। এই ভালবাসা মাতৃভূমিকেও স্বর্গ করে তোলে। মানুষের কর্মশক্তি এর দ্বারা বর্ধিত হয়। এর দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়।

যুদ্ধের পরে আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক দুর্দশা সুরু হয়েছে, তা যদি দূর করতে হয়, তবে অসাধ্য সাধনই করতে হবে। জমির উৎপাদিকা শক্তিকে আরও বাড়াতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি টেলিফোন বসাতে হবে—জীবনকে বর্ধিতভাবে ভোগ করবার সুযোগ দিতে হবে অতি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীকেও।

পর্বত থেকে নির্মল জল সরবরাহ করতে হবে ড্রেন দ্বারা, নদীগুলিতে নৌকা চলাচলের সুব্যবস্থা যাতে হয় তা করতে হবে জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করতে হবে। রাস্তা ও রেলপথ সর্বত্র তৈরি করতে হবে।

এজন্যে অর্থের অপ্রতুলতা নেই আমাদের। চাই শুধু স্বার্থত্যাগী কর্ণধার। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে বটে কিন্তু সে টাকা দশগুণ হয়ে আবার আমাদের ঘরেই ফিরে আসবে।

মোরাভিয়া প্রদেশে জলের সুবন্দোবস্ত

১৯৩০ সালে চেকোশ্লোভাক গবর্ণমেণ্ট একটি নতুন আইন দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশে জল সরবরাহের একটি পরিকল্পনা করেন। টমাস বাটা এই প্রস্তাবগুলি আলোচনাকালে দেখলেন যে, মোরাভিয়া প্রদেশকে এই পরিকল্পনাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাত্র ৪০ লক্ষ ক্রাউন মঞ্জুর করা হয়েচে এর জল সরবরাহের জন্য।

তিনি দেখলেন এর কারণ আর কিছুই নয়, প্রাদেশিক বোর্ডের সভ্যদের পরস্পরের মতের অনৈক্য এবং যোগ্য পরিকল্পনার অভাব। তখন তিনি বিশেষ চেষ্টা করলেন যাতে আরও কিছু বেশি টাকা মঞ্জুর হয় তাঁর প্রদেশের জন্যে।

সেই সপ্তাহেই তিনি সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও দেশনেতাদের এক কনফারেন্স আহ্বান করলেন এবং রাত্রি-দিন-ব্যাপী আলোচনা, বিতর্ক, হিসাব, আঁকজোঁক, অধ্যয়ন ইত্যাদির দ্বারা একটা মতলব খাড়া করলেন। দেশের প্রধান নদী মোরাভার গতি বিমান থেকে পর্যবেক্ষণ করা হ'ল, যে যে উপায় অবলম্বন করলে এই নদীতে নৌকা চলাচল করানো যায়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হ'ল নদীর গতির ম্যাপ তৈরি হ'ল। নদীতীরবর্তী কৃষকগণের সঙ্গে বহু পরামর্শ করা হ'ল এসব নিয়ে।

এ সবের পরে বাটা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে একটি কারখানা ও নদীর বাঁধ তৈরি সুরু করলেন। কিছুকাল পরে বন্যার গৈরিক জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠে তাঁর ঘরবাড়ি, বাঁধ ও কারখানা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে। এত বৎসরের পরিশ্রম বুঝি একদণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়!

বাঁধের ওপরটা তখন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত হয়ে গিয়েচে। বাটা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই উঁচু জায়গাটুকুতে নিকটবর্তী বন থেকে হাজার হাজার খরগোস জড় হয়ে বন্যার জল থেকে আত্মরক্ষা করচে।

তিনি বললেন, "চিরকাল আমাদের দেশের মানুষ বন্যার জলের সামনে এই খরগোসদের মত পালিয়েচে বলেই মোরাভা নদীতে নৌকা চলে নি, মোরাভিয়াতে জলের সুব্যবস্থা হয় নি, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের সুব্যবস্থা হয় নি। আমি অন্তত তা করবো না। আমায় লড়তে হবে এর বিরুদ্ধে। যা নষ্ট হয়েচে হোক—আমরা আবার আরম্ভ করি।"

আজকাল সেখানে প্রকাণ্ড বাঁধ আর কারখানা হয়েচে, মোরাভা নদীতে আর বন্যার ভয় নেই, ২০,০০০ হাজার লোক সেই কারখানায় কাজ করে আজ।

মোরাভিয়ার অধিবাসিগণ!

আমাদের জীবনকে আমরা সমৃদ্ধতর করতে চাই, এর চেয়ে ন্যায্য দাবী আর কি থাকতে পারে মানুষের? কৃষকদের শ্রম লাঘব করে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো যায় কি ভাবে? প্রদেশস্থ গ্রামগুলির স্বাস্থ্য কিভাবে ভাল করা যায়?

আমাদের কর্তব্য এই সমস্যাগুলির সুসমাধান করা। কিন্তু প্রথমে চাই শৃঙ্খলা ও সংযম—আমাদের পরস্পরের ঐক্য।

দেশের ম্যাপ দেখলেই বোঝা যাবে প্রকৃতি এবং আমাদের বিগত দিনের রাজনৈতিক পুরুষগণের অনুগ্রহ ও দূরদর্শিতার ফলে একটি বড় নদীর ধারে আমাদের প্রদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েচে। এই নদীর

সঙ্গে আন্তর্জাতিক নদী ডানিয়ুবের যোগ রয়েছে, আমাদের অধিকার রয়েছে ডানিয়ুব নদী দিয়ে নৌকা চালিয়ে বিভিন্ন দেশে এবং অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে পড়বার।

অতএব মোরাভা নদী আমাদের দেশের পক্ষে কত দরকারী, এ থেকে বোঝা যাবে, কিন্তু আমরা ভগবৎদত্ত এই সম্পদ অবহেলা করে এসেচি এতকাল। দক্ষিণ দিকে বিমানপথে গেলে দেখা যাবে ম্যামথদের যুগে যেমন ছিল নদীর অবস্থা এখনও তেমনি। অন্য দেশ হ'লে নদীতীরে বড় কারখানা, সুস্থ ও ধনী অধিবাসিগণ উন্নত ধরণের সহর থাকতো -আমাদের এখানে শুধু রোগ আর দারিদ্র্য ছাড়া আর কি আছে? নদী থেকে দূরে পাহাড়ের ওপর দরিদ্র পল্লীবাসীদের শ্রীহীন কুটীরশ্রেণী। দু'একটা ছোটখাট কারখানা, তাও সে সব স্থানে জলের একান্ত অভাব, গভীর কূপ ভিন্ন জল পাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মকালে কূপগুলি শুকিয়ে যায়, এ থেকে টাইফয়েড ও অন্যান্য রোগের সূত্রপাত। হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর টাইফয়েড জ্বরে মারা পড়ে।

কয়েকটি জেলার কথা বলি। হোডোনিন অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় জলে ঘেরা থাকে, জলকাদার মধ্যে দিয়ে গরুবাছুর পর্য্যন্ত মাঠে যেতে পারে না। মশার ঝাঁক ওড়ে মেঘের মত জঙ্গলের পশু পর্য্যন্ত মশার কামড়ে মারা পড়ে। এই সুসভ্য ইউরোপের মধ্যে হোডোনিন জ্বর বলে এক বিষম জ্বরের প্রাদুর্ভাব সম্ভব হয়েচে বিংশ শতাব্দীতেও।

জমিতে ফসল জন্মায় না। এ সব দোষ কাদের? আমাদেরই।

পূর্বে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দিনে ভিয়েনার পার্লামেণ্ট আল্পসের রেলপথ তৈরি করার জন্যে চেক্ ও মোরাভিয়ান সভ্যদের সম্মতি গ্রহণ করেন। ইটালির বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ করবার জন্যে এই রেলপথের প্রয়োজন হয়েছিল।

উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ায় মূল্যস্বরূপ চেক প্রতিনিধিগণ তাঁদের দেশের নৌকা চলাচলের সুবিধা দাবী করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা সে অধিকার প্রাপ্ত হন। নদীর বাঁধ কৃষকদের সুবিধা অনুযায়ী নির্মিত হয়। চেক কৃষকেরা এখন বন্যার ভয় না করে নদীর ধারেই বাড়িঘর তৈরি করাতে পারে অল্প খুঁড়লেই জল পায়।

কিন্তু মোরাভিয়ার প্রতিনিধিদল ভিয়েনার পার্লামেণ্ট থেকে ওড্রা ডানিয়ুব খাল খননের প্রতিশ্রুতি পেয়েই মহা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কিন্তু সে খাল খনন কোন দিন বাস্তবতায় পরিণত হ'ল না হবেও না (কোন দিন)। নদীগুলি অযত্নে নষ্ট হতে বসেচে পূর্বে ডাঃ সাইলেনির চেষ্টায় সামান্য কিছু উন্নতি হয়েছিল—এখন আবার ধ্বংসের পথে চলেচে।

স্টেট্ বাজেটে আমাদের প্রদেশের জলপথগুলির বিষয়ে খুব কম টাকা ধার্য করা আছে। ডানিয়ুব ওড্রা খাল অধিবাসিগণ বা প্রাদেশিক ব্যবসায়িগণের চেষ্টায় খনিত হ'ক স্টেটের এই রকম ইচ্ছা।

স্টেট্ আমাদের প্রদেশের জন্যে ৪ মিলিয়ার্ড ক্রাউন মঞ্জুর করেচে। বিভিন্ন নদীর খাল খননের কার্যে এ টাকা ব্যয়িত হবে, দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্যে এই খালগুলি ব্যবহৃত হবে। যেমন এল্‌ব্ নদীর উজান দিকের অংশ সাজাগ নদী ইত্যাদি।

এ সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই কিন্তু মোরাভিয়া প্রদেশের প্রতি এতদ্দ্বারা কোন সুবিচার করা হয় নি। আমাদের প্রদেশের পক্ষে যা অতীব প্রয়োজনীয় সে সব ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি, বা তার জন্যে খুব সামান্য টাকা মঞ্জুর করা হয়েচে।

মোরাভা নদীর সমস্যা শুধু আমাদের প্রদেশের সমস্যা এটা সমগ্র দেশের সমস্যা—সমগ্র স্টেটের সমস্যা। এক হিসাবে একে ইউরোপের সমস্যাও বলা চলে।

কারণ মোরাভা নদী দ্বারা চলাচলের পথ আমাদিগকে তিনটি বড় ইউরোপীয় নদীর সহিত সংযুক্ত করবে এল্ব্, ডানিয়ুব, ওড্রা এবং দুইটি সমুদ্রের সঙ্গে খালের পথে যোগাযোগ।

আমরা স্টেট্‌কে ভুল বোঝাতে চাই না। মোরাভা নদীকে ব্যবহারযোগ্য করতে হ'লে অর্থব্যয় হবে অনেক বেশি, লাভ বেশি হবে না। 'জলপথ তহবিল' থেকে এ টাকাটা ব্যয় হয় এই আমাদের ইচ্ছা যেমন চেক প্রদেশে আছে।

এ থেকে যথেষ্ট লাভের আশা করা যায় তবে এ ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ। নদীপথে চলাচলের সুবিধা থাকলে দেশের শিল্প বাণিজ্যের সুবিধা, জমির উৎপাদিকা শক্তি এ দ্বারা বাড়বে, নদীর ধারে গ্রাম ও সহরগুলির শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হবে। আমরা এখনও রেলপথকেই চলাচলের প্রধান উপায় বলে ভাবি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত, এ প্রদেশের নদীগুলিকে নৌকা যাতায়াতের উপযোগী করা বিশেষ প্রয়োজন। বাঁধ বাঁধাই খাল কাটা, স্লুস বসানো প্রভৃতির খরচ নৌকো যাতায়াতের ট্যাক্স থেকে উঠবে না একথা সত্য। কিন্তু নদীগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করবার উদ্দেশ্য না থাকলেও বাঁধ বাঁধা, খাল কাটান ইত্যাদি করতেই হবে। লোককে ফাঁকি দেওয়া যত সহজ জীবনের সব প্রয়োজন মেটানো তত সহজ নয়।

আমাদের মোরাভিয়ার অধিবাসীদের এই প্রকৃত অবস্থা। শাসনে আমাদের অনেক ভাবনে যা আমাদের কি কি দরকার তা ঠিক করে দেবে এ জিনিসটা আমরা আশা করতে পারি কি?

খালের আশা ছেড়ে দিতে হবে আপাতত এক সময় ভিয়েনা গবর্ণমেণ্ট এই বলে আমাদের ভুলিয়েছিলো। ওসবের দরকার নেই আমাদের। দেশের মধ্যে জলপথ প্রসারিত হ'ক এই আমরা চাই। যার দ্বারা কৃষককুল উপকৃত হবে কারখানার মজুরও উপকৃত হবে একাধারে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভবপর হবে।

একজন বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ইংগ.স্মেচ্‌ক্ 'মোরাভিয়ায় জলপথে যাতায়াত' বলে একখানা পুস্তিকায় নির্দেশ করেছেন যে মোরাভা নদী নৌকা যাতায়াতের উপযোগী হ'লে দেশে আর বন্যা হবে না। ১০০০ টনের নৌকা নদীপথে চলতে পারবে। নদীর উভয় পাশের মাঠগুলি নাইশাটি স্লুস দ্বারা জলসিঞ্চিত হবে। নদীর ধারেই কারখানা বসতে পারবে।

মোরাভা নদীকে নৌকা চলাচলের উপযোগী করলে আমাদের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক ভাল হয়ে যাবে। মোরাভা ও ওড্রা নদীর খাল খনন করবার উপযুক্ত মূলধন আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো। লোহিত সমুদ্রের সঙ্গে বাল্‌টিক সমুদ্রের সংযোগ সাধিত হবে এই খালের দ্বারা। এল্‌ব ও মোরাভা নদীদ্বয় এ দ্বারা যুক্ত হবে, ডানিয়ুব ও ওড্রা নদীর সঙ্গে উত্তর সাগরের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এ দ্বারা টাকা ব্যয় হবে বটে কিন্তু উত্তর পশ্চিমের সহরগুলির মঙ্গল সাধিত হবে, ওস্ত্রাভা খনি অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে।

অতএব:-

(১) নদীগুলির ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় বিভাগের পুনর্গঠন করা হ'ক।

(২) এই বিভাগের ভার এমন লোকজনের হাতে দেওয়া হ'ক যারা শীতকালে আমাদের প্রদেশের জলপথের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবে।

(৩) মোরাভিয়া প্রদেশকে 'পূর্তবিভাগ ও জলসরবরাহ তহবিল' এর মন্ত্রীর অধীনে রাখা হ'ক।

(৪) জলসরবরাহের তহবিলে আগামী দশবৎসরের জন্য অতিরিক্ত দশলক্ষ ক্রাউন ব্যবস্থা করা হ'ক।

পথ প্রদর্শক

৫০ বৎসর পূর্বে একটি রেল স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ১৬ বছরের একটি ছেলে ঘুমিয়েছিল। তার একটি হাত ছিল তার লগেজের ওপর, একটি হাত তার পকেটে ছিল পকেটে ছিল হিজি বিজি টোকা নোট বই।

একজন রেলের কুলি চুল্লিতে কয়লা দিতে ঘরে ঢুকলো। ছেলেটি তার নোট বইতে হাত দিয়ে সাবধান করলে সেইটি তার দু' সপ্তাহ ব্যাপী ভ্রমণের ফল জিলন্ থেকে অজ্ঞাত প্রাহা সহরে সে গিয়েছিল তার বাপের দোকানের জন্যে অর্ডার যোগাড় করতে। এই অর্ডার থেকে কাজ যোগাড় হবে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করচে তার ওপর।

কোনভাবে ভ্রমণের সময় বাটা বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিলেন তা বলা খুব শক্ত। যেবার ষোল বৎসর বয়সে অতি দরিদ্র অবস্থায় প্রাহা নগরে অর্ডার যোগাড় করতে গিয়েছিলেন সেবার না ৫৬ বছর বয়সে রাজার মত ঐশ্বর্যশালী অবস্থায় নিজের এরোপ্লেনে ভারতবর্ষ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সে সময়ে? যৌবনাবস্থায় যখন তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন বা জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের যানবাহনে হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন তখনও তাঁর মনে প্রাণে ছিল বালকের মত উৎসাহ ও আনন্দ। সেই একই শক্তি তাঁকে ১৯৩১ সালের শীতকালে তিন-ইঞ্জিন যুক্ত প্লেনে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল।

গতির প্রতি আসক্তি ছিল তাঁর, নব নব পথে তাঁর গতি জীবনের ও কর্মের বহু ধারা বেয়ে চলে এসেচে চিরদিন। যাঁরা তার কর্মশক্তির ও সহনশীলতার কোন খবর রাখতো না তারা বলতো বাটা তাঁর জীবনে যা কিছু করেচেন, সবই দৈবের সাহায্যে। কিন্তু বাটাকে যারা জানতো, তারা একথা বলবে না। যখনই কোন ঘটনা উপস্থিত হয়েচে বাটা বহু বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে ঘটনাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা পেতেন। তিনি বলতেন 'আমি সহজে কিছুই পাই নি, যা কিছু লাভ করেচি জগতে, বহু সংগ্রাম করে লাভ করতে হয়েচে সেটা। সহজে কোন জিনিস হয় না। এত লোকে সাফল্যের পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে কিন্তু পথ পায় না।'

পুরাতন কালের ভাইকিং ও মহাদেশের আবিষ্কারকদের মধ্যে এই বীর্য ছিল যখন তারা আদিম অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে নব নব দেশ আবিষ্কারে যাত্রা করেন।

টমাস বাটা যথেষ্ট বেড়িয়েছিলেন কেবল যান নি অস্ট্রেলিয়াতে—ভ্রমণ শুধু তাঁর আনন্দের উপাদান ছিল না—তিনি অনেক শিক্ষা করতেন মানবচরিত্র অধ্যয়ন করতেন ব্যবসায়ের অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করতেন।

বহুদেশ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসে তাঁর জন্মভূমি সেই ক্ষুদ্র পার্বত্য-পল্লীতে সমস্ত অভিজ্ঞতার ফল কাজে লাগাতেন, যার ফলে সমগ্র জগৎ সেই গ্রামটিকে শ্রেষ্ঠ পাদুকা-নির্মাণ-কেন্দ্র বলে চিনেছিল। মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতেও সেই একই সাহস তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। "আমরা পথপ্রদর্শক। কাপুরুষ ও দুর্বল ব্যক্তিদের কাজ নয়, আমাদের সঙ্গে তাল রেখে পথ চলা।"

এই ছিল তাঁর বাণী।

আধ্যাত্মিক ও মানসিক ক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রাম বাইবেলের জেকবের স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জেকব স্বর্গদূতের হাত ধরে টানাটানি করে বলচেন, "কোথায় যাবে তুমি? যতক্ষণ না আমায় বরদান করবে, ততক্ষণ তোমায় যেতে দেবো না।"

কঠোর আত্মসংযম ও লৌহবৎ অনমণীয় ইচ্ছাশক্তি ছিল তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ। এই ছিল তাঁর সারা জীবনের কর্মের পুরস্কার।

জাহাজে যাপিত দিনগুলি

(১৯২৫ সালে টমাস বাটার প্রথম ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে লিখিত)

মানুষ হয়ে জন্মানোর মধ্যে আমোদ আছে। জাহাজে কয়েকশত লোক আছে পুরুষ নারী ছেলেমেয়ে। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, সকলের মুখেই হাসি সকলেই সকলের সঙ্গে মিশবার জন্যে ব্যগ্র। এতটুকু মনোমালিন্য কারো মধ্যে নেই।

যদি কেউ তোমার গায়ে ধাক্কা মারে, সে তখনি তোমার মার্জনা ভিক্ষা করবে, যেন সে কত অপরাধ করে ফেলেচে। তা বলে গতি সকলেরই বাধাশূন্য সকলেই হাসচে খেলচে। ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে বেশি।

নারীদের সঙ্গে পুরুষদের ব্যবহার অতি সুন্দর। নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্যমূলক ব্যবহার চোখে পড়ে না।

জাহাজে একটি সাঁতার দেবার স্থান ছিল। ভারত মহাসমুদ্রে গ্রীষ্মের দিনে যাত্রীরা এখানে মেয়েপুরুষ একত্র মিলে সাঁতার দিয়ে আমোদ করত--কিন্তু কেউ কখনো আকার ঈঙ্গিতেও কোন অভদ্রতা প্রকাশ করে নি।

মেয়েরাও সম্পূর্ণ সচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে পারে এজন্যে। তারা সামাজিক আমোদ-প্রমোদে নিঃসন্দিগ্ধভাবে যোগ দেয়। প্রাচ্য দেশের মেয়েরা চারটি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, সমাজে মিশবার সুবিধা পায় না- তাদের সঙ্গে কি বিষম পার্থক্য এদের। সামাজিক রীতিনীতি মানুষকে অবাধভাবে বিচরণ করতে সুযোগ দেয় সমাজে, জীবনকে বিস্তৃতভাবে ভোগ করবার সুবিধা এনে দেয়।

সুয়েজ খাল

বড় একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু কত সহজ! এটা বার বার কাটার দরকার হয়েছিল—আমাদের সাধারণতন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়দার কলের খালের কাজ করতেও এর চেয়ে অনেক বেশি ভাবতে হয়েচে। প্রথম সুয়েজ খাল দিয়ে যাবার সময় মানুষের মনে অদ্ভুত অনুভূতি জাগে।

সুয়েজ খালের প্রস্থ মোরাভা নদীর দ্বিগুণ। জাহাজে যেতে ১৮ ঘণ্টা লাগে। খালের চারিধারে মরুভূমি, একজায়গায় সামান্য কয়েকটি সবুজ গাছপালা আছে, আপার ইজিপ্ট থেকে খাল কেটে জল আনবার ফলে এ সম্ভব হয়েচে। খালের দু'ধারে রেলপথ ও বাড়ি, উষ্ট্রারোহী সার্থবাহ চলেচে, এই অঞ্চলের সমগ্র ব্যবসায় যেন এখানে কেন্দ্রীভূত হয়েচে। ধীরগামী উষ্ট্রদল অতীব কৌতূহলজনক দৃশ্য বিশেষতঃ যারা কখনো এদৃশ্য দেখে নি, তাদের পক্ষে।

সে অঞ্চলের মানুষ ও তাদের সরল জীবনযাত্রাপ্রণালী আরও কৌতূহলজনক। নারীদের অবস্থা কিন্তু খারাপ। ওদের দু'টি বন্ধু, শত্রু, সূর্য ও তাদের সংকীর্ণ মন। এই ভীষণ গরমে তারা আপাদ মস্তক কৃষ্ণপরিচ্ছদে আবৃত করে চলাফেরা করে।

যখন সার্থবাহদল উটের দল থামিয়ে উটদের স্বল্প ছায়ায় বিশ্রাম করে, তখন তাদের কষ্ট বেশ বুঝতে পারা যায়—মানুষের চেয়ে পশুর দল কম কষ্ট ভোগ করে—কারণ তাদের গায়ের পুরু লোম বাতাসে আন্দোলিত হয়।

অপরের বাড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বহু খুঁত বের করা যায়—নিজের বাড়িতে এক বৎসরেও তত খুঁত চোখে পড়ে না। অপরের দোষ ধরবার সময় আমরা যেন মাঝে মাঝে নিজেদের বেকুবির কথা চিন্তা করি।

আমরা সারা দুনিয়া ঘুরে কি করে ভাল জুতো তৈরি করা যায় সে কথা ভাবি, কিন্তু আমার গৃহস্থালী ভালভাবে কি করে চলবে, আমাদের মেয়েরা কি করে শিক্ষা পাবে—এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা না ঘামিয়ে আমাদের দিদিমাদের ওপর তার ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। সম্প্রতি আমাদের সংবাদপত্রে আন্দোলন চলছিল যে সিনেমাতে হুাদিস্ত্ সহরের একটি স্ত্রীলোক ও তার ছেলেমেয়ের ছবি উঠেছিল—আমেরিকার সবাই ভেবেছিল হুাদিস্ত্ সহর সুয়েজ খালের নিকটে কোথাও অবস্থিত।

শুধু নারীদের নয়, আমাদের পুরুষদের অবস্থাও তথৈবচ। যদি কোন আমেরিকান আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে এসে বিদ্যালয় গৃহের চটকে না ভুলে ক্লাসগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে শিক্ষাদানের উপকরণগুলির স্বল্পতা দেখে অবাক হয়ে যাবে।

আমরা দোষটা অর্বাশ্য স্টেটের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবো—স্টেট্ এজন্যে দায়ী। মোরাভিয়া প্রদেশের মেয়রদের এক সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে স্টেট্ গ্রাম ও নগরগুলির শিক্ষার দায়িত্ব তো গ্রহণ করবেই, এমন কি ছোটখাটো অনেক দায়িত্বই গ্রহণ করবে। কিন্তু একটি গ্রামে গিয়ে যদি কেউ অনুসন্ধান নিয়ে দেখে, তবে সে বুঝতে পারবে গ্রামগুলির দারিদ্র্যের ওজুহাত মিথ্যে। মদে কত পয়সা ওড়ে প্রতি মাসে সে হিসেবটা যেন তারা নেয়।

স্কুলগুলিতে ছেলেরা যায় শুধু সার্টিফিকেট্ যোগাড় করবার জন্যে। যাতে স্টেটের চাকরি জোটে। আমাদের জিলন্ সহরে আমরা এ রকম চাই না। সার্টিফিকেট্ আমাদের কি হবে? আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করুক জীবনে, তাড়াতাড়ি ভাবতে শিখুক, তাড়াতাড়ি রোজগার করতে শিখুক—স্টেটের ওপর নিজেদের জীবিকার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে না, মদ খেয়ে সরাইখানায় হল্লা করবে না, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে না—সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার স্টেটের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবে না।

ডাচ্ কৃষক

আমরা ডাচ্ বন্ধুগণের সঙ্গে সম্মিলিত হতে সেদিন পারি নি—কারণ তাঁরা রবিবারে ব্যবসায়ের কথা বলতে চান নি। আমি তাঁদের একদিন পল্লীগ্রামে এক কৃষকের বাড়িতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলাম।

ডাচ্পল্লীর সর্বত্র লক্ষ্য করেচি সুন্দর চাষের জমি, হৃষ্টপুষ্ট, সযত্নলালিত গরুবাছুর। ওদের উন্নত কৃষিপ্রণালীর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবার আগ্রহে আমি গেলাম আমস্টার্ডমের নিকটে এক পল্লীগ্রামে। আমরা একটি কৃষকের আবাসবাটির প্রাঙ্গনে ঢুকে দেখি বাড়ির কর্তা কাঠের জুতো পায়ে দিয়ে জলের টব হাতে কোথায় যাচ্ছে। আমাদের দেখে সে আমাদের নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল। যাবার আগে কাঠের জুতো জোড়া সে পা থেকে খুলে ফেললে, পায়ে রইল শুধু পশমের মোজা। কৃষক তার স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা, দেখে মনে হয় না আমাদের দেশের চাষার মেয়েদের মত তাকে বেশি খাটতে হয়। দেওয়ালে তাদের পূর্বপুরুষদের ছবি ও ফটোগ্রাফ। সেই বাড়িতে তারা ৩০০ বছর ধরে বাস করচে। নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়কার চিহ্ন তারা আমায় দেখাতে চাইলে।

ওদের বাড়িঘর আমাদের চেয়ে অনেক ভাল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও বেশি। আবাসবাটির কাছে একটা বড় হল, তার একপাশে কার্পেট্ পাতা। শুনলাম, সেটি গরুর গোয়াল। এই খোলা উঁচু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হল দেখে কে বলবে সেটি গরুর গোয়াল।

গোয়ালে তখন গরু ছিল না—কারণ হল্যাণ্ডে গরুবাছুর গোয়াল থেকে বেরিয়ে যায় এপ্রিলের মাঝামাঝি এবং ফিরে আসে অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে।

গরু ছিল না, তাদের জাব খাওয়ার টবগুলিও চোখে পড়ে না। সেগুলি মাটির সঙ্গে সমতলে অবস্থিত। গরু গোয়ালে বেঁধে রাখা হয় না—কার্পেটের পাশে কাঠের রেলিং আছে, তার দ্বারা অন্যান্য গরু থেকে তাদের পৃথক করা থাকে।

দেওয়ালের গায়ে নেপোলিয়নের সময়কার যুদ্ধের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। একজায়গায় একটা কামানের গোলা দেওয়ালে বিঁধে রয়েচে। তার ওপর চর্বি মাখিয়ে দেওয়া আছে, পাছে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। প্রাঙ্গনে কৃষকের দুটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা। তৃতীয় ছেলেটি যুদ্ধবিভাগে সৈনিকের কাজ করে। বড় ছেলেটির বয়েস আন্দাজ পঁচিশ বছর, বেশ আধুনিক পোষাক পরিহিত তরুণ যুবক। তাকে তার বাপ ডেকে আমাদের গ্রাম দেখাতে বলে দিলে। আমরা তাদের জমি কতটুকু, পথ দিয়ে চলে চলে ঠিক করলাম। আমরা মাপলাম তিন হেক্টার—কিন্তু পরে কৃষক বললে, জমির পরিমাণ ছয় হেক্টার। অবিশ্যি তাকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ছিল না। জমি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েচে, যা আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায় না। মানব তার ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতির ওপর প্রয়োগ করে তাকে ইচ্ছামত খাটিয়ে নিচ্চে।

জমি সবটুকু তার নিজের নয়, সে এক ইহুদীর কাছ থেকে খাজনা ধার্য করে কিছু জমি নিয়েচে। গরু দোহা হয় মাঠেই, গড়ে একটি গরু ৩।৪ গ্যালন দুধ দেয়।

মাত্র ছয় হেক্টার জমি দ্বারা তার এত সমৃদ্ধিলাভ হ'ল কোথা থেকে? আমাদের দেশে কত কৃষকের এর চেয়ে অনেক বেশি জমি থাকা সত্বেও এর অর্ধেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তোষ সেখানে দেখা যায় না।

এই সম্পর্কে আমার মনে পড়লো বলকান্ পার্বত্য প্রদেশের কৃষকদের কথা। বলকান পর্বত থেকে ফিরবার পথে আমি গাড়ি থেকে নেমে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গিয়ে বসতাম—তাদের বাড়িঘর আমাদের দেশের আস্তাবলের সমান। গরু-মানুষে এক ঘরে বাস করে। শীতের দিনে ছিন্ন, মলিন বস্ত্রে কৃষক রমণী শীতে কাঁপতে কাঁপতে গৃহস্থালীর কাজকর্ম, গরুবাছুরকে খাওয়ানো ইত্যাদি করছে, চুল্লীর কাছে তক্তা দিয়ে কোন রকমে তৈরি একটা খাটে কৃষক শুয়ে আছে—চারিধারে নগ্ন দারিদ্র্যের চিত্র। নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহারও সেখানে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

আমি আমার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি বিয়ে কর নি কেন?"

সে বললে, "তার জমি নেই সুতরাং স্ত্রীপুত্রের দরকারও নেই। জমির ও গরুবাছুরের তদারক করবার জন্যেই তো স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের দরকার।"

যেমন ডাচ্ কৃষকদের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, তেমনি তাদের অবস্থারও পার্থক্য। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল ডাচ্ কৃষক কাঠের জুতো পরে বাঁক কাঁধে জলের বালতি নিয়ে যাচ্ছে আর তার ছেলে আধুনিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছে এবং স্ত্রী ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করছে।

আমরা যদি কারখানায় সযত্নে গরু পালন করি ওদের মত, তবে ১৮০টি গরু থেকে ২০০০ লিটার দুধ আমরা পেতে পারি এবং আমাদের শ্রমিকদের সস্তায় দুধ দিতে পারি।

আমেরিকা-ইউরোপ

গতবার আমেরিকা ভ্রমণ করতে এসেছিলাম সে আজ ছ বৎসর আগের কথা। আমেরিকার জুতোর কারখানাগুলির অনেক উন্নতি হয়েছে তারপর থেকে।

কর্মপ্রণালীর উন্নতিসাধন দ্বারা মাল উৎপাদনের ব্যয় তারা কমিয়ে এনেছে। শ্রমিকদের মজুরি কিন্তু কম নয়। অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় তারা সাফল্যের সঙ্গে জয়ী হয়েছে। দেশের লোকের জুতো সরবরাহ করে উঠতে পারে না বলেই বিদেশে বেশি মাল তারা পাঠায় না।

যন্ত্রাদির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কারখানার মালিকেরা সময়ের মূল্য বুঝতে পেরেছে—দেশের লোকের সমৃদ্ধিও দিন দিন বেড়ে চলেছে সেই জন্যে।

একজন ইউরোপীয়ের মন দুঃখেও আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের চওড়া চওড়া পিচ্‌ঢালা রাস্তা ও আধুনিক ফ্যাসানের মোটরগাড়ির ভিড় দেখে। দরিদ্র নাগরিকেরাও মোটর ব্যবহার করতে পারে সেখানে। মোটরগাড়ীই সেখানকার লোকের আর্থিক উন্নতি ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করেছে।

আমরা, ইউরোপের লোকেরা, কবে আমাদের ধূলি ও কর্দমপূর্ণ পথগুলির উন্নতি করব?

আমেরিকার লোকে অন্যায় আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে না, মদ্যপান করে না। আমরা ওদের মত উন্নতির দাবি করতেই পারি না, যতদিন মদের পেছনে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করি।

আমরা নৈতিক সাহায্য দাবি করি তাদের কাছে। আমাদের আমেরিকার আমদানী জিনিস দরকার—কিন্তু তার দাম আমরা দিতে চাই আমাদের পরিশ্রম দ্বারা। সেখানে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইউরোপের অর্থনৈতিক সাহায্য ও সম্প্রীতি প্রার্থনা করে।

কিন্তু অনেক সময় এই সহযোগিতা একপেশে হয়ে পড়ে। কতকগুলি জিনিস আমেরিকার একচেটে—যেমন সেলাইয়ের কল, হিসাবের কল ইত্যাদি। কিন্তু ইউরোপীয় কোন ব্যবসাদার যদি

আমেরিকার ব্যবসাদারের মত জিনিস তৈরী করে আমেরিকার বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয় তবে আমেরিকার ব্যবসাদার ওয়াশিংটনে ছুটে গিয়ে বিদেশী পণ্যের ওপর কাস্টম্ ডিউটি আরও বাড়িয়ে দিতে বলবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলছি।

একটা উদাহরণ দিই।

আমি গিয়েছিলাম মেসিনারি কিনতে সেখানে- এর দাম দিতে চেয়েছিলাম টাকা দিয়ে নয় আমাদের সস্তা জুতোর বিনিময়ে। কিন্তু তারা বললে, সে হবে না। দাম টাকা দিয়েই দিতে হবে।

জুতোর দোকানদারকে একজন আমায় দেখিয়ে বললে, 'এই লোকটা তোমাদের সস্তায় জুতো তৈরি শেখাতে পারে।"

জুতোর দোকানী জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পুত্র। সে এক ধরণের অদ্ভুত সুরে বললে 'কে? ওর জুতোর ওপর ডিউটি বসিয়ে আমরা ওকে ঠান্ডা করে ছাড়ব।"

অথচ এই ব্যবসায়ী আমাদের কাছে অনেক নতুন কিছু শিখতে পারতো যাতে তারা সস্তায় মাল তৈরি করতে পারতো এবং শ্রমিককে উচ্চহারে মজুরিও দিতে সক্ষম হ'ত।

কিন্তু নতুন কিছু শিক্ষা করার চেয়ে বাণিজ্য সচিবের কাছে ছুটে যাওয়া অনেক সোজা। এ এক ধরণের কাপুরুষতা, ইউরোপেও এধরণের বহু কাপুরুষ আছে যারা মনে ভাবে তাদের ব্যবসায় রাখার দায়িত্ব স্টেটের। কিন্তু আমাদের নীতিজ্ঞান এই কাপুরুষতাকে সমাজ-দেহ থেকে দূর করতে অসমর্থ যেমন তারা আমাদের রাস্তা থেকে ধুলো ও কাদা দূর করতে অসমর্থ।

কিন্তু আমেরিকা এ জিনিসটার প্রশ্রয় না দিয়ে যদি সকল রকম কাস্টম শুল্কের প্রাচীর একদম ভেঙে দেয়—তবে দেশের, দশের ও জগতের মহদুপকার সাধিত হবে।

ইউরোপের বাজারে হিসাবের কল, অঙ্কের কল প্রভৃতি মানসিক শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রের চাহিদা কম বলে এ ধরণের নতুন যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয়।

বিমানপথে ভারতবর্ষ

(১৯৩১)

১৯৩১ সালের ১০ই ডিসেম্বর বাটা জিলুন্ সহরের নিকটবর্তী অট্রোকোভিচ্ এরোড্রোম থেকে ফকার 'ওকে-এটিসি' বিমানে ভারতে বিখ্যাত ভ্রমণে যাত্রা করেন।

তাঁর জন্মভূমি ইউরোপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দেশ, এই দেশের সঙ্গে বিরাট ভারতভূমির বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল এই ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ থেকে তিনি যান সিঙ্গাপুর হয়ে বাটাভিয়ায়। বিমানের পাইলট ছিল জনৈক ইংরেজ, কাপ্তেন স্ট্যাক- তা ছাড়া ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ান পাইলট ব্রুসেক্, বেতার বার্তা প্রেরক মারেস্, টমাস বাটা এবং রপ্তানী বিভাগের তিনজন ম্যানেজার।

১৯৩২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাটা অন্য একখানি বিমানে ফিরে আসেন, তাঁর ফকার বিমানখানি কন্স্ট্যান্টিনোপল্ এরোড্রোমে কাদায় জখম হয়। তুরস্কের টরাস পর্বতের ওপর দিয়ে যাবার পরে এই ব্যাপার ঘটে-- ভ্রমণের এই অংশ অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নেই।

বাটা ভ্রমণের পূর্বে বলেছিলেন, "এ ভ্রমণ খুব আমোদজনক হবে না। জগতের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার অভূতপূর্ব উপায়েই সমাধান করবার চেষ্টা পেতে হবে।"

বিমান পথে প্রথম কয়েক দিন

বেতারে ক্রমাগত খবরে দিচ্ছে সম্মুখের আবহাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আল্পস্ পর্বতে কুয়াসা হেতু সেলোভেক্ এবং অন্যান্য অ্যালপাইন এরোড্রোমে অবতরণ অসম্ভব। ক্যাপ্টেন স্ট্যাক্ ভিয়েনার ওপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো, নামবার চেষ্টায়। আমাদের পাইলট ব্রুসেক্ এ অঞ্চলের খবর রাখতো, সে এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে।

আল্পস্ পর্বতের ওপর ছিল কুয়াসা--আমাদের বিমানে বোঝাই ছিল অতিরিক্ত অত উঁচু পর্বতের উঁচু চূড়াগুলি আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে তুলছিল।

আমরা ভাবলাম সসেজ্গুলি ফেলে দিয়ে বোঝা কমিয়ে ফেলি, কিন্তু সেগুলি খুব ভাল জিনিস ছিল বলে ফেলে না দিয়ে রসনার তৃপ্তির জন্যে সেগুলি রেখে দেওয়া হ'ল।

রাত্রি ১২-৩০ মিনিটের সময় ভেনিসে পৌঁছে আমরা সেখানে নামবার ঠিক করলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পেট্রোল পুরে নিয়ে আমরা রোমে চললাম আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ, বেতার যন্ত্রে ক্রমাগত ঘোষণা করছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলাম, উল্টো দিক থেকে জোর বাতাস বইতে লাগল রোমে যখন অবতরণ করি, তখন সেখানকার রাস্তায় আলো জ্বলছে।

পাশপোর্টের সব ব্যাপার ঠিক করে সকাল এগারোটায় আমরা রোম থেকে রওনা হই। আমাদের বেতার বার্তাপ্রেরক মারেস্ আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থাই ক্রমাগত জ্ঞাপন করছিল। সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকায় ঝড়বৃষ্টি চলছিল, ভিসুভিয়স্ আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তী যখন এসেচি আমরা, তখন শোনা গেল কাটানিয়া এরোড্রোমে অবতরণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এই ঝড়বৃষ্টির জন্যে। বিমান বারে বারে ধাক্কা খাওয়ার দরুন তাকের জিনিসপত্র আমাদের ওপর পড়ে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন স্ট্যাক্ চাকা ঘুরিয়ে বিমান ঠিক করে দিলে, তারপর আর এমন হয় নি। একটু পরে নীল ভূমধ্যসাগর নিম্নে দেখা গেল।

আমরা পড়ে গেলাম মুস্কিলে, সামনে যত এগিয়ে যাবো ততই ঝড়বৃষ্টি, কাটানিয়া এরোড্রোমে নামা নিষিদ্ধ--এখন আমরা যাই কোথায়? প্রাদেশিক এরোড্রোম আমি খুব বেশি দেখিনি ও অঞ্চলে। রোদ উঠেছিল বলে আমরা খারাপ আবহাওয়ার সংবাদ আমল দিই নি যেমন ভেনিস্ থেকে রোম যাবার পথে দিই নি--তেমন।

সামনে কিছুদূর গিয়েই মেঘের প্রাচীরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। বিষম বৃষ্টি নামলো--জানালার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি এসে পড়তে লাগলো, আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। ভেবে চিন্তে লাভ নেই- ফিরতেই হবে।

বেতারে জানালে ১৪ দিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে সিসিলির কোন এরোড্রোমেই নামবার উপায় নেই।--অতএব যেখানে সেখানে নামা ছাড়া উপায় নেই।

একটা সমতল মাঠ দেখে সেখানেই নামি। নিকোটেরা অবতরণ ভূমিতে এর আগে চারখানা বিমান নেমে চূর্ণ হয়ে গিয়েচে--কিন্তু আমাদের অত বড় বিমান বিনা দুর্ঘটনায় দিব্যি নামলো দেখে সেখানকার অধিবাসীরা তাদের অবতরণ ভূমি সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করলে বোধ হয়। নিকোটেরাতে আর এক শত্রু জুটলো--বালু। চাকায় এমনি বালি জড়িয়ে যেতে লাগলো যে আমরা ভাবলাম আর আমরা উঠতে পারব না। অতএব আমাদের মালপত্রসহ ট্রেন যোগে আমরা প্যালার্মো রওনা হই, বিমান পরদিন গিয়ে আমাদের তুলে নিয়ে টিউনিস্ যাত্রা করবে, এই কথা রইল।

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি বেড়েই চললো--দুপুর রাত্রে এমন ভীষণ ঝড় উঠলো যে আমাদের বিছানা দোলাতে লাগলো। এরোপ্লেনখানার জন্যে ভাবনায় পড়ে গেলাম। শনিবার ও রবিবার সমানে ঝড়

চললো—টেলিফোনের ও টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে যাওয়ার দরুন নিকোটেরাতে কোন সংবাদ পাঠাতে পারলাম না।

সোমবারে খবর পাওয়া গেল বিমান অক্ষত অবস্থায় আছে, কিন্তু বালি থেকে উঠবার উপায় নেই।

সোমবার আমরা এরোড্রোমে গিয়ে আবহাওয়ার রিপোর্ট নিলাম। আমাদের শুক্রবারের বিমান-ভ্রমণ সম্বন্ধে চারিদিক থেকে অভিনন্দন-সংবাদ পাওয়া যেতে লাগলো– ইটালির মধ্যে আমরা খ্যাতি অর্জন করেচি সেদিনকার বিমানভ্রমণের দরুন।

এরোড্রোমের ডিরেক্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরোপ্লেনখানা বালি থেকে কিভাবে উঠবে?"

ডিরেক্টার বললে, "সে কি! আপনার এরোপ্লেন তো এখানে নেই, কতক্ষণ আগে প্যালার্মো চলে গিয়েচে!"

তখন আমরা খবর পাঠালাম, প্যালার্মোতে নামবার দরকার নেই, সেখানে থেকে সোজা টিউনিসে উড়ে যাও। আমরা সেখানে গিয়ে যোগ দেব।

ভেবেছিলাম বুধবার সকালে টিউনিসে পেঁছে যাব। তারপর বিমানপথে অবাধগতিতে আবার চলতে থাকব। ভবিষ্যতে কি ঘটবে কি জানি? এতবড় বিমানে ব্যবসায়ের জন্য ভ্রমণ এই আমাদের প্রথম। আমরা বিভিন্ন অবতরণ ভূমির কর্মচারিগণকে ও ইটালির বিমান-সচিবকে অগণিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম তাঁদের অযাচিত ও অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্যে।

বিমানপথে ভ্রমণ ও মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব

বিমান মানুষের সম্পূর্ণ নব আবিষ্কার। মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি, এ থেকে তা অনুভব করা যায়। অপরকে সেবা করবার মস্ত বড় সুযোগ রয়েচে এর মধ্যে। তোমার জীবন যে অপরের হাতে এ থেকে তা বোঝা যায়। প্রতিকূল আবহাওয়া তোমাকে বৈদেশিক আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করবে।

সকাল ৬-৩০ মিনিটে তব্রুক। ৮টাতে কাইরেনিকা ও ইজিপ্টের সীমানায় লিবিয়া ও ইটালিকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় দিলাম। আলেকজান্দ্রিয়াতে আমাদের দেশের রাজদূতকে বলে দিলাম আমাদের সাহায্য প্রদানের জন্যে ইটালির বিমান-সচিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে।

ধন্যবাদ দেওয়া সহজ, কিন্তু এ সেবার প্রতিদান দেওয়া শক্ত। ইটালিতে প্রচলিত একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। একটি স্ত্রীলোকের পুত্র ছিল বিদেশে। স্ত্রীলোকটি প্রত্যেক পথিকের সেবা করতো এই আশায় যে ভগবান এর প্রতিদানে বিদেশী লোকের দ্বারা তার পুত্রের সেবা করাবেন।

কতলোক আমাদের সাহায্য করেচে—যারা কোনদিন আমাদের দেশের নামও শোনে নি—তাদের কাছ থেকেও কত সাহায্য পেয়েচি আমরা।

নিকোটেরাতে বাধ্য হয়ে অবতরণ করবার সময়ে একটি দরিদ্র বালক নিকটবর্তী গ্রামে আমাদের নিয়ে গেল। কাদার সমুদ্রের মধ্যে সে একটু শুকনো জমি দেখিয়ে দিলে আমাদের। আমরা তাকে এক লিরা দেবার জন্যে ইচ্ছা করলাম— ছেলেটি হাত বাড়িয়েচে এমন সময়ে একটি বেশি বয়সের ছেলে এসে ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপলে—ছোট ছেলেটি হাত গুটিয়ে নিলে আবার—তার সেবার প্রতিদান আমার আর দেওয়া হ'ল না। এ সমস্ত অপরিশোধ্য ঋণের বোঝায় আমার পকেট ভারি হয়ে আছে।

এই ছেলেটি আমাদের গ্রামের টেলিগ্রাফ আপিসে নিয়ে গেল। টেলিগ্রাফ আপিস পাহাড়ের ওপর। উঁচু জায়গায় উঠে যেতে হয় প্রায় ৬০০ মিটার, রাস্তাও ভাল না। আমরা মোটরে টেলিগ্রাফ আপিস পরিত্যাগ করি, সুতরাং বালকটিকে কিছু দেওয়া হয় নি। স্টেশনে যখন আমরা ট্রেনে উঠচি তখন সে এসে পুরস্কার চাইলে। বোধহয় তাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল।

এদু'টি ঘটনার মূলে কারণ বোধহয় এই: প্রথম ক্ষেত্রে বালক স্বেচ্ছায় এরোড্রোম থেকে পথ দেখিয়ে আমাদের এনেছিল গ্রামে—সেজন্যে সে বখ্শিস নেয় নি।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আমরা তাকে বলেছিলাম টেলিগ্রাফ আপিস দেখাতে বিশেষত সেখানে ওঠাও ছিল কষ্টকর।

আমি এই ছেলেটিকে বড় পছন্দ করেছিলাম—যদি জিলুন্ সহরের টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ছাত্র হিসেবে ঢুকতে চাইতো, আমি তাকে নিয়ে নিতাম।

পুরানো আমলের ইটালি ছিল অন্য ধরণের। তারা ছেলেবুড়ো হাত পেতেই থাকতো বখশিস দাও'

মরুভূমিতে খৃীস্টমাস যাপন

মরুভূমিতে সময় বোঝা যায় না। নতুন ইঞ্জিন এল একদিন পরে। সন্ধ্যায় আমরা স্টার্ট দিলাম ইঞ্জিনে। কলকব্জার কিছু দোষ হ'ল, সেটা রাত্রে আমরা ধরতে পারলাম না। পরদিন কাজটুকু শেষ করে বেলা ৯টাতে উড়ে পরীক্ষা করতে গেলাম ইঞ্জিন।

পরদিন সকাল ৭টায় যাত্রা করবো ভেবেচি। কিন্তু চাঁদ দেখা গেল না। এখানে চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল।

বড়দিন যাপন করলাম সৈন্যদের মধ্যে খুব সামান্যভাবে। জীবনে এভাবে বড়দিন-জীবন যাপন এই আমার প্রথম। রাত তিনটার সময় সার্টি থেকে ৫২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী বেনগাজিতে যাত্রা করব—স্থির করা গেল।

ক্যাপ্টেন স্টাক্ ও তার সংগীগণ আমাদের ওঠালে রাত্রে—রাত্রি ৪-১৫ মিনিটের সময় রওনা হই। বিমানপথে নৈশভ্রমণ এই আমার প্রথম। সকলেই এলেন আমাদের সাহায্য করতে।

বিদায় সার্টি! তোমার অপূর্ব রোদ, হাওয়া ও মানুষদের কখনো ভুলব না।

চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল। এখন মেঘে ঢাকা। রাত্রি অন্ধকার, কেবল ইঞ্জিনের পাইপের আগুন ও সমুদ্র আমাদের পথ প্রদর্শক। এ মেঘে জল হবে। ৫টা এখনও বাজে নি। বেতার কর্মচারী মারেস্ অন্য অন্য স্টেশনের সংগে যোগ রাখতে চেষ্টা করচে।

ইঞ্জিনের ধুক্ ধুক্ শব্দ ঠিক যেন হৃৎস্পন্দনের মত। ইঞ্জিন যেন এখানে আমাদের সগোত্র উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেচে। অশ্বের সংগে অশ্বারোহীর মৈত্রী এ ভাবেই গড়ে ওঠে। অশ্ব আরোহীর প্রাণ রক্ষা করে, আরোহী অশ্বের প্রাণ বাঁচায়।

ভোর ৬টা! দূর আকাশে একটি ক্ষীণ আলোক রেখা। সকাল? হ্যাঁ, সকাল হ'ল। ধন্যবাদ। দিনের আলোর সংগে প্রকাশ পেল পূর্ব আকাশে বিপজ্জনক মেঘ, ঝড় নেই।

মাইজেল ভোজ লাগালে। থার্মোফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললে, ডিম সিদ্ধ ও আরবদেশীয় রুটির সংগে মন্দ লাগলো না। আমাদের সকলের মুখেই হাসি। জীবনকে আমরা সবাই ভালবাসি।

মরুভূমির ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর বাস্তবরূপ ম্যাপ থেকে কত পৃথক! ম্যাপে বহু নদী, খাল আঁকা থাকে। নদী অর্থে আমরা কল্পনা করি সমুদ্রাভিমুখী জলপ্রবাহ। উত্তর আফ্রিকায় ৩০০০ কিলোমিটার ব্যাপী স্থানের মধ্যে এক ফোঁটা জল কোথাও পাই নি—নীল নদী ছাড়া।

এখানে আধ গ্লাস জল খেয়ে আধ গ্লাস জল ফেলে দেওয়া কত বড় অপরাধ, তা বুঝলাম। জল এখানে মানুষের প্রাণ। গাছপালাও তা বোঝে। নদীর গভীর গর্ভে তারা জন্মায়।

মানুষে তার জীবন বাঁচাবার জন্যে কিছুই করতে জানে না। নদীর গতি পরিবর্তন করতে শেখে নি। অথচ সমুদ্রে অনাবশ্যক কত জল রয়েচে। সমুদ্ররূপ বিরাট চৌবাচ্চার জল মরুভূমিতে সেচন করতে শেখে নি মানুষে। পর্বত থেকে মরুভূমিতে জল এলে চলবে না সমুদ্রের জল এখানে আনতে হবে তবে এই মরু শস্যশালিনী উর্বরাভূমিতে পরিণত হবে। এ মহাব্যাপার সম্ভব করতে পারে শুধু জেমস্ ওয়াটের স্টীম ইঞ্জিন—পুরাকালের ক্রীতদাসকুল এখানে অসহায়।

বড় রাসায়নিকেরও আবশ্যক। সমুদ্রজলের যে অংশ জীবনের পক্ষে হানিকর সে অংশটুকু জল থেকে তফাৎ করে বাকিটা গাছপালা, তরিতরকারীর জন্যে ব্যবহার করতে হবে। তবে মরুভূমিতে জীবনের সঞ্চার হবে। জীবনের সঞ্চার হ'লে স্বাভাবিক জলপ্রবাহ স্থাপিত হবে। পৃথিবীতে বহু খাদ্য উৎপন্ন হবে, যা এখন দরকার, তার চেয়ে দশগুণ বেশি। এসিয়ায় ওই অংশের ও ভূমধ্যসাগর তীরের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়বে।

মিশর থেকে প্যালেস্টাইন

নীলনদীর তীরবর্তী ভূভাগ কি সুন্দর! সবুজের স্বর্গ ৩,০০০ কিলোমিটার ধরে শুধু বালুরাশি দেখে আসার পরে চোখ জুড়িয়ে গেল আমাদের।

স্বর্গ শেষ হবে আবার রুক্ষ মরুভূমি। জোর হাওয়ায় এরোপ্লেন যেন লাফাতে লাগলো। বেতার কর্মচারী সংবাদ নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কায়রোর সাড়াশব্দ নেই। অনেক পরে সংবাদ এল। ইজিপ্টের আকাশে ৮,০০০ ফুট পর্যন্ত ঝড়ো হাওয়া বইচে। প্যালেস্টাইনে ৩,০০০ ফুটে বালির ঝড় চলচে। বেশ। আমরা ওপরে উঠবো। দক্ষিণ থেকে এল বালির ঝড়।

আমি কখনো বালির ঝড় দেখি নি। অনভ্যস্ত বলে একটু ভয় হ'ল, এবার আমাদের শীঘ্র উঠে যেতে হবে, ২,০০০ মিটার তো এমনিই উঠেচি। ক্যাপ্তেন স্ট্যাক্ শীতের কোটের জন্যে কেবিনে ঢুকলো। আমাদের সকলের গায়েই শীতের কোট। স্ট্যাক্ উত্তরে বেঁকে গিয়ে ঝড় এড়াতে চাইলে আমি ঝড়টা দেখে ওর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক ছিলাম। স্ট্যাকের এ অভিজ্ঞতা বোধহয় পূর্বে ছিল সেজন্যে সে এর পুনরাবৃত্তি করতে রাজি নয় বুঝলাম। আমরা সমুদ্রের ওপরে চলেচি ঝড় দক্ষিণ দিকে বইচে। এমন কিছু বড় ঝড় নয়, তা হ'লে এত সহজে পার পেতাম না আমরা।

আমাদের দেরি হয়ে গিয়েচে। ১৩-১৫ মিনিটে আমরা রওনা হয়েচি, সামনে মুখোড় হাওয়া। বোধ হয় সন্ধ্যায় আমরা জেরুসালেমের নিকটবর্তী রামলেতে পৌঁছুব।

স্ট্যাক্ মারেস্কে বললে, রামলেতে সূর্যাস্ত কখন হয় বেতারে জানতে। সূর্য ডুবে গেলেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আমরা এরোড্রোম থেকে বেশি দূরে নেই। স্ট্যাক্ বাঁদিকের ইঞ্জিনে বেশি গ্যাস দিলে। এটা আমি বন্ধ করবো। বাঁদিকের ইঞ্জিনকে আমি বেশি খাটাতে চাই নে।

বুশায়ারে রাত্রি যাপন

এই সহরের লোক সংখ্যা ৩০,০০০—কিন্তু একটা হোটেলও নেই। সেদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ বিমান-লাইনের পাইলট ও কর্মচারিগণ এরোড্রোমে নিজেরা চা তৈরি করতো। মিঃ কাজেরুনি সম্প্রতি একটা ছোট হোটেল খুলেছেন—চারটি বিছানা আছে হোটেলটাতে, বেশি আড়ম্বর নেই। এখানে সমুদ্রের হাওয়া বেশ লাগে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মিঃ কাজেরুনি দক্ষিণ পারস্যের একজন সাধু ব্যবসায়ী ছুটোছুটি করে দেখাশুনো করচেন, বেশ ইংরেজি বলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আহার করলেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক খবর দিলেন। আমরা দুটো ঘর নিয়ে রাত্রে শয়ন করলাম। এ হোটেল তাঁর নিজের খরচে তৈরি।

আমরা ঝড়ে পড়ি

আমরা দু'ঘণ্টা ধরে উড়চি—দুপুর নাগাদ ৮৫০ কিলোমিটার আমরা এগিয়ে যাবো। আমরা লিঙ্গে সহরের কাছাকাছি এসেচি—যেখানে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ এর বিমান অবতরণ করে।

বাতাস শান্ত সমুদ্র দর্পণের মত সমতল ও স্বচ্ছ জলের তলাকার বড় বড় পাহাড়গুলি বিমান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। আমরা আরবদেশের নিকটবর্তী হয়েচি, তার অন্তরীক্ষ শীঘ্রই চোখে পড়বে।

এদিক থেকে ভীষণ মেঘ উঠচে, বিমান হাওয়ার মুখে লাফাতে থাকে। পূর্ব দিক থেকে মেঘ-পুঞ্জ জমে আসচে। ক্যাপ্তেন স্ট্যাক্ বললে, সে উত্তর দিকে নিয়ে যাবে—আমরা এখনও আরবের কিছু অংশও দেখি নি। ঝড়ের মুখে বিমান ছেড়ে দিয়ে স্ট্যাক্ বিমানকে ঝড়ের গতি দান করলে, ঝড় পেছনে পড়ে রইল।

নীচে মেঘ, ওপরে আমরা উড়ে চলেচি, বিমানের ছায়া মেঘের গায়ে। নানা রকম রঙ মেঘের গায়ে বিমানের ছায়ায় চারপাশে রামধনুর সৃষ্টি হয়েচে। আমি অনেকবার মেঘের ওপর দিয়ে উড়েচি, এমন সুন্দর দৃশ্য কখনো দেখি নি। ঝড় আমাদের ঠকিয়েচে। দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঝড়টা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়চে। স্ট্যাক্ অভিজ্ঞ পাইলট, উষ্ণমণ্ডলের ঝড়ে সে অনেকবার এমন বিপদে পড়েচে। মারেস্ বেতারে খবর নিতে চেষ্টা করলে, কোন উত্তর নেই কোন দিক থেকে। এবার ঝড়ে পড়ে গিয়েচি আমরা বিমানখানা একবার উঠচে একবার পড়চে। আমাদের পেছনে সামান্য একটু আলোর রেখা।

ঝড় বিমানকে নীচে নামিয়ে দিলে জমির মাত্র কয়েক শত মিটার ওপরে আমরা রয়েচি। এখন ভগবান যা করেন। নীচে কি আরব দেশ?

আবার সমুদ্র দেখা যায় নীচে। সামনে ওটা কি? আলো। স্ট্যাক্ আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে হাসে। সব সময় স্ট্যাক্ জয়ী হয়। ঝড় পেছনে পড়ে গেল। বিমান লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে ছুটেচে।

জাস্ক্ বড় বিমান বন্দর, কিন্তু এখানে আমরা বিমান ছেড়ে জমিতে নামবার অনুমতি পেলাম না। যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে এসেচি, সেখানে নাকি কলেরার মড়ক চলছিল। অবিলম্বে জাস্ক্ ত্যাগ করতে আদিষ্ট হ'লাম। কোন হোটেলে ঢুকে কিছু খাবার পর্যন্ত অনুমতি পেলাম না। নিজেরাই চা করে নিলাম, ডাক্তার আমাদের জন্যে জল নিয়ে এল।

ঝড়ের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। মারেস্ বলছিল, সে ঝড় দশ হাজার ফুট উঁচুতেও

বর্তমান ছিল। আমাদের বিমানে যথেষ্ট বোঝাই ছিল, সুতরাং অত উঁচুতে ওঠা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। ইরান দেশের পর্বতের ওপর তখনও মেঘ ও ঝড়ের চিহ্ন।

খাবার ঝড়ে পড়ে গিয়েচি। বুশায়ার সহরের চা ও আলু গড়িয়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি পেট্রল পুরে নাও। আমরা এরোপ্লেনের ডানা বাঁধলাম। নইলে উল্টে যেতে পারে।

আবার আকাশে উড়েচি। কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের চিহ্ন দেখা গেল না। বিমান আবার লাফাচ্চে। কেন? ব্রুচেক্ আমাকে একটুক্‌রো কাগজ দেয়। আর বেশি ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। এখন আমরা বুঝতে পেরেচি-এর অনেক ওপরে মুখোড় বাতাস নেই- -মুখোড় বাতাস রয়েচে নীচের দিকে, সমুদ্রের ঢেউ দেখে তার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

আমরা যাত্রী, কিন্তু বিমান চালনায় আমাদের যৎসামান্য অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগাতে হবে, বড় বড় অক্ষরে পাইলটকে আমাদের মতটা লিখে দেখালাম। ফল হ'ল। পাইলট আমাদের মতে মত দিলে। পেছন থেকে এমনি হাওয়া যদি বয়, তবে আজ পারস্যের ওপর দিয়ে উড়ে বেলুচিস্থানের সদর এরোড্রোমে পৌঁছে যাব।

প্রশ্ন দাঁড়াচ্চে, সূর্য অস্ত যাচ্চে কখন? মারেস্ বেতারে সংবাদ নিতে চেষ্টা করলে। প্রত্যেক মিনিট এখন মূল্যবান।

টরাস্

ভারতবর্ষ থেকে ফিরবার পথে আমাদের বিমান ভ্রমণের খুঁটিনাটি বর্ণনা লেখা সম্ভব ছিল না। তখন আমরা ব্যবসা সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

বিমান ভ্রমণ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন আদেশ ছিল না। কিন্তু সিরিয়া, আলেপ্পো এবং জিলন্ থেকে দু'দিনের পথ দূরে, এ সম্বন্ধে আমায় তদারক করতে হয়েছিল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। প্রধান পাইলট স্ট্যাক্ নানা ওজর আপত্তি উত্থাপিত করলে কেন আমরা আলেপ্পো ছেড়ে তুরস্কের ওপর দিয়ে উড়ে কন্‌স্টান্টিনোপলে যেতে পারবো না। সেখানে ফেব্রুয়ারী মাসে বৃষ্টি হয়, নামবার ভাল স্থান নেই, আবহাওয়া খারাপ -ইত্যাদি নানা কিছু।

আমি স্বীকার করলাম, সবই সত্য। কিন্তু বিপদ ও বাধাকে অতিক্রম করাতেই আমার আনন্দ। আমি ভারতবর্ষ যাবার সহজ পথটি আবিষ্কার করতে চাই -ও পথের বাধা-বিপদও জানতে চাই।

তুরস্কের মধ্যে দিয়েই সোজা পথ। চিফ্ পাইলট সেটা বুঝতে পারলে না। আমি বললাম, সে থাকে বা যায়, তুরস্কের ওপর দিয়েই আমরা উড়ব।

আমার এই কথায় ক্যাপ্তেন স্ট্যাক্ তার জিনিসপত্র বিমান থেকে নামিয়ে নিলে। সে যেতে রাজি নয়। ব্রুচেক্ ও মারেস্ সঙ্গে থাকতে চাইলে।

ক্যাপ্তেন স্ট্যাক্ চারবার তুরস্কের ওপর দিয়ে উড়েচে। তার ওজর আপত্তির মূলে রয়েচে তার অভিজ্ঞতা। অন্য সকলের অভিজ্ঞতা নেই, আছে শুধু সাহস। আমার মুস্কিল হয়েচে, আমি যা ধরবো, তা করবোই। ক্যাপ্তেন স্ট্যাকের কথা ভাবলাম। এই বিমান ভ্রমণের সাফল্যের ওপর বেচারীর নাম, যশ, খ্যাতি সব নির্ভর করচে—আমাদের ছেড়ে যাওয়াতে তার নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হবে। ভ্রমণ সাঙ্গ করলে যে টাকাটা সে পেত আমাদের কাছ থেকে তা এখন পাবে না।

কাপ্তেন স্ট্যাককে একখানা চিঠিতে সব লিখলাম খুলে। তখন সে ফিরে এল। একঘণ্টা পরে এ্যালেকজান্ড্রেট্ উপসাগরের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছিলাম। দূরে দিকচক্রবালে সুউচ্চ টরাস পর্বতমালা।

স্ট্যাক্ বিমানকে ৩,০০০ ফুট ওঠালে। মারেস্ বেতারে কোন তুর্কী স্টেশন থেকে সংবাদ পাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। আমাদের দক্ষিণে বামে, উত্তর পূর্ব দিকে শুধু ঘন মেঘে ঢাকা পর্বতমালা। আমাদের পথ উত্তর পূর্ব দিকে সেদিকে আকাশ পরিষ্কার। এই সময় হাওয়া উঠলো জোরে, ঝড়ে আমাদের গতিপথ থেকে বিচ্যুত করতে চাইলে।

যদি আমরা ওদিকে ক্রমাগত চলি তবে আবার আলেপ্পো সহরে ঘুরে যাব। মারেস্ কোন খবর পাচ্চে না বেতারে, সামনের দিকে আবহাওয়া ও মেঘের অবস্থা কি জানবার কোন উপায় নেই। আমরা ৪,৩০০ মিটার উঠেচি। চার ঘণ্টা ধরে আকাশে রয়েচি কিন্তু পাহাড় ও মেঘের মধ্যে কোন ফাঁক দেখচি না যার মধ্যে দিয়ে ওপারে উড়ে যেতে পারি।

একঘণ্টার মধ্যে টরাস্ পর্বত পার হয়ে যাওয়ার কথা। মাত্র দু'ঘণ্টার পেট্রোল অবশিষ্ট আছে। এখন আর পরীক্ষা নয় এবার আমাদের বাঁচতে হবে। বিদ্যুৎ খরচ করে বেতারে কথাবার্তা বলারও আর দরকার নেই। কোথায় আমরা নামবো? আদানাতে? সম্ভব নয়। এখনও তিনঘণ্টা দেরি হবে আদানাতে পৌঁছাবার সেখানকার অবতরণ ভূমি ছোট আমাদের বিমান সেখানে নামবে না। একথা স্ট্যাক আলেপ্পো সহরে অনেকবার আমাদের বলেছিল। তবে কোথায় নামবো? সমুদ্রতীরে?

কিন্তু স্ট্যাক বললে দক্ষিণ তুরস্কের সমুদ্রতীর পর্বতময় বিমান নামাবার জায়গা নেই।

ইতিমধ্যে আমরা আদানাতে পৌঁছে গেলাম। ঝড় এখন আমাদের পেছনে ঘুরচে, সুতরাং ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগ বেড়ে গিয়েচে আমাদের বিমানের। আদানার অবতরণ ভূমি ছোট তাই কি? একেবারে না পাওয়ার চেয়ে ছোট ভালই।

আদানা পৌঁছে আমরা সহরের ওপর চক্রাকারে ঘুরতে লাগলাম। এরোড্রোম কই? মানুষ ও পশুকে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে মাঠের ওপর নামলাম শেষকালে।

আমরা আদানা স্টেশনে মেল ট্রেনে বসে আছি। সকালে আবহাওয়া সত্যিই ভীষণ খারাপ ছিল। দূরে টরাস্ পর্বতের তুষারমণ্ডিত চূড়া আকাশেই ঠেলে উঠেচে কি ভয়ানক দৃশ্য! এখন আকাশ পরিষ্কার। আবার চেষ্টা করতে হবে। ট্রেন থেকে নেমে বিমানে এসে উঠলাম। ঝরণার নির্মল জলের মত পরিষ্কার আকাশ। আমরা ভীষণকায় পর্বতমালার দিকে উড়ে চলেচি। কিছুক্ষণ ধরে ট্রেনটা দেখা গেল পাহাড় ঘুরে এঁকে বেঁকে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আদানাতে ভাল পেট্রল পাই নি। আমাদের বিমান অতি কষ্টে ওপরে উঠচে। ট্রেন থেকে নেমে এসে ভালই করেচি। ১২,০০০ ফুট উঠেচি, এখনও আমাদের সামনে উচ্চতর পর্বতমালা। বাঁদিকের ইঞ্জিন ১,৭০০ বার ঘুরচে। আমি ওকে ক্রীতদাসের মত খাটিয়ে বন্ধুত্বের অমর্যাদা করচি। না করলে চলে না, এত পাতলা হাওয়ায় আমাদের বিমান স্থির থাকতে পারবে না নইলে।

মারেস্ দেখালে, বাম দিকের ইঞ্জিনের উত্তাপ শূন্য বিন্দুর দিকে দ্রুত নামচে। ব্যাপারটা সহজ নয়। তৈলদান যন্ত্রের তৈল বরফে পরিণত হচ্চে শীতে। এখনি ইঞ্জিন বন্ধ করা দরকার। আমরা তখন টরাস্ পর্বতের মাথায়—আমাদের নীচে গভীর খড্ড। শুধু বরফ আর বরফ গাছপালা চোখে পড়ে না।

সে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। বাকি দুটো ইঞ্জিন কি বিমানকে এত উঁচুতে রাখতে ও চালাতে সমর্থ হবে?

হ্যাঁ, পেরেছে।

দক্ষিণ দিকের ইঞ্জিনটা উত্তর আফ্রিকাতে নতুন লাগানো হয়েছিল। তখনই এটা মাঝে মাঝে থেমে যেত। এখন এটাকে দুটোর কাজ এক সংগে করতে হবে। এ পর্বতের শেষ নেই, তিনঘণ্টা ধরে চলেছি, তবুও নীচে বরফ আর পাহাড় আর গভীর খড্ অথচ একঘণ্টায় আল্পস্ পর্বতের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলাম।

ইঞ্জিনকে বাঁচাবার জন্যে আমরা জমির কাছাকাছি নামিয়ে আনলাম বিমানকে, বাগদাদ রেলপথ ধরে ধরে চলেছি, যদি বাধ্য হয়ে নামতে হয়, ফাঁকা জায়গা পাব। পরবর্তী বন্দর কোনিয়া কতদূরে? আমরা কাল সেখানে খবর পাঠিয়েছি অবতরণ-ভূমি পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করে রাখতে। হয়তো তার অস্তিত্ব আদানা অবতরণ-ভূমির মতই শুধু কাগজেই আছে।

ঐ সামনে কোনিয়া। ভগবানকে ধন্যবাদ। রেলওয়ে স্টেশনটা খুব বড় দেখা যাচ্ছে বটে-কিন্তু বিমানবন্দর কই? ডাইনে, বাঁয়ে যে দিকে চাই-- বিমানবন্দরের চিহ্নও নেই। পরবর্তী বিমানবন্দর এস্কিসিহিব ৩০০ মাইল দূরে---স্ট্যাক্ বিমান না থামিয়ে সেদিকেই চলল।

টমাস বাটার নোট-বই

[ভ্রমণকালে নানা দরকারী বিষয় বাটা তাঁর নোট-বইয়ে টুকে রাখতেন। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল]

ত্রিপোলি -একটা উটের দাম ৬০০ থেকে ৭০০ ইটালিয়ান লিরা। ৪০০-৬০০ কিলো ওজনের বোঝা ধরে এক একটা উটে। দিনে একটা উটে ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। খরচ পড়ে উট পিছু ২০ লিরা দৈনিক। ষাঁড়ের দাম ৬০ থেকে ১০০ লিরা। ১০০ কিলো বোঝাই নিয়ে দিন ২০ কিলোমিটার হাঁটতে পারে।

এ সব জায়গায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জিনিস নিয়ে যাওয়ায় খরচ অনেক বেশি। বর্তমান অবস্থায় দোকানের ম্যানেজার ডাক বা মোটরে মাল পাঠাতে পারে না। উট ভিন্ন উপায় নেই। বন্দরের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার, কোন দোকানই বন্দর থেকে ১০০ কিলো-মিটারের কমে নেই।

প্যালেস্টাইন -রামলেতে নামলাম। তখনি জেরুসালেম রওনা হই। সকালে রামলের নিকটবর্তী ইহুদী সংস্কৃতির কেন্দ্র টেল্-আভিভ্ উপনিবেশ পরিদর্শন করি। ষাঁড়ের মত জোর অনুভব করছি দেহে। যে দেশই দেখি, সে সম্বন্ধে আগে যা ভাবতাম, তার চেয়ে দেখছি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব থেকে নিজের বুদ্ধিমত না দেখেশুনে যেন কিছু না ঠিক করি— এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল এবার।

বাগদাদ- মুচি জুতো পালিশ করে এইভাবে--প্রথমে সে একটা নেকড়া দিয়ে জুতো মোছে। তারপর সাবান দিয়ে ধোয়। রং লাগাতে তরল পালিশ ব্যবহার করে, ইচ্ছামত রং লাগায়।

তারপর আমাদের তৈরি পালিশের মত শক্ত পালিশ ব্যবহার করে আবার নেকড়া দিয়ে মোছে—আবার পালিশ লাগায়।

সে সাধারণ সাবান ব্যবহার করে। তরল পালিশের জন্যে ব্লিথ্ ও প্ল্যাটের তৈরি কোব্রা পালিশ ব্যবহার করে। তরল পালিশ ৭ আনা দাম শক্ত পালিশ ৮ আনা, খুচরো দাম।

জিল্‌ন্ সহরে প্রত্যাবর্তন

বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে যে স্বাগত সম্ভাষণ করেছেন, তার আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি বহুদূরে ভ্রমণ করে এসেছি বটে, কিন্তু সে দিক থেকে গর্ব করবার কিছু নেই আমাদের। বরং আমি বিমান ভ্রমণের পথপ্রদর্শক বীরপুরুষদের নিকট কৃতজ্ঞ যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে মানুষকে পাখা দিয়ে গেলেন। এই যে আজ আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এতদূরে বেড়িয়ে এলাম পূর্বে যে পথ যেতে কয়েক বছর লাগত এজন্যে তাঁদের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

বিমানযন্ত্রের কল্যাণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন আজ আমাদের সম্ভব হয়েছে। সব দেশেই আমাদের জিনিস চায়। তারাও আমাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে তারাও আমাদের মঙ্গলসাধন করতে প্রস্তুত, যদি আমরাও তাদের মঙ্গলসাধন করি যদি আমরা আরও ভাল মাল দিই।

বিমানযন্ত্রের জয় হ'ক! আমাদের কারখানার জয় হ'ক!

সহকর্মী

টমাস বাটা সারাজীবন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছিলেন। শ্রমিকদের সঙ্গেও তাঁর একটি অপূর্ব বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল শুধু তাঁর কারখানার শ্রমিক নয়, যে লক্ষ লক্ষ লোক যন্ত্রের পেছনে কারখানায়, খনিতে মাঠে, মাটির ওপরে বা নীচে যারা হাতের কাজ করে-তাদের ওপর বাটার অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি দেখা যেত। নিজেও তিনি শ্রমিক বংশে জন্মগ্রহণ করে নিজের বুদ্ধিবলে অতখানি উঠেছিলেন, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নয়ন। তাঁর অদম্য ও দুর্ধর্ষ ইচ্ছাশক্তি এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রয়োগ করেছিলেন।

তাঁর অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝেছিলেন রুটি হাতিয়ার ও যন্ত্রাদির চেয়ে বড়, কথার চেয়ে কাজ বড়। তিনি তাঁর কারখানাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, তাঁর নিজের ও দেশের কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে চাইতেন। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বর্ধনের জন্যে ১লা মে দিবসের ছুটির উৎসব প্রতিষ্ঠা করেন। এ দিন তিনি তাঁর নিজের আবাসবাটিতে কারখানার সকল শ্রমিকদের আমন্ত্রণ করে আনেন এবং সেই থেকে প্রতি বৎসরই এ দিনটিতে সকলকে নিয়ে আমোদ করতেন।

বাটার কত গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল লোককে শিক্ষা দেবার, তা এই ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে। প্রতি বৎসর এই উৎসবের দিন তিনি শ্রমিকদের নিকট কারখানার সারা বছরের লাভ, মাহিনা, মাল

উৎপাদনের হিসাব ইত্যাদি দাখিল করতেন—শ্রমিকদের বার্ষিক আয় ও সঞ্চয়ের কথাও এতে লেখা থাকত। এই উপলক্ষে সকলের উৎসাহ এত বেশি হয়েছিল যে ১৯৩১ সালে উৎসবের দিন ৮০,০০০ লোক যোগ দিয়েছিল, ১৯০৭ সালে যোগ দেয় ১৮০,০০০ লোক। জিল্‌ন্ কারখানার বড় হল্ সেদিন উৎসববেশে ভূষিত ভোজনাগারে পরিণত হয়—যন্ত্রের মাঝে মাঝে সাদা চাদর-ঢাকা, ফুল-সাজানো টেবিল, প্রত্যেক টেবিলে শ্রমিকগণ তাদের পরিবার নিয়ে খেতে বসেছে—সকলেই সেদিন কারখানার অতিথি—গৃহস্বামী ও কর্ত্রী হচ্ছেন কারখানার ম্যানেজার ও তাঁর পত্নী। এই বিরাট উৎসব বাটার কারখানার শ্রমিকবর্গের পারিবারিক ঐক্য ও কর্মনিষ্ঠার প্রতীকস্বরূপ।

১৯২৪ সালে টমাস বাটা এই উৎসব দিবসের প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক শ্রমিকের নামে ও ঠিকানায় নিম্নলিখিত নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন:—

১লা মে, ১৯২৪।

বন্ধুগণ।

আমাদের শ্রমিকগোষ্ঠী এত বড় হয়ে গিয়েছে যে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। অতএব এক বৎসর পুরো কাজের পর ১লা মে দিবসে সবাই মিলি মিশে আনন্দ করা যাবে, স্থির করেছি।

আপনারা সপরিবারে উক্ত দিবসে আমার বাড়িতে দয়া করে আসবেন। আমি আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকেই সাদর-নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করছি।

ভবদীয়

টমাস বাটা

সহকর্মিগণের প্রতি বাণী

১লা মে, ১৯২৪

আমি নিজের বাড়িতে আপনাদের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। আপনারা আমার নিমন্ত্রণে এখানে সমাগত হয়েছেন, ১লা মে দিবসের শ্রমিকগণের ছুটীর দিনের উৎসবের অনুষ্ঠান করতে।

কারখানায় প্রতিদিনই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়। কারখানার বাঁশি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন শ্রমসাধ্য কর্মে আমাদের যোগ দিতে ছুটতে হয়, সেখানে সুরু হয় বস্তুর সঙ্গে সংগ্রাম, শ্রমের সঙ্গে সংগ্রাম কঠিন সংগ্রাম, আমাদের জীবন ধ্বংসকারী বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মনুষ্যত্বের সংগ্রাম।

আমরা গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন করতে রোজ ছুটি কারখানায় যেখানে জীবিকার উপায় সেখানেই জীবন। যেখানে জীবন সেখানেই সংগ্রাম।

কারখানা মজলিসি বন্ধুত্বের স্থল নয়, গৃহই হচ্ছে তার উপযুক্ত স্থান। কর্ম অন্তে বছরে একটি দিন অন্তত আমাদের এ ভাবে মেলামেশা নিতান্ত আবশ্যক—আমোদ করতে, স্ফূর্তি করতে। একই উপায় থেকে সবাই যখন আমরা জীবিকানির্বাহ করি, তখন আমরা সকলে একই পরিবারভুক্ত।

আজই সেই শুভদিন। আজ কারখানার বাঁশি নীরব থাকুক, কারখানার পরিবর্তে আমার বাড়িতে সবাই মিলেমিশে আনন্দ করা হবে। শোভাযাত্রার সময় যে পতাকা তোমরা বহন করেছিলে, সেই তোমাদের জয়চিহ্ন, তোমাদের হাতে-গড়া মালের প্রতীক। ওকে কেন্দ্র করেই আমাদের গৌরব

পুঞ্জীভূত হয়ে উঠুক—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেমন একখানা রুটিকে কেন্দ্র করে কৃষকের শ্রমচক্র আবর্তিত হয়। কৃষকের শ্রমলব্ধ বস্তু যেমন ভগবানের দান, আমাদের শ্রমলব্ধ দ্রব্যের উপরও তেমনি ঈশ্বরের আশীর্বাণী বর্ষিত হ'ক।

আমাদের পার্বত্যপ্রদেশে কিছু উৎপন্ন হয় না, শুধুই পাথর আর পাথর, মানুষের বড় দুঃখ সেখানে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "ভগবান যখন পৃথিবীতে পাথর ছুঁড়িয়ে দিলেন, আমাদের দেশে এসে তাঁর থলে ছিঁড়ে গিয়েছিল।" সে পাথরও এত খারাপ যে তাতে রাস্তা পর্যন্ত তৈরি হয় না।

অতএব শ্রম দ্বারা আমাদের জীবিকানির্বাহ করতে হবে- এর দ্বারাই আমাদের উন্নতি। এজন্যও আমাদের প্রতিদিন সংগ্রাম করতে হবে--বহু জানা ও অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদা তৈরি থাকতে হবে, কি দেশে, কি বিদেশে।

ভগবান আমাদের সুস্থ মস্তিষ্ক দিয়েচেন, কর্মশক্তি দান করেচেন। আমরা শ্রমের মর্যাদা বুঝি--তার প্রমাণ আমাদের চিমনি আমাদের সুসজ্জিত বাসগৃহ, আমাদের সুখী পরিবার। গত ইলেক্‌সনের সময় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েচে, আমাদের পার্টি তৈরি করতে হয় নি, শ্রম ছিল আমাদের পক্ষ। জগতের সর্বত্র আমাদের দ্বারা উৎপন্ন মালের সুখ্যাতিই আমাদের পুরস্কার।

এজন্য আমরা গর্ব অনুভব করি -এবং সেই গর্ব যেন আপনাদের চোখেমুখে প্রতিফলিত হয়।

বন্ধুগণের প্রতি

(প্রথম ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় প্রেরিত কেব্‌ল্, ১লা মে, ১৯২৫)

অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্চি, অদ্যকার উৎসব দিনে আমি আপনাদের মধ্যে থাকতে পারলাম না। এই দূর দেশ থেকে আমি আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করচি। আজ একটি সামাজিক ঐক্যের পরিবেশ গড়ে উঠুক আপনাদের মধ্যে।

একটি সুবৃহৎ সৈন্যবাহিনীর মত আমরা ছোট বড় কর্মীদলে বিভক্ত, প্রত্যেক দলে ছোট-বড় নেতা বিদ্যমান, তাঁদের সংগে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য, তাঁদের কর্তব্য অধীনস্থ শ্রমিকদের সুখে-দুঃখে অবহিত হওয়া। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পরস্পরের কল্যাণ ও উন্নতির মূল। এই বিশ্বাস ও নির্ভরতা জীবনের বড় সম্পদ ও আমাদের কর্মের সাহায্যকারী বন্ধু। নিজেকে নিজে সাহায্য কর, আর কেউ করবে না।

ভবদীয়
টমাস বাটা

১লা মে, ১৯২৬

[সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে বাটা ক্রমশ বুঝলেন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে—তাদের অবস্থার ক্রমোন্নতি ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি নির্ভর করচে এর ওপর। তাঁর পঞ্চাশৎতম জন্মদিনে এই মহৎ কর্মভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। অতএব ১৯২৬ সালের ১লা মে তারিখের তাঁর বাণীর মধ্যে এই সামাজিক কর্মনীতির মূলসূত্র ব্যক্ত হয়েচে, প্রতিবৎসর তিনি এই কর্মনীতি অনুসারে কাজ করে গিয়েচেন]

বন্ধুগণ, সহকর্মীগণ।

আমার পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তোমরা আমার প্রতি যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেচ, এজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আজ আমি আমার পিতামাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করচি— আমাকে পৃথিবীতে আনয়ন করবার জন্যে, আমাকে জুতো তৈরির কাজ শেখাবার জন্যে এবং সে কাজের প্রতি আমার প্রীতি ও অনুরাগ সঞ্চার করিয়ে দেওয়ার জন্যে।

আমার শ্রমিকদের মধ্যে অসুস্থ যারা রুগ্ন যারা তাদের আমি আজ স্মরণ করচি। আজ তাদের জন্যে হাসপাতাল নির্মাণকল্পে দশলক্ষ ক্রাউন দান করলাম। প্রত্যেক শ্রমিককে অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাদের মূলধন গঠনের ভার নেবে, মূলধন তাদের সেবা করবে। কি করে অর্থসঞ্চয় ও অর্থব্যবহার করতে হয় এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াও আমাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই শিক্ষা দিতে হবে অল্পবয়সেই, সুতরাং আমরা ঠিক করেচি এখন থেকে প্রত্যেক শ্রমিকের পুত্রসন্তান জন্মালে তাকে এক হাজার ক্রাউন পুরস্কার দেব। দশ পার্সেন্ট্ বার্ষিক সুদ দিয়ে আমরা সেই পুত্রের চতুর্বিংশতিতম জন্মদিনে উক্ত পুঁজি দশগুণে বাড়িয়ে দেব। আমরা একই শ্রমিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অতএব আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যাতে অন্তত দশহাজার ক্রাউন মূলধনের অধিকারী হয় উত্তম স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারী হয়—এটা দেখতে হবে। আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখেচি একটি চোদ্দ বছরের ছেলেও এই প্রতিষ্ঠান থেকে তার জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ।

বয়স্ক লোকদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা দূর করবার জন্যে আমরা উৎপন্ন মাল ও মজুরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্চি। প্রত্যেক বিভাগের লাভের অংশ তাদের দেওয়া হবে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সস্তায় পাবে।"

শ্রমিকেরা এ পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে মূলধন ফেলেচে, গত বৎসর তা দ্বিগুণ বেড়েচে তার পরিমাণ প্রায় দু'কোটি ছ'লক্ষ ক্রাউন। সামনের বৎসরে এ টাকা আরও বাড়বে।

কিন্তু আজ ও সব কথা থাক। অর্থনৈতিক জটিল চিন্তার দিন আজ নয়। আমরা বছরে ৩০০ দিন যথেষ্ট খেটেচি আজ সবাই মিলেমিশে একটু আনন্দ করা যাক। আজ এই বৃহৎ শ্রমিক গোষ্ঠীর পরস্পরের সংগে সৌহৃদ্য স্থাপিত হ'ক পরস্পরের উৎসাহ ও কর্মশক্তি বর্ধনে সহায়তা করুক অদ্যকার এই উৎসব।

[১৯২৭ সালে ১৯২৬ সালের ১লা মে দিবসের কর্মসূচী অনুযায়ী বাটা কোন বক্তৃতা দেন নি। তিনি বলেছিলেন 'কর্মই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা।" তিনি সেদিন তাঁর শ্রমিকদের মজুরি, জুতোর দাম ও মজুরদের সঞ্চিত তহবিলের এক হিসাবনিকাশ দাখিল করেন]

১৯২৮ সালে ১লা মে তারিখের উৎসবদিনে তিনি বলেন:

সহকর্মীগণ বিশিষ্ট অতিথিগণ

আমি অদ্যকার দিনে আমাদের উৎসবে আপনাদের অভ্যর্থনা করচি। আমাদের শ্রমিকগোষ্ঠীর বিস্তৃতির সংগে সংগে আমাদের এই উৎসব-দিনের গুরুত্বও বেড়ে চলেচে।

পুরানো আমলে শিল্প ও ব্যবসায় ছিল ক্ষুদ্র। একই ব্যবসায়ের লোকজন একই বাড়িতে এক টেবিলে বসে ভোজন করতো। তাদের ঐক্যানুভূতি ছিল সহজাত, পরস্পরের সাফল্যে ছিল পরস্পরের উন্নতি। কিন্তু আজকাল তা হওয়া সম্ভব নয়—জগতব্যাপী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেচে আমাদের। ১লা মে

দিবসে সবাই একত্র হয়ে পরস্পরের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পাবো. পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি হওয়ার ওপরেই নির্ভর করচে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাফল্য। আগামী বৎসরের জন্য শক্তিসঞ্চয় করা হবে অদ্যকার উৎসব থেকে।

আমাদের কারখানায় আজ আমাদের শ্রমিকদের স্ত্রী, পুত্র কন্যাদিগকে সাদরে আহ্বান করচি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও সাফল্যে তাঁরাও যেন গৌরব অনুভব করেন। তবেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সাফল্য। আজ ১লা মে দিবসে আমরা আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করি।

উপসংহারে আমরা আমাদের প্রেসিডেণ্ট মাসারিক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আমারই দোষ

১৯২৮ সাল পর্যন্ত কারখানায় মাল উৎপাদন ও বিক্রয় বর্ধিত হতে থাকে। জগতের বাজারে বাটার ক্রেডিট্ ও সুনাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল. কয়েকটি বড় ব্যবসায়ীর সংগে বাটার ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপন এই উন্নতির মূলে অবস্থিত। কিন্তু ১৯২৯ সালে বাটা হঠাৎ এই সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বিদেশে মাল রপ্তানীর বড় অর্ডার বাতিল করেন। বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এই সব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অনেকে এটা বাটার খামখেয়ালি, নির্বুদ্ধিতা বলে দোষ দিলে। নানারকম অসুবিধা ও অসাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হ'ল এর ফলে। শ্রমের লভ্যাংশ আর আগেকার মত রইল না। কেন যে এরকম করা হ'ল তার কারণ কিছু বাটা নির্দেশ করলেন না। রপ্তানীর কাজ ভালই চলছিল মূল্য ভালই পাওয়া যাচ্ছিল। এর একটা কারণ ছিল, মাল তৈরি কমিয়ে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া।

প্রত্যেক ক্রেতার সংগে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক স্থাপন ছিল এই নীতির আর একটি উদ্দেশ্য। 'দালাল' বা 'মিডল্‌ম্যান' শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন ছিল এর মূল কথা। এই স্বাধীনতা লাভ করবার জন্যে যে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে বিপুল বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তা তিনি ভালই বুঝেছিলেন। আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এ থেকে, তিনি জানতেন, শুধু তাঁর বিশ্বাস ছিল কর্মের ওপর।

দু'বৎসর পরে তাঁর কারখানার শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে গেল, তৈরি মালের পরিমাণ দ্বিগুণ হ'ল। ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাটা কারখানার শাখা স্থাপিত হ'ল। দোকানের সংখ্যা পাঁচগুণ বেড়ে গেল। ১৯২৯ সালে অনেক লোকে বলেছিল, "এবার বাটা গণেশ ওল্‌টাবে।" ১৯৩১ সালের ১লা মে দিবসের উৎসবে অতিথির সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ হাজার। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেন, "যে কোন অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বড় হবার মন্ত্র জানে এই ব্যক্তিটি।"

তিনি সব দোষ নিজের বলে মেনে নিতেন, কারণ তিনি জানতেন বিরুদ্ধ অবস্থার সংগে সংগ্রাম করে জয়লাভ করবার ক্ষমতা আছে তাঁর। এর পক্ষে কারখানায় প্রত্যেক শ্রমিক অসাফল্যের দোষ নিজের ঘাড়ে ফেলতে চাইত।

১৯২৯ সালের বক্তৃতাঃ—

বন্ধুগণ।

আমি আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করি। আপনাদের বন্ধুত্বের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে গত বৎসরের বিপদের দিনে আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা এতটুকু ক্ষুন্ন হয় নি।

এ বৎসরের উৎসব তেমন প্রীতিকর নয় কারণ কয়েকটি বিভাগে আমরা লভ্যাংশ ও মজুরি বাড়াতে সমর্থ হই নি।

এই অসাফল্যের জন্যে দায়ী আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু আমার দোষ সকলের চেয়ে বেশি। আমাদের বিক্রয়বিভাগকে সময়োপযোগী করে তুলতে না পারাই এ অসাফল্যের প্রধান কারণ। আরও কারণ হচ্চে, মহাসমরের অবসানে বিভিন্ন জাতিসমূহ যুদ্ধের দেনা মেটাতে ব্যস্ত এবং এ বছরের ভীষণ শীত। জিনিস বিক্রয়ের দু'টি সিজন্ এভাবে নষ্ট হ'ল।

কিন্তু যেখানে বাধা, সেখানেই জয়। বীরের সুযোগ রণক্ষেত্রে। আমরা আশা করি আমরা সব বাধা অতিক্রম করে আমাদের শ্রমিক পরিবারের প্রত্যেকের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কাজে সাফল্য লাভ করবোই।

আমার সহকর্মী ও অতিথিগণের প্রতি

(১লা মে, ১৯৩০)

আজ আমাদের জিজ্ঞাসা করবার দিন, অপরের কাছে যে সেবা আমরা পাই, আমরা আমাদের ক্রেতাকে তার উপযুক্ত সেবাদান করতে পারি কিনা। প্রথম হচ্চে আমাদের মজুরির হার সেবার প্রথম মানদণ্ড। সাফল্যের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

অতএব আমাদের চেষ্টা পেতে হবে ক্রমাগত এই মজুরির হার বৃদ্ধি করতে। নীচের দিকে মজুরির হার আমরা এখনও বাড়াতে পারি নি তার কারণ গতবৎসরের ব্যবসায়ের দুর্বিপাক।

এখনো আমরা সর্বোচ্চ মজুরির হারে পৌঁছুতে পারি নি, তবে সে চেষ্টায় আমরা আংশিক সাফল্যলাভ করেচি নিশ্চয়। আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দান-কারণ তারাই আমাদে মূলধনের মালিক।

হিসাবের খাতা অনুসারে দেখা যাবে শ্রমিকেরা কারখানার কাছে দেনাদার নয় ররং কারখানাই শ্রমিকদের কাছে দেনাদার। এই ঋণের পরিমাণ ৭ কোটি ৪ লক্ষ ক্রাউন এর জন্যে আমরা তাদের বার্ষিক দশ পার্সেণ্ট্ সুদ দিই।

আমরা কেন মজুরির হার বৃদ্ধি ও কারখানার লাভের হিসাবনিকাশ প্রকাশ করি? অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। আমরা এ বিশ্বাস ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্টি করবো যে কারখানা শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনে ব্যগ্র তারা শক্তিমান হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতায় তারাই জয়ী হয়। তাদের মন স্রষ্টার মন। আমার মনে হয়, সে দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অংশীদারদের লভ্যাংশ বণ্টনের হিসেবের সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি-বৃদ্ধির হিসাবও প্রকাশ করবে।

কিন্তু মজুরির হার সাধারণ সুখ-সাচ্ছন্দ্যের একটা অংশ মাত্র, বাকিটা নির্ভর করে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের সুলভতার ওপর। বেশি মজুরি ও সস্তা জিনিস সম্ভব হয় যদি কারখানার মালিক ও কৃষকের দল জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেন।

উপসংহারে আমি আমাদের প্রেসিডেণ্ট মাসারিক, আমাদের চেকোশ্লোভাক্ রিপাবলিক্ ও আমাদের কারখানার বিজয় ঘোষণা করি।

১লা মে, ১৯৩১

[নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বাণী টমাস বাটা দান করেছিলেন ব্যবসায়ের অত্যন্ত দুঃসময়ে। ইউরোপ ব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্দিন, সকলের মুখেই এক কথা, "কিছু করবাব নেই, ভাল দিন ফিরে আসুক।" ৮০,০০০ লোক তাঁব বক্তৃতা শুনেছিল, তাব মধ্যে ২৩,০০০ লোক তাঁর কারখানাব শ্রমিক। এই দুর্দিনে বাটাব কাবখানার নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিল, মাল তৈরিব পরিমাণ বেড়েছিল নতুন যন্ত্র, গৃহাদি নির্মিত হয়েছিল—জিলিন্ সহরও ক্রমশ বিস্তৃততর আকাব ধারণ করছিল এই সময়েই। তাঁর ১৯২৯ সালের পরিকল্পনা এবার বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করছিল]

বন্ধু ও সহকর্মিগণের প্রতি টমাস বাটার বক্তৃতা
(১লা মে, ১৯৩১)

আমি আজ আপনাদের এখানে অভ্যর্থনা করছি। আমাদেব আনন্দ উৎসব করবাব যথেষ্ট কাবণ আছে এ বছর। দু'বছর আগে এ মাসের বিক্রয় বিভাগের বড়ই দুর্দিন গিয়েছে। সেদিন আমি বলেছিলাম যে ব্যাপারের জন্য আমিই দায়ী

আপনারা প্রমাণ করেছেন যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারে না। মূলধনের দাসত্ব নয় আমরা আমাদের স্বাধীন করেছি মূলধনকেই করেছি আমাদেব ক্রীতদাস।

যতদিন যতদিন আমাদের কর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো ততদিন কোন দুর্দিনই আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে সমর্থ হবে না। এখন আমাদের সম্মুখে মহৎ কর্তব্য বিদ্যমান—মজুরির হার বৃদ্ধি খাটুনির সময় কমান ক্রেতাদের সস্তাদরে মাল সরবরাহ করা।

ভবিষ্যতকে ভয় যেন আমরা না করি। জগতের অর্ধেক লোকে খালি পায়ে বেড়ায় এবং শতকরা পাঁচজন অধিবাসীর পায়েও ভাল জুতো নেই।

জগতের সমস্ত জুতো ব্যবসায়ীদের সম্মুখে কি বিরাট কর্তব্য বিদ্যমান।

টমাস বাটার শেষ ছুটির উৎসব

[১৯৩২ সালের ১লা মে এই বক্তৃতা বাটা কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনেব আড়াই মাস পরে। বক্তৃতার মধ্যে তাঁর মনের দৃঢ়তা ও আত্মশক্তিব ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। সেদিন তিনি বা তাঁর চারিপাশে দাঁড়িয়ে যারা তাঁর বাণী শুনেছিল, কেউ ভাবে নি যে তাঁর জীবনেব দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাঁব অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সেদিন বক্তৃতাব মধ্যে দিয়ে মহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেছিল যেন, তাঁর প্রত্যেক উক্তিটি ভবিষ্যদ্বাণীর মত ফলে গিয়েছিল। তিনি তাঁর কর্তব্য কর্ম এমন সুচারুভাবে সম্পাদন করেছিলেন, তাঁর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে এমন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন—যে তিনি সব সময়েই মুক্ত, মৃত্যুর জন্যে সব সময়েই তিনি প্রস্তুত]

বন্ধুগণ,

আজ আমাদের আনন্দ করবার সুসংগত কারণ আছে, এই দুর্দিনেও আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেচি, কারণ আমরা পরিচালিত হয়েচি কারখানার দেওয়ালে লেখা আমাদের জীবনের মূলমন্ত্রটি দ্বারা: "আমরা উত্তমর্ণ হ'ব, অধমর্ণ কখনো হ'ব না।"

আমরা কার কাছে এজন্য ঋণী নই, নিজেদের কাছে ছাড়া। সব ট্যাক্স আমরা শোধ করেচি। জগতের মধ্যে যত জুতোর কারখানা আছে, আমাদের কারখানার যন্ত্রপাতি সর্বোৎকৃষ্ট। আমরা সবল ও সুস্থ দেহে কাজ করে যাব, জগতের বহুলক্ষ লোক এখনও খালি পায়ে বেড়ায়—কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সংগে ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করবার কোন অন্ধিসন্ধি এখনও পাই নি, তাদের ভাষাও জানি নে আমরা।

এই প্রতিষ্ঠান তোমাদের জন্যে, তরুণ সম্প্রদায়ের জন্যে। তোমরাই আমার ব্যবসাকে বাড়াবে, আমাদের জেলা, সহর ও স্টেটকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। তোমরা একবাক্যে আমার সংগে আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি মিঃ চের্নি, আমাদের প্রধান মন্ত্রী মিঃ উদ্রেশাল এবং স্টেটের সভাপতি গ্যারিগ্ মাসারিকের প্রতি শ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ কর।

সহকর্মিগণ,

অনেকে ভাবেন পরিশ্রম ও সমস্যার সংগে সংগ্রাম করা যায় হাসিমুখে। কিন্তু তা নয়, মুখে হাসি নিয়ে আমরা ক্রেতাদের সংগে দেখা করবো। আর হাসিমুখ দেখাবো বাড়ি ফিরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সামনে। কারখানায় দিনব্যাপী কঠোর শ্রম ও জীবন-সংগ্রামের মধ্যে হাসির স্থান কোথায়?

আজকাল দেশের বড় বড় লোকের মুখে নিরাশার ছায়া। এর কারণ, তাঁরা তোমার জীবন দৃঢ়তর ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেন দিনরাত। আমার উপদেশ, বিপদকে ভয় ক'র না—পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হ'লেও ভয় করার কারণ নেই জেন।

সংগ্রাম থেকেই বিজয় আসে। যুদ্ধ ভিন্ন জীবন কিসের? আমাদের কর্মই আমাদের উন্নতির সোপান। কর্মের জয় হ'ক!

[চেকোশ্লোভাকিয়ার দেউলিয়া ব্যাংকগুলি স্টেটের আইন দ্বারা দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। বাটা এই আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, যে অসাধু তার শাস্তি হওয়া দরকার, নতুবা শ্রমিকের বিপদ, কারখানার মালিকের বিপদ, জাতির উৎপাদনের শক্তির পক্ষেও এ আদেশ বিপজ্জনক]

দেউলে-পড়া ব্যাংকগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

খবরের কাগজে আপনারা দেখেচেন স্টেট্ ব্যাংকগুলিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েচেন। কিন্তু নৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এখনও স্থিরীকৃত হয় নি, শুধু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার কথাই উঠেচে।

নৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে, যখন ব্যাংকগুলির কর্তৃপক্ষ গত দু'বৎসরের লাভসহ তাঁদের শেয়ারের কাগজগুলি ফিরিয়ে দেবেন। তাঁরা যে অতিরিক্ত লাভ করেচেন ওই সময়ের মধ্যে, তাও ফিরিয়ে দেবেন। তাঁরা তাঁদের পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন কিনা, একথাও পরিস্কার করে বলা হয় নি।

অনেকেই এ সংবাদ শুনে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন—এ সংবাদ আমাদের স্টেটের অর্থ-নৈতিক সাধুতার পক্ষে অতীব লজ্জাস্কর। ১৯২২ সালে ডাঃ রাসিন্‌ যখন অর্থসচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত, সেই নৈতিক দুর্দিনে যাঁরা হাসিমুখে নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়েছিলেন, তাঁরাই সর্বাপেক্ষা দুঃখিত হবেন এ সংবাদে।

সে সময় ডাঃ রাসিন্‌ ব্যবসায়ের ক্ষতির অংশ ক্রেতাদের কাঁধে চাপান ব্যাপারটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তার ফল কি হ'ল? কয়েকটি অলস ও অসাধু ব্যবসায়ী যারা কাজ থেকে বিরত হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে ছিল—তারা :.এপ্রকৃতির ব্যাঙ্কারদের আশ্রয় গ্রহণ করলে। ব্যাঙ্কার আশ্রয় নিলে স্টেটের লোহার সিন্দুকের পেছনে।

১৭জন লোকের বোর্ড ১॥৹ মিলিয়ার্ড টাকা ভাগ করে দেবার ভার পেয়েছে স্টেট্‌ থেকে—টাকাটা স্টেটেরই। কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের এমন ক্ষমতা নেই যে তারা নিজেদের সম্পত্তির তদারক করে। রাসিনের প্রচারিত অর্থনৈতিক সাধুতার যথার্থ প্রতিবাদ বটে।

তাঁর বাণী ছিল:—

কর্ম কর ও সঞ্চয় কর।

আমাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সততার অবনতি পরিলক্ষিত হয় এ থেকে। অর্থনৈতিক দুর্দশা ও মুদ্রাসংকটের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলে এগুলিকে আমরা ধরতে পারি।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য ধীরে ধীরে কমে আসছে, এ থেকে বোঝা যায় স্টেটের কর্তৃপক্ষ আইন দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে অক্ষম। সম্পদ বৃদ্ধি থেকে নৈতিক উন্নতির সৃষ্টি হয়। জাতীয় ব্যাঙ্কের গভর্ণর সেই কথাই বলেছিলেন, তাঁর বাণী, "অর্থনৈতিক নীতি সুদৃঢ় কর, মুদ্রা-সংকট দূর হবে।"

বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। বিপদ শুধু দেড় মিলিয়ার্ড ক্রাউন ক্ষতির জন্যে নয় অসাধুদের প্রশ্রয়দানের জন্যে।

আমরা সাধারণের অবগতির জন্যে একখানি পুস্তিকা প্রচার করছি। এটা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করি। এ পুস্তিকা আমরা কর্তৃপক্ষদের নিকটও পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন কাজ হয় নি এপর্যন্ত। ১৯২২ সালে আমাদের যে সব সহকর্মী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্যে স্বার্থত্যাগ করেছিলেন-তাঁদের কাছে এই শোচনীয় সংবাদ পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য বিবেচনা করি।

অর্থ আছে, বিশ্বাস নেই

যে সব ব্যাঙ্ক ডিপোজিটরদের বিশ্বাস অর্জন করেছিল, তাদের মোটা লভ্যাংশ জাতীয় ব্যাঙ্কে বিনা সুদে পড়ে আছে। তারা বলে, দেশের অর্থনৈতিক দুর্দিনে বিশ্বাস নেই কাউকে।

বিশ্বাস! সমস্ত প্রগতি ও মঙ্গলের মূলে এই বস্তুটি বিদ্যমান। লোকের প্রতি লোকের বিশ্বাস, সমাজের প্রতি সমাজের বিশ্বাস। বিশ্বাসের অভাবেই সেকালে নগরের চারিধারে প্রাচীর তুলে দিত, আজকাল তালাচাবি ও লোহার সিন্দুক বানায়।

কিন্তু বিশ্বাসে কি হয়? ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, ডিপোজিটরদের টাকায় কারখানা গড়ে ওঠে। বৃদ্ধ লোকের টাকা বিশ্বাসবলে তরুণবয়স্ক, সাহসী, যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়ে বৃদ্ধি পায়—তার ফলে

মজুরির হার বাড়ে, কর্মের নব নব প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, জিনিসের দাম কমে, স্টেটের অর্থব্যয়শক্তি বাড়ে।

সেদিন একজন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার দুঃখ করে বলছিলেন, টাকা যথেষ্টই আছে, কিন্তু এমন কোন বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না, যাকে বিশ্বাস করে ১০,০০০ ক্রাউন ধার দেওয়া চলে। তাঁদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এমন লোক খুঁজে বার করা।

দোষ কার? আমাদের সবারই। উকিলদের দোষ তারা অসাধুতার প্রশ্রয় দেয়, আমাদের সমাজের দোষ, যে আজ টাকা শোধ করবো বলে কাল দেয়, তার দোষ।

চিঠি-পত্র লেখা

(১৯৩২ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

বাটা চাইতেন, তাঁর সহকর্মিগণ তাঁর সব কথা বুঝতে যেন অক্ষম না হয়। ব্যবসায়ের সুনাম রক্ষা তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেষ্টা পেতেন যাঁরা তাঁর সংশ্রবে আসবে বা যাঁরা তাঁর কারখানায় বর্তমান বা ভূতপূর্ব শ্রমিক--সকলেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

লিপিলিখন মানে শুধু চিঠি লেখা নয়--ব্যবসা, স্টেটের কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। চিঠিতে যেন পরিষ্কারভাবে সব কথার উল্লেখ থাকে।

চিঠিপত্রে জগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র সংস্থাপিত হয়। চিঠি দ্বারা আমাদিগকে সবাই চিনতে পারে। আমাদের নীতি হওয়া উচিত, কারো কাছে আমরা ঋণী থাকবো না। হঠাৎ একখানা চিঠি এল, অমুক বছরের দেনাটা শোধ কর। তখনই আমাদের নীতির মূলে কুঠারাঘাত পড়লো, একথা যেন আমরা স্মরণ করি।

অনেকে চিঠিপত্র লেখেন বটে, কিন্তু পাওনাদার যদি টাকা চেয়ে পাঠায়, তবে নীরব থাকেন। এটি লজ্জার কথা। যে পাওনাদারে ধারের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাদের ধন্যবাদ দিয়ে তখনি টাকা পরিশোধ করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

সব চিঠিপত্র মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'জমা' ও 'খরচ'। যারা আমাদের কাছে টাকা চায়, নিশ্চয়ই তাদের প্রমাণ আছে যে আমরা তাদের কাছে ধারি—খড়ির টুকরো দিয়ে যদি দোরের গায়ে সে দেনার কথা লেখা থাকে, তবুও সেটা দেনা। দু'বার যেন দেনা চেয়ে না পাঠায় কেউ। চিঠি পড়ে তখনি তার দেনাশোধের ব্যবস্থা করে ফেলবে। চিঠিপত্রে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা না করে স্পষ্টভাবে সব কথার উল্লেখ করবে।

১৯০৭ সালে আমি কারখানার কলকব্জা নিয়ে থাকতাম। আপিস দেখতাম না--ফলে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল আপিসে। যখন আমার দৃষ্টি পড়লো সেদিকে, আপিসের অর্ধেক কেরাণীকে ডিস্‌মিস্ করলাম—বাকী অর্ধেক নিজেদের অপমানিত বিবেচনা করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। দিনে কারখানায় খাটি, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাত জেগে আপিসের চিঠিপত্রের জবাব দিই। চিঠিপত্র লেখা হ'ত জার্মান ভাষায়--কিন্তু তখন আমি জার্মান জানি না। সুতরাং পত্রে শুধু সংক্ষেপে 'হাঁ' কি 'না' লিখতাম। বেশি লেখার সময়ও ছিল না।

নিজেদের দেনা শোধ কর! যে কোন দেশের যে কোন ব্যবসায়ী চিঠিপত্রের এ উত্তর বুঝতে পারবে। তাদের দেনা শোধ দাও। চিঠিপত্রের এর চেয়ে সদুত্তর কি আছে?

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ—বরখাস্ত

লোকে মোটা মাইনের চাকরি জোটানোর কথাই ভাবে, কিন্তু যদি কাজ ভাল না লাগে তবে চাকরি ছাড়ার কথা কেউ ভাবে না। কর্মে আনন্দই উন্নতির প্রধান সোপান। তারা কিছুদিন বেশ চাকরি করে, তারপর আসে ক্রেতা বা ম্যানেজারের অসন্তোষ তাদের কাজকর্মে, তখনি তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। কোথায় সে চেয়েছিল বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতি, তার বদলে এই নতুন উপসর্গ জোটে। অসুখের ভান করে কিছুদিন কর্ম থেকে অবসর নিতে চায়। কিন্তু এতে ব্যাপারের মীমাংসা হয় না।

অন্য লোকে সাহস সঞ্চয় করে বটে কিন্তু ঠিক ব্যাপারের জন্যে নয়। ক্রেতার বা মালিকের মন বুঝতে চেষ্টা না করে তারা আগে থেকেই ঠিক করে রাখে যে ওরা যা চাইছে তা অসম্ভব, তার কাজে কোন গলদ নেই, এ শুধু তাদের বদমাইসি। ঝগড়াদ্বন্দ্বে সময় ও শক্তি অযথা ব্যয় করে শেষ পর্যন্ত তারা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সকলের ওপর বিরক্ত হয়ে।

যারা বুদ্ধিমান তারা ক্রেতা বা ম্যানেজারের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাদের দোষ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে। যদি বেশি কাজ থাকে, তবে কাজ শেষ করে সে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, যদি না কাজ পেরে ওঠে ভদ্রভাবে বিদায় গ্রহণ করে। সত্যিকার কাজ ভালবাসে এমন লোক বেশি পাওয়া যায় না, তারাও জানে। নতুন লোকের কাজের সঙ্গে তারা পূর্বের লোকের কাজের তুলনা করে দেখে এবং এইভাবে পুরানো লোকের প্রত্যাবর্তনের রাস্তা খোলা থাকে সর্বদা।

এই সেতু সব সময় খোলা রাখা দরকার উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্যেই সেটা নিতান্ত আবশ্যক।

রক্ষক

[মানবের উপকারের জন্য স্বাধীন ও সুস্পষ্টভাবে কাজ করতে গিয়ে টমাস বাটা সব সময়েই মানুষের নিকট থেকে প্রবল বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁর কাজে অতিরিক্ত বাধাদান করেছে। তিনি সাহসী ছিলেন বটে কিন্তু অনর্থক দ্বন্দ্বনীতি পছন্দ করতেন না। সত্যকে আশ্রয় করে চলতেন বলেই অনেক সময় হয়তো দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়ে পড়তো—কিন্তু এ দ্বন্দ্ব অন্য প্রকারের। তিনি তাঁর নীতি খুলে বলতেন প্রতিপক্ষের কাছে, তাঁর সব মতলব, প্ল্যান, হিসাব, নক্সা তাদের সামনে খুলে ধরতেন, এভাবে তিনি তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করতেন। অন্য অন্য জুতো ব্যবসায়িগণের পক্ষাবলম্বনকারী কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তাঁর নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি পাঠ করলে বোঝা যাবে, টমাস বাটার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল চীনের দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ।]

মাল তৈরির নতুন পথ

(১৯২৪ সালের বক্তৃতা)

আমাদের কারখানা আমার নামে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে এটা সাধারণের সম্পত্তি। অন্য কারখানার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, আমাদের মহাজন হচ্ছে আমাদের শ্রমিকগণ, প্রত্যেক বিভাগের লভ্যাংশ কারখানার মালিকের মত তাদেরও পকেটে যায়—শীঘ্রই পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকগণ কারখানার অংশীদার

হবে। আমি দয়া করে যে এটা করচি তা নয়—আমার দৃঢ় বিশ্বাস বড় বড় কারখানা সাফল্য অর্জন করে তখনি, যখন তারা জনসাধারণের সেবাভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ক্রেতা ও শ্রমিকগণও কারখানার ক্ষতি সহ্য করতে পারে না, এর স্বার্থ নিজেদের স্বার্থ বলে ভাবে তখন। শ্রমিকগণ ভাবে নিজের কারখানায় কাজ করচি, সুতরাং কাজ অনেক ভাল হয়।

জুতো ব্যবসায়ীদের সভায় আমার এবং আমাদের কারখানার বিরুদ্ধে অনেক অপমানজনক কথা ও গালিগালাজ বর্ষন করা হয়েচে আমি শুনিচি। এ সব লোকের জন্যে আমার কষ্ট হয়। এদের কোন দোষ নেই, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের হাতে এরা ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। আমি সব সময়েই চেষ্টা করি, কি ভাবে এদের আমার মতে নিয়ে আসতে পারবো। কি করে তাদের উপকার আমি করতে পারবো। আমি কার্য দ্বারা দেখাতে চাই আমার কারখানা উদার মনুষ্যত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—এখানে সকলেরই ঠাঁই আছে। আমার কাজে আমি কারো সাহায্য চাই না, স্টেটেরও না—কেবল চাই, ওরা আমায় যেন নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেয়। কোন রাজনৈতিক দলকে আমি ভয় করি না, গ্রাহ্যও করি না। আমার শ্রমিকগণ নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে জানে।

আমাদের দেশের লোক যেদিন বুঝবে যে কৃষিকার্যে দেশের উন্নতি হবে না, উন্নতি হবে শিল্পে, বাণিজ্যে- তখন এ দেশের উন্নতি সম্ভবপর হয়ে উঠবে। কারখানার মালিকেরাও যদি সত্য উপলব্ধি করেন, তবে তৈরি মালের দাম কমে যাবে, অত্যন্ত গরীব লোকেও সস্তায় মাল কিনতে পারবে। কৃষকেরা রাসায়নিক সার প্রাপ্ত হবে ক্ষেত্রের জন্য, অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হবে। ভূমাই মঙ্গলের কারণ। হাতে কাজ করলে কতটুকু মাল তৈরি করা সম্ভব হয়? ক'জনের মঙ্গল হয় তার দ্বারা?

[বাটার বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল জুতোব্যবসায়ীদের সভায় যে তিনি জুতোর কারিকর নন আদৌ। টমাস বাটা একটি বক্তৃতা দ্বারা এই অভিযোগের জবাব দেন। তা ছাড়া এ নিয়ে তিনি আদালতে মোকদ্দমা করেন সে সময় প্রমান করেছিলেন শুধু তিনিই যে জুতোর পাকা কারিকর তা নন, তাঁর বংশ তিনশত বৎসর ধরে জুতো তৈরির কাজ করে এসেচে]

মিথ্যা গুণের দলিল

পার্লামেন্টের মেম্বর মিস্টার মল্‌কোচ প্রতিনিধি সভায় প্রমান করতে চেয়েচেন যে উহেস্কর্ হ্রাদিস্তের 'ব্যবসায়ী সমিতি' আমাকে জুতোর কারিকর বলে যে সার্টিফিকেট দিয়েচেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে উক্ত সমিতির খাতায় আমার পরলোকগত ভ্রাতা আন্তোনিন্ বাটার নাম লেখা ছিল, সেই নাম কেটে আমার নাম বসানো হয়েচে। মিঃ ফ্র্যাংক্ ভর্‌স্কি কিছুদিন পূর্বে মিঃ মল্‌কোচ কর্তৃক অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত জনৈক ভদ্রলোক, মিঃ ভ্রানাকে এই খাতা দেখিয়েছিলেন, 'শিক্ষানবিশ' হিসেবে আছে আন্তোনিন বাটার নাম কিন্তু 'ওস্তাদ কারিকর' হিসেবে আছে টমাস বাটার নাম। তিনি বলেন যে আন্তোনিন বাটা আমার পিতা, সুতরাং তিনিই ছিলেন ওস্তাদ কারিকর, আমি তাঁর ছেলে এবং শিক্ষানবিশ।

আমার প্রতিপক্ষদল এই ভ্রম কিছুদিন পরে আবিষ্কার করেন এবং দেখান যে আন্তোনিন বাটা আমার পিতা নয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

মিঃ মল্‌কোচ! আপনার উক্তি এই যে আমার সার্টিফিকেট মিথ্যা এবং আপনি চৌদ্দজন সাক্ষী দ্বারা প্রমান করবেন যেঃ—

(১) আমি জুতোর কারখানায় কোনদিন শিক্ষানবিশ ছিলাম না,

(২) ১৭ বছর বয়সে আমি আমেরিকা যাত্রা করি।

আমি সর্বসাধারণের সমক্ষে এই উক্তির প্রতিবাদ করে বলচি যে আপনার একজনও সাক্ষী নেই যে এ কথা প্রমান করতে পারবে।

আমি আপনাকে অনুরোধ করচি, পার্লামেন্টের বাইরে আপনি একথা একবার উচ্চারণ করুন - তাহ'লে আমি আপনার নামে মোকর্দ্দমা করবো, আমার এবং জুতো ব্যবসায়ী সমিতির সম্মান রক্ষার জন্যে এ কাজ আমার করতেই হবে। আমি জুতো তৈরি করেচি যখন আমার ৫ বছর বয়েস তখন থেকে, বাবার কারখানায় চামড়ার টুকরো জোড়াতালি দিয়ে ছোট ছোট জুতো তৈরি করতাম। ১৪ বছর বয়েস পর্যন্ত বাবার কারখানায় আমি কাজ শিখেচি ভাইয়ের কারখানায় আরও ৭ বছর হাতে কলমে কাজ করি। জুতো তৈরি বা মেরামত করা ছাড়া জীবনে আমি কোন কাজই করি নি। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েচি এই কাজ শিখবার জন্যে।

আমার পূর্বপুরুষেরা এই কাজই করতেন, আমার ঠাকুমা, দিদিমা, মা যে বংশ থেকে এসেচেন, তারাও জুতোর ব্যবসায়ই করতো। সপ্তদশ শতাব্দীতেও জুতোর ব্যবসায়ই ছিল আমাদের বংশের জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা।

এখন মিঃ মল্‌কোচ বলতে এসেচেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে উঠে যে স্টেট্ কেন আমার কাজে বাধা দেন নি।

তিনি কি কারিকর সভার প্রতিনিধি স্বরূপ একথা বলচেন?

আমার পূর্বপুরুষদের সুনাম ও সম্মান রক্ষার জন্যে আমাকে আজ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর উক্তির প্রতিবাদ করতে হচ্চে।

ব্রনো বাটা-বিরোধী জুতো ব্যবসায়ীগণের সভা

(১৯২৪ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদল জুতো ব্যবসায়ীদের আমার বিরুদ্ধে ভিড়িয়ে দিয়েচেন। তারা কতকগুলি সভা করে প্রমাণ করতে চেয়েচেন যে আমার ব্যবসায় ও কারখানা অন্য জুতোর কারিকরদের সর্বনাশ সাধন করচে। এ বিষয়ে আমি অনেক বেনামি চিঠি পেয়েচি, তাতেও আমাকে অনেক ভয়ভীতি দেখান হয়েচে এ নিয়ে। জুতোর কারিকরদের দুঃখ অপরিসীম। আমি তাদের দুঃখ বুঝি, সে দুঃখ কিছুদিন আগেও আমাদের সঙ্গী ছিল। প্রত্যেক মুচী তার কারখানায় দশজন শিক্ষানবিশ রাখে, তাদের মধ্যে অনেকেই চলে যায়, যারা ওস্তাদকে ছেড়ে দিতে সাহস করে না তারাই থাকে।

মুচীরা সংকীর্ণ, ছোট ঘরে পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করে সেই একই ঘরে তার মিস্ত্রি ও কারিকরেরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে। সপ্তাহের মধ্যে শনিবারে হয়তো ঘর পরিষ্কার করা হয়। গ্রীষ্মকালে ঘরে একটু আলো হাওয়া আসে, শীতকালে তা অসম্ভব। ঘরের মধ্যে সকল সময়েই লোকের ভিড়। পরিষ্কার করবার সময় হয় না, জায়গাও থাকে না। কিন্তু জুতোর কারখানায় শ্রমিকেরা অনেক ভালভাবে বাস করে। তার বাড়ি-ঘরে আলো হাওয়া যথেষ্ট, পচা চামড়ার গন্ধ নেই সেখানে।

মিঃ মল্‌কোচ বেশ ফন্দি বার করেছেন। এই ৬০,০০০ হাজার দুঃস্থ মুচীকে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিতে উত্তেজিত করতে চান। কেননা তাঁর মত তাদের এই দুঃখ দুর্দশার আমিই নাকি কারণ। তিনি আইন দ্বারা তাদের অবস্থা ভাল করতে চান। জুতোর কারিকরকে তিনি জুতো মেরামত করতে আইন দ্বারা বারণ করে দেবেন। অর্থাৎ জুতোর কারিকরকে তিনি তাদের ভুল শোধরাতে দেবেন না। এ আইন মানুষের বা ভগবানের আইনের বিরোধী--মানুষ যদি ভুল করে তবে ভগবানও তাকে ভুল শোধরাবার অবকাশ দেন।

আমাদের মেরামতি কাজ লাভের নয়, ক্ষতিতে চলছে। এই সব বিভাগের কাজ মাল তৈরি সময়কার ভুলচুক বার করা এবং অনতিবিলম্বে সেটি দূর করা পুরানো জুতোর দোষ খুঁজে দেখা ও সংশোধন করা।

ষ্টীম ও ইলেকট্রিসিটি দ্বারা জুতোর কারখানায় বড় বড় হলে কাজ হয়, সে হলগুলি কারখানার মত না দেখিয়ে কেথিড্রালের মত দেখায়, যেখানে দু'জন লোকে ৮ ঘন্টায় ৩০ জোড়া জুতো তৈরি করতে পারে--পুরোনো আমলের মুচীরা ঐ পরিমাণ জুতো একমাসে তৈরি করতে পারে।

এক বিভাগে কলে কল তৈরি হয় সস্তায় জুতো মেরামত করে দেওয়া সে কলের কাজ। ল্যাবরেটরিতে কেমিস্টগণ চেষ্টা করছেন এমন উপায় বার করতে, যার সাহায্যে ক্রেতারা নিজেরাই ছোটখাটো মেরামত করে নিতে পারে। আমাদের বিভাগ আরও চেষ্টা পায় জুতোর দাম কমাতে যাতে লোকে জুতো ছিঁড়ে গেলেই একজোড়া নতুন জুতো কিনতে পারে।

আমার জীবনের কর্তব্য হবে এমন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা যা উদার মনুষ্যত্বের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের বড় বড় কারখানার সঙ্গে যা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সমর্থ হবে - ক্রেতাদের সস্তায় মাল বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা, অন্য কিছু নয়।

কিন্তু তত বড় প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশে কোথায়? জিনিস বিক্রী কম হ'লে মজুরির হার হবে কম, মাল তৈরির খরচও হবে বেশি।

কাজেই আমাদের চেষ্টা পেতে হবে সারা জগতে ব্যবসা বিস্তার করতে। জগতের বাজারে আজকাল জুতো ব্যবসায়ের অবস্থা বড় মন্দা। প্রত্যেক দেশই জানে এ সময় যদি তারা নিজেদের নিজেদের জুতোর ব্যবসা জগতের বাজারে দাঁড় করাতে না পারে তবে নিজের দেশটি ছাড়া আর কোথাও তাদের তৈরি মালের খদ্দের মিলবে না যেমন হয়েছে সেলাইয়ের কল ও মোটরগাড়ির ব্যাপার।

আমাদের ব্যবসায়ে আমরা বড় বড় জুতো ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার ভয় তত করি না। জগতের সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির বাজারে যারা এ ব্যবসায়ে উন্নতি করছে, তাদের ক্রিয়াকলাপ আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। মিঃ মলকোচের মত স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিকও সেখানে নেই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জুতো ব্যবসায়ীদের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করতে প্রস্তুত।

প্রাহার জুতো ব্যবসায়ীদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা

সহকর্মিগণ

আপনারা সভা করে আমাদের কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। সে সভার অধিবেশন প্রাহার পরিবর্তে জ্লিনে হওয়া উচিত ছিল।

জিল্‌ন্‌ সহরে আপনারা স্বচক্ষে দেখতে পেতেন আমরা শ্রমিক ও জ্‌তোর কারিকর সম্প্রদায়ের স্‌খ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কি ব্যবস্থা করেচি। যার বির্‌দ্ধে আপনাদের অভিযোগ, সে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে শ্‌নে তবে অভিযোগ উত্থাপন করাই ভাল নয় কি?

আমাদের কারখানায় যারা জ্‌তো তৈরি করে তারা ম্‌চী, যারা জ্‌তো মেরামত করে তারাও ম্‌চী। আমার জীবনের উদ্দেশ্য যাতে এরা স্‌খে-স্বাচ্ছন্দে থাকতে পায়, যাতে ক্রেতারা সস্তায় জিনিস পায়। এরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, স্বপ্নেও কোন দিন তার ধারণাও তারা করতে পারতো না।

আপনারা জ্‌তো মেরামত করে সামান্য যা আয় করেন, তার অনেক বেশি আয় করে আমাদের কারখানার একজন মিস্তি। খরিদ্দারের পক্ষেও স্‌বিধে, তারা সস্তায় অনেক ভাল কাজ পায়।

জিল্‌ন্‌ সহরে আমাদের কারখানা ও শ্রমিকদের জীবন দেখলে আপনারা আপনাদের মত বদলে ফেলবেন নিশ্চয়ই। যেমন শত শত ম্‌চীর কাছে আমি শ্‌নিচি—তাঁরা আমাদের কারখানা দেখে বলেচেন, "মিঃ বাটা, আমি ব্‌ড়ো হয়েচি এখন নতুন করে করবার বয়েস নেই আমার। আমার ছেলেকে নিয়ে শিক্ষা দিয়ে মান্‌ষ করে তুল্‌ন, যেমন হাজার ছেলেকে আপনি মান্‌ষ করে তুলেচেন।"

আমি আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্চি, আপনারা জিল্‌নে এসে কারখানা দেখ্‌ন। আমি আপনাদের বন্ধ্‌ হতে চাই, এ দ্বারা আপনাদের ও আপনাদের সন্তানসন্ততিদের কল্যাণ হবে।

আপনারাও আমাদের ভয় করবেন না। যারা আপনাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নাচায়, তাদের কথা বিশ্বাস না করাই উচিত আপনাদের। আপনাদের ক্ষতি করে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নামযশ কিনতে চায়।

সেদিনকার হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েচে স্বাধীনভাবে জ্‌তো তৈরির ব্যবসা করে, এমন লোকের সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারের বেশি নয়। কিন্তু আমাদের কারখানায় বিভিন্ন বিভাগে প্রত্যেক দিন ২৭,৬৩৫ লোক কাজ করে এবং আমরা মেরামত বিভাগে গত বৎসর ২,৩২০ লোককে শিক্ষাদান করেচি। এই শিক্ষাপ্রাপ্ত ম্‌চীদের মধ্যে ১·৩ পার্সেণ্ট্ জ্‌তোর দোকানে আজ ম্যানেজারি করচে।

আমরা শীঘ্রই বিদেশে ২,০০০ দোকান খ্‌লবো, সেজন্যে আমাদের এখনও অনেক কারিকর দরকার। আমরা রাসায়ণিক উপায়ে জ্‌তো পরিষ্কারের একটি বিভাগ খ্‌লেচি, তার উদ্দেশ্য আমাদের মেয়েদের ধ্‌লো ও কাদা থেকে ম্‌ক্তি দেওয়া। এই বিভাগে ৮ ঘণ্টা কাজ করে আপনারা অনেক বেশি আয় করতে পারবেন এখনকার চেয়ে।

যাঁরা মনে করেন স্বাধীনভাবে কাজ করবেন, কোন কারখানায় চাকরি না নিয়ে তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ আমরা ব্যবসায়-সচিবের নিকট যে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেচি, তদন্‌যায়ী আপনাদের মধ্যে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌ন। এই প্রস্তাবগ্‌লি প্‌স্তিকাকারে আপনাদের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হয়েচে।

পরের কথায় কান দেবেন না, তবেই আপনাদের মঙ্গল হবে। কতকগ্‌লি দল আছে, তারা তাদের খারাপ জ্‌তোগ্‌লি আমাদের কাছে বিক্রয়ের জন্যে নিয়ে আসে—আমরা নিতে রাজি না হ'লে আমাদের বির্‌দ্ধে আন্দোলন স্‌র্‌ করে। তারা ভাবে তাদের খারাপ জিনিস আমরা ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত কিনতে বাধ্য হ'ব। তারা আপনাদের কাছে প্রচার করেচে, আমরা কম ট্যাক্স দিই। কিন্তু আসলে সে কথা সত্য নয়, ১৯২৭ সালে দেশের জ্‌তোর ব্যবসায়িগণের ওপর ধার্য ট্যাক্সের শতকরা

৬০ ভাগ আমরা দিয়েচি, যদিও আমাদের তৈরি মালের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগের চেয়ে বেশি হবে না।

আর একটা কথা উঠেচে, বাটাব কারখানা স্টেটের আর্থিক ক্ষতি করচে। এর উত্তরে আমি বলতে চাই, ১৯৩০ সালে আমাদের কারখানা ট্যাক্স বাবদ যা দেবে, তাতে স্টেটের আয় ১৯২৭ সালের জুতো ব্যবসায়ীদের নিকট আদায়ী ট্যাক্সের শতকরা ৫০ ভাগ বেশি।

আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির প্রয়োজন। ঝগড়াদ্বন্দ্ব শুধু ধ্বংসই আনয়ন করবে। অতএব আসুন আমরা সবাই মিলে জগতে এমন জুতোর ব্যবসায় গড়ে তুলি যে সারা পৃথিবী তা থেকে লাভবান হয়।

আমাদের দেশের লোকের ৫ কোটি জোড়া জুতো প্রতি সপ্তাহে রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করতে ৫০,০০০ হাজার লোকের দরকার। এদের সকলেরই জুতো তৈরির অভিজ্ঞতা থাকা চাই। জুতো মেরামতের জন্যে চাই ২০,০০০ কারিকর। আমাদের দেশের এক কোটি লোকের মাসে দু'বার করে পদচিকিৎসার প্রয়োজন হয় এর জন্যে চাই ৩৫,০০০ লোক।

জুতোর ব্যবসায়ের এই সব নতুন বিভাগে এক আমাদের দেশেই তা হ'লে ১লক্ষ লোক দরকার যা হ'লে সারা জগতের জন্যে কত লোক দরকার একবার ভেবে দেখুন। আপনারা হয় আমাদের সঙ্গে কিংবা স্বাধীনভাবে এই বৃহত্তর জনসেবার কাজে লেগে যান। যারা আপনাদের বোঝাতে চায় বাটার কারখানার দরুন আপনারা বেকার হয়ে পড়েচেন তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই কুৎসা প্রচার করে বেড়ায়। আপনাদের ও আপনাদের সন্তানদের কল্যাণ কামনা করুন। পুরানো নিয়মে জুতো তৈরির কাজ ছেড়ে দিন যা কিছু দুঃখ ওর মধ্যেই নিহিত আছে।

আমার স্মারকলিপি

(১৯২৬ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমেরিকা থেকে আমি মজুরদের জন্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাণী বহন করে এনেছিলাম কিন্তু সাফল্যের মূলে হ'ল অভিজ্ঞতা।

ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে বিবেচনা-সম্মত সম্বন্ধ আমি খুব পছন্দ করি। শ্রমিকেরও আত্মসম্মান বোধ আছে। তারা ধনীর চেয়ে নিজেদের ছোট বলে ভাবে না। শ্রমিকসংঘের কর্মীদের এ ধরণের মর্যাদাবোধ থাকা খুবই আবশ্যক। ঐ সংঘের আমিও একজন সভ্য।

ইংলণ্ড ও জার্মানী হয়ে ফিরবার পথে আমি কয়েকটি কারখানায় কাজ করেছিলাম। তাদের মধ্যে একটা কারখানায় আমি গোড়ালি চাঁচতাম। কাজ করবার সময় আমার পাশের শ্রমিক অন্য শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে এসে দেখিয়ে বললে আমেরিকা থেকে হতভাগাটা কি কাজ শিখে এসেচে দেখ!"

তারা ভাবলে আমি খুব তাড়াতাড়ি যা তা করে কাজ করচি—কাজে ফাঁকি দিচ্ছি। কিন্তু আমেরিকায় আমার চেয়েও দ্রুত কাজ করে যায়—সেখানে একজন কুশলী শ্রমিক ৯ ঘণ্টায় ১২০০ জোড়া গোড়ালি চাঁচে। আমি ৮০০ জোড়ার বেশি সেখানে পারতাম না। অথচ জার্মানীতে ১০ ঘণ্টায় চাঁচে মাত্র ১০০ জোড়া। সে সময় জার্মানি কারখানাগুলিতে সবাই কাজে ফাঁকি দিত--পরবর্তী কারিকরের কাজ তাতে কঠিন হয়ে পড়তো। তৈরি মালের সংখ্যা কম ছিল বলে মজুরির হারও ছিল কম।

আমি জিলন্ সহরে আমেরিকায় প্রচলিত কর্মপ্রণালী প্রবর্তিত করবার ইচ্ছায় শ্রমিকদের এক সভা আহ্বান করি। সাম্যবাদের প্রচারের জন্য শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠা করতে বলি তাদের। শ্রমসাম্য আমার একমাত্র লক্ষ্য। শ্রমিকেরা যদি মাল বেশি পরিমাণে তৈরি করে তবে যাতে তাদের আয়ও বাড়ে—শ্রমিক সংঘের ওপর এ ভার ন্যস্ত করা হ'ক। এতে তাদেরও কল্যাণ, কারখানারও কল্যাণ।

প্রেরভ থেকে একটি সোস্যালিস্ট পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ক্লাপ্কাকে এই সংঘে বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ করি। সভায় আমিও বক্তৃতা দিই।

এই সময় এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। আমি সভা থেকে চলে আসবার পরেই মোড়লেরা শ্রমিকদের বুঝিয়েছে যে এসব বাটার চালাকি। নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে শ্রমিকদের খোসামোদ করবার জন্যে—কারণ আমার নিজেরই যে সব দোষ, এ নাকি আমি ভালই জানি।

কারখানায় শ্রমিকেরা কাজের সময় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়তে লাগলো। বরখাস্ত করতে চাইলাম দু' একজনকে, কিন্তু সব মজুরেরা তাদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খলা সুরু করে দিলে। দু'বার দু'জনকে ক্ষমা করলাম- কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে ডিস্‌মিস্ করা ভিন্ন উপায় দেখলাম না। বেরার বলে একজন শ্রমিক তাদের কমিটির বিরুদ্ধে খবরের কাগজে কি লিখেছিল একদল শ্রমিক এসে আমার কাছে আবদার ধরলে, বেরারকে কারখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

আমি তাদের বুঝিয়ে বলি, খবরের কাগজে ঝগড়া কারো চাকরি যাওয়ার কারণ হতে পারে না - কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। আমার অফিসে তারা যখন আলোচনা করতে আসে তখন কল বন্ধ করে আসে বোধ হয় আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে, কিন্তু ওরা ফিরে যাওয়ার পরেও কল চলে না। অবশেষে তারা ধর্মঘট করবার ঠিক করলে। তাদের সংঘের প্রধান সম্পাদক প্রাহা থেকে এলেন, তদন্ত করে দেখে তিনি ধর্মঘটকারীদের তিরস্কার করে বললেন ধর্মঘটের উপযুক্ত কারণ নেই তাদের। বরং তারা ২০ পার্সেণ্ট বেশি মজুরির দাবি করুক। কমিটি এ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলে।

আমরা তাদের সঙ্গে কোন সন্ধিস্থাপন করতে রাজি হই নি। আমাদের কারখানার কাজ আনাড়ি কারিকর দিয়ে চালাতে গিয়ে অনেক ক্ষতি হ'ল আমাদের, মজুরি ও মাল তৈরির হার অনেক কমে গেল তবুও আমরা সে সব অবুঝ ও একগুঁয়ে ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের কাউকে কাজে পুনরায় বাহাল করি নি।

এ হ'ল ২০ বছর আগের কথা। আর আমাদের এখানে শ্রমিক সংঘও হয় নি ধর্মঘটেরও সেই শেষ। ১৯১৫ সালে অর্থাৎ প্রায় ৮ বছর পরে এই সব ধর্মঘটকারীদের মধ্যে অনেকে বেকার হয়ে পড়ে তখন আমরা তাদের পুনরায় চাকরি দিই। সোস্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি এজন্যে আমাদের যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়েছিল।

খোলা চিঠি

[চর্মশিল্প সংঘের সভাপতি ডেপুটি জোহানিস্ টমাস বাটাকে প্রাহার একটি সভায় অযথা আক্রমণ করেন। বর্তমান চিঠিখানিতে বাটার উক্ত অভিযোগের উত্তর দেন।]

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১লা তারিখের পত্র পেয়েছি। আপনার অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ করবার জন্যে

আমি আপনাকে জিলন্ কারখানায় এসে স্বচক্ষে সব দেখে যাবার অনুরোধ করি। আপনি এখানে আসতে কেন অস্বীকার করেছেন কিছু বুঝলাম না।

আপনি অভিযোগ করেছেন, আমার কারখানা দ্বারা আমি চল্লিশ হাজার চর্মশিল্পীর মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছি। আমি আপনাকে কয়েকটি ফটো পাঠালাম। তাতে দেখতে পাবেন পুরানো রীতিতে যারা জুতো তৈরি করে তাদের দোকান, কারখানা ও বাড়িঘরের হীন, শোচনীয় অবস্থা। সেই সঙ্গে আমার কারখানায় যারা উন্নত প্রণালীতে যন্ত্রে জুতো সেলাই করে তাদের যন্ত্রশালা ও আবাস গৃহের ফটোও পাঠানো হ'ল। আপনি বুঝতে পারবেন এই ব্যবসায়ীদের শ্রমকষ্ট ও অপরিচ্ছন্নতা আমি কিভাবে ও কত পরিমাণে দূর করতে সমর্থ হয়েছি।

ভারতবর্ষ ও জাভার কয়েকটি চর্মশিল্পীর ফটোও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আপনি তুলনা করে দেখলেই বুঝবেন নবতর প্রণালীতে কর্মে অগ্রসর না হ'লে ইউরোপের মুচীদের কোন উন্নতির আশাই নেই।

আজ পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশ জুতোর ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। অনেক বেশি লোক এই ব্যবসায়ে আজকাল অন্ন করে খায়।

আপনি অভিযোগ করেছেন আমার প্রণালীতে কাজ করলে ৪০ বছর পেরিয়ে গেলে মানুষের চাকরি যায়। একথা আংশিক সত্য। কিন্তু কোন দিক থেকে সত্য ৮ বছর আগে আমাদের কারখানায় ১৮০ জন বেশি বয়সের লোক ছিল। তারা ক্রমশ মজুরের কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকানের ম্যানেজার, ফোরম্যান, উপদেষ্টা, কন্ট্রোলার ইত্যাদি হয়ে যায়। অনেকে কিছু টাকা হাতে জমাতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বা কৃষিকার্য ইত্যাদি করে। আমরা তাদের ছাড়িয়ে দিই নি তারাই ছেড়ে দিয়েছে।

বরং আমরা ৪০ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের অভাব অনুভব করি। তরুণ শিক্ষানবিশ মজুরদের মনে সাহস আছে, বাহুতে শক্তি আছে—কিন্তু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবে তারা কাজ করতে পারে না। বয়স্ক শিক্ষকের অত্যন্ত দরকার আমাদের।

আমাদের কারখানায় বার্ধক্যের জন্যে এ পর্যন্ত কারো চাকরি যায় নি। ৬০ বছর বয়সের লোকও কারখানায় আছে। তবে সাধারণত আমি এটা আমার কর্তব্য মনে করি যে বৃদ্ধ বয়সে যাতে হাতের কাজ করে না খেতে হয়, প্রত্যেক মজুরের সেরূপ ব্যবস্থা করে দেওয়া আমার উচিত।

২৪ বছর বয়সে যদি কেউ কাজ আরম্ভ করে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে জীবন যাপন করে তবে ৪০ বছরের পর তার সঞ্চিত অর্থ থেকে বাকি জীবন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দে সে কাটাতে পারে। আমি এ বিষয় আরও বিশদভাবে আপনাকে পরে লিখে পাঠাচ্ছি।

আপনি লিখেছেন আমি জুতো তৈরি ছাড়া অন্য জিনিসও নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আপনার অবগতির জন্য বলি যে জুতো এবং জুতো সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ছাড়া আমি অন্য কোন দ্রব্য আমার কারখানায় তৈরি করি না—তবে আমার শ্রমিকগণের জীবিকানির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা অনেক সময় করি।

শ্রমিকদের সস্তায় মাল দেওয়ার জন্যে এ কাজ আমরা করি। হয়তো আপনি আমাদের সাইকেলের ব্যবসায়ের কথা বলবেন। আমি সাইকেল বিক্রী করি শুধু আমাদের কারখানার লোকদের মধ্যে—অন্তত আমি চেষ্টা করি। আমরা দেখলাম কারখানার কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে শ্রমিকদের

সাইকেল না হ'লে চলে না, অথচ হল্যান্ড বা অন্যান্য দেশে সাইকেলের দামের চেয়ে এখানে অনেক বেশি দাম দিতে হয়। অসাধু সাইকেল ব্যবসায়ীরা সস্তায় মাল দিতে চায় না। এরকম আরও কয়েকটি জিনিস আছে, যা সস্তায় দেবার জন্যে আমরা রাখি গুদামে।

আপনি আমাকে লক্ষপতি বলে অভিহিত করেছেন। একথা হয়তো সত্য। আপনি যেমন নিজের ও পরের উপকারের জন্য কলম ব্যবহার করেন বক্তৃতা করেন আমার টাকা আমি তেমনি নিজের পরিবারবর্গের ও দেশের উপকারে ব্যয় করি। মানুষ এ জগতে অবস্থার দাস প্রত্যেকের নিজেদের আমোদপ্রমোদে নিজস্ব উপায় থাকে তবে যে যেভাবে সেগুলি গ্রহণ করতে পারে তদনুসারে সেগুলি আনন্দ বা শান্তিতে পরিণত হয়।

আপনি অভিযোগ করেছেন যে যদিও আমি নিজে শিল্পসংঘের সভ্য, আমি আমার শ্রমিকদের কোন ইউনিয়নে যোগ দিতে দিই না। আমি শিল্পসংঘের সভ্য বটে কিন্তু সেটা শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির জন্যে কারখানার মালিকেরা যাতে পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতায় মজুরির হার বাড়ান সেদিকেই আমার লক্ষ্য। মজুরির হার কমাবার চেষ্টায় যোগদান করতে আপনি কি কখনো আমায় দেখেছেন?

আপনি এ ব্যবসায়ে অনেক দিন আছেন, আপনি আমাদের কারখানার গোড়ার কথা সবই জানেন। ১৯০৫-১৯০৬ সালে আমি চর্মশিল্পীসংঘের সভ্য সভাদের আমাদের কারখানায় আমন্ত্রণ করে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করি। তার ফল কি হয়েছিল আপনি তা ভালই জানেন। পাঁচবছর আগে খবরের কাগজে আমি সে সব ঘটনা প্রকাশ করেছিলাম।

আপনি তখনও ন্যায়পক্ষ সমর্থন করেন নি। আপনি জিলান সহরে এসে শ্রমিকদের শান্ত করার পরিবর্তে আরও উত্তেজিত করে, মজুরির হার ২০ পার্সেন্ট্ বাড়াবার জন্যে আন্দোলন সুরু করতে বলে দিলেন তাদের।

আপনার ও আমার মতবাদে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। আপনি যে চোখে আপনার শ্রমিকসংঘ দেখেন আমি সে চোখে দেখি না। জীবনকেও আমি দেখি অন্য চোখে। আপনি এখনও ভাবেন ধনী ও শ্রমিকের বিবাদ বাধানোই শ্রমিক সংঘের একমাত্র কর্তব্য।

আমার মত এই যে বরং একা নিজের হাতে কাজ করবো তবুও যে আমাকে অবিশ্বাস করে, পদে পদে আমায় অসাধু ভাবে তার সাহায্য বা সহযোগিতা গ্রহণ করবো না। এই ভিত্তির ওপর আমাদের উভয়ের সহযোগিতা কি ভাবে সম্ভব?

আপনি যদি আমাদের জিলানের কারখানায় এসে স্বচক্ষে এখানকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমায় সাহায্য করবার চেষ্টা করেন তবেই আপনি কৃতকার্য হবেন। কিন্তু প্রাহাতে আপনি গতবার যে বক্তৃতা করেছেন এবং আপনি আমাকে শেষবার যে চিঠি লিখেছেন উভয়ই আমাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি অসম্ভব করে তুলেছে। আমি এই পত্র খবরের কাগজে প্রকাশ করতে চাই, কারণ আমাদের পত্রের বিষয়বস্তু জনসাধারণের আগ্রহের বিষয়, অনেকের স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত। আপনি উপযুক্ত কারণ না দর্শালে ২৩শে তারিখের কারখানার সংবাদপত্রে এ চিঠি মুদ্রিত হবে।

টমাস বাটা

জিলন্, ১২ই অক্টোবর ১৯৩১।

জনহিতৈষী

[টমাস বাটার অনেক ছবি আছে কিন্তু কোন ছবিই তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে আঁকতে পারে নি। যেমন বেগবতী পার্বত্য তটিনী উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রাণচঞ্চল গতিতে ছুটে চলে কিংবা প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি দ্বারা জ্যোতিস্মান হয়ে ওঠে, তাঁর মস্তক ও মুখাবয়ব, চোখের, নাকের ও ঠোঁটের প্রতি, আকুঞ্চিত রেখা তেমনি জ্যোতিস্মান ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতো উৎসাহ ও শক্তির আবেগে।

তাঁর মধ্যে ছিল অদম্য প্রাণশক্তি ও আবেগ- তাঁর সমস্ত কর্মপ্রণালী নির্ধারিত হ'ত এই দুঃসাহস ও হৃদয়াবেগ দ্বারা। তরুণ বয়সে মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর ভুরু ও কপালের মধ্যে কেটে গিয়ে জীবনব্যাপী একটা দাগের সৃষ্টি করেছিল, সে দাগটাও যেন তাঁর শক্তির পরিচয় দিত।

বাটা তাঁর এই শক্তির সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তিনি এই শক্তিকে কর্মে প্রয়োগ করতে জানতেন। তাকে সংযত করতে জানতেন। তিনি বলেছিলেন, যখন আমি প্রথম মোটরগাড়ি কিনি, তখন তার অযথা ব্যবহার পাছে না করি সেজন্যে এক পক্ষকাল গ্যারাজে চাবি বন্ধ করে রেখে দিই।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে।

একবার একটা কোন ব্যাপারে তিনি মনে করলেন তাঁর নিজের ও তাঁর কারখানার মর্যাদা ক্ষুন্ন হবার কারণ ঘটেছে। তিনি এমন একটি কর্মপন্থা স্থির করলেন যা অত্যন্ত দুঃসাহসের ব্যাপার বলে মনে হবার কথা। কেউ সে মত বদলাতে পারলে না। সেটা ছিল শনিবার, তাঁর মতানুযায়ী কাজ রবিবার সকাল থেকে আরম্ভ হওয়ার কথা। সেদিন সকালে তিনি আমায় ডেকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন কেন তিনি সে পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি যেভাবে কথা বলছিলেন থেমে থেমে ধীরে ধীরে- তাতে মনে হবার কথা যে তিনি স্বগতোক্তি করছেন বুঝি।

'শত্রুতো' কারো ভয় করি নে আমি, এক শুধু নিজেকে ছাড়া।"

তিনি ঘরের মধ্যে আমার উপস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়েছেন। কয়েক মিনিট চলে গেল তারপর তিনি আমায় বললেন-"ও চিঠিখানা এভাবে বদলে দাও। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভেবে আগের মত সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন।

তাঁর হৃদয়বেগ- কি দুঃখের কি আনন্দের, কি ভালবাসার কি ক্রোধের -সবই ছিল অতীব গভীর। মান ও অপমান তাঁর মনের উভয় মেরুর মত কাজ করতো--বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে চালিত বিদ্যুৎপ্রবাহের মত তাঁর মনের শক্তি সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠতো এতদ্বারা। তাঁর জীবনের সাফল্যে এসেছিল ইচ্ছাশক্তিতে সৃষ্টিমুখী করবার এই শক্তি থেকে। একজন সুদক্ষ মিস্ত্রি যেমন বয়লারের বাষ্পশক্তিতে অপচয় না করে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে, তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি সংযত করে কাজে লাগাতে পারতেন, ঠিক হিসেব করে। তাঁর ওপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি কড়া প্রকৃতির ম্যানেজার ছিলেন--যাঁরা কাজে ফাঁকি দিতে চায় বা কোন রকমে রুটিনমত কাজ সেরে যেতে চায়—তিনি ছিলেন তাদের দু'চক্ষের বিষ। কেননা, কাজে ফাঁকি বা কাজের সোজা পথ খোঁজা দুটোকে তিনি একই শ্রেণীর বলে মনে করতেন। তবুও সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো—কেননা, তাঁর মনে ছিল সকলের জন্যে দয়া, মানবহিতৈষিতা—তাঁর মস্তিষ্ক সব সময়

মানুষের প্রগতির পথ খুঁজে বেড়াতো। তিনি অক্লান্তকর্মী, সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক ছিলেন- তাঁর কথার সঙ্গে কাজের একটি আশ্চর্য ঐক্য ছিল। তিনি কখনো প্রগতিবাদী কখনো রক্ষণশীল ছিলেন—লোকে মনে ভাবতো তাঁর রাজনৈতিক মতের স্থিরতা নেই- কিন্তু তাঁর জীবনের মূলনীতি যে নীতির দ্বারা তাঁর সকল কার্য নিয়ন্ত্রিত হ'ত -তা ছিল সেবাধর্ম। কেউ তাঁকে এ নীতি শেখায় নি—নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝেছিলেন অনন্ত জীবনের মূলনীতি -যে সেবা করে, সেই টি'কে থাকে ও উন্নতি করে।

টমাস বাটার মৃত্যু হয়েচে—এ শুধু তাঁর দেহের মৃত্যু কিন্তু তাঁর আদর্শ তিনি যে হাজার হাজার তরুণকে গড়ে তৈরি করে গিয়েচেন -বিশেষ করে তাঁর বিশাল কর্মপ্রতিষ্ঠান আজও বেঁচে। টমাস বাটার ব্যক্তিত্বের যে অংশ অমর অবিনশ্বর তার মধ্যে ওরা চিরকাল বেঁচে থাকবে।।

আমার কর্মমত

সাধারণত কর্মই আমার বন্ধু ও সঙ্গী। কর্মের ভিতর দিয়েই আমি আমার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করচি। কিন্তু অপরে কাজ করচে মনিবের আদেশে।

আমার কাজের সময় বেড়ে যদি দিনে ষোল ঘণ্টাও হয় তাতেও আমার কষ্ট নেই কারণ কর্মেই আমার আনন্দ। কিন্তু কর্মের প্রতি এত আসক্তি থাকার কথা নয় তাও বুঝি। ১৮ বছর বয়সের ছেলে চিঠি নকল করতে করতে স্বভাবত একটু বাইরে রোদ্রালোকে বেড়াতে চাইবে। সুতরাং আমি আইন দ্বারা কাজের সময় কমিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। এর প্রমান যখন আইনে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত দৈনিক ১১ ঘণ্টা খাটানোর নিয়ম ছিল তখন আমি খাটুনির সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম ১০ ঘণ্টা।

মহাযুদ্ধের পরেই খাটুনির সময় কমিয়ে যখন ৮ ঘণ্টা করা হ'ল তখন তাতে আমার মত ছিল না - কারণ আমি মনে করেছিলাম যুদ্ধের পরেই বেশি খাটুনির সময় ব্যবসায়ের মন্দা পড়েছিল সে সময়, সে অবস্থার প্রতিকার করতে হ'লে খাটুনির দরকার। তবে আমি সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি নি—উন্নত ধরণের যন্ত্র দ্বারা শ্রমিকের খাটুনির সময় আরও কমিয়ে দেওয়া যায়- সপ্তাহে ছ' দিনের স্থলে পাঁচদিনের কাজ শীঘ্রই আমরা করতে সমর্থ হ'ব আশা করি।

কিন্তু আমার পরিশ্রম তাতে কমবে না ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত আমার কর্ম চলবে কর্মের চেয়ে আমি আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পাই না।

কর্ম আমাকে সবল ও সুস্থ রেখেচে। চল্লিশ বছর বয়সে আমি আরও দশ বছরের কর্মতালিকার খসড়া করি, ৪৫ বছর বয়সে আরও কুড়ি বছরের কর্মের খসড়া করি ৫০ বছরে আমি প্রতিজ্ঞা করি, কর্ম আমার জীবনের চিরসাথী থাকবে মৃত্যুদিন পর্যন্ত ওকে ছাড়বো না। একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে সেই গানটি গাইতে গাইতে মরবঃ

বিছানায় শুয়ে মরবো না
মরবো ঘোড়ার ওপর।
ঘোড়া থেকে যদি পড়ে যাই
তলোয়ার যেন হাতের মুঠোয় থাকে।

আমার কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য—মানুষের সেবা। জীবনের সেবা। জীবনকে আমি ভালবাসি,

মানুষকে ভালবাসি। আমি যা বেঁচেচি, তার দশগুণ বেশি বাঁচতে চাই এখনও। আমি দশটি ছেলে চাই। সম্পত্তির ভাগ তাদের দেওয়ার জন্যে নয় তাদের কাজ শেখানোর জন্যে।

অবশ্য আমার নিজের ছেলে যদিও একটি, এমন ছেলে আমার অনেক। তাদের মধ্যে যে যোগ্যতম, সেই আমার আসন পাবে। আমার নিজের ছেলের যে আশা, অন্য পাঁচজন গরীবের ছেলের চেয়েও কম। তাকে বিশেষ কোন বড় স্কুলে পড়ানো হবে না। সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে সে তার বাপের মত স্বাধীন কারিকর হবে--এবং নিজে যা আয় করতে পারবে--তাই হবে তার সম্পত্তি।

বাটা ও এডিসন

[টমাস আলভা এডিসনকে বাটা সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানবের সমগ্র সৃষ্টিপ্রতিভা এই একজনের মধ্যে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেচে। নিম্নোক্ত দু'টি লিপি তিনি লেখেন—একখানি এডিসনের বৈদ্যুতিক আলোকের আবিষ্কার উপলক্ষে, অপরটি তাঁর মৃত্যুতে শোক নিবেদন উপলক্ষে। এই লিপি দু'টির মধ্যে এডিসনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হওয়া ছাড়াও এডিসনের আদর্শের অনুযায়ী জনগণের সেবক হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট]

টমাস আলভা এডিসন,

আপনার বিভিন্ন আবিষ্কারের ফল আমরা প্রতিদিনই ভোগ করচি। মানুষের সেবার জন্য আপনার অক্লান্ত শ্রম অন্য সকলের শ্রমকে কমিয়ে দিয়ে তাদের জীবন আনন্দপূর্ণ করে তুলেচে।

আমরা আপনার নিকট ঋণী। কৃতজ্ঞতা নিবেদন ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান আমরা দিতে অক্ষম। আমরা চেষ্টা করবো আমাদের ও অপরের উপকারে, আপনার অমূল্য আবিষ্কারকে নিয়োজিত করতে।

এই বয়সেও আপনার মানসিক বৃত্তির তীক্ষ্ণতা ও কর্মশক্তির দৃঢ়তা অলস ব্যক্তিদের কাছে প্রমান করচে যে কঠিন পরিশ্রম কখনো আয়ু কমিয়ে দেয় না।

আপনার সফল জীবনের প্রত্যেক দিবসটি মানুষের মনকে আশাবাদী করে তোলে।

১২,০০০ হাজার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

জিল্‌ন্, ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৭। **টমাস বাটা**

এডিসনের পরলোকগমনে জিল্‌ন্ সহরে শোকসভা

১৯৩১ সালের ২১শে অক্টোবর, বুধবার, কার্যারম্ভের প্রাক্কালে বাটার কারখানার ২৫,০০০ শ্রমিক কারখানার প্রাঙ্গনে টমাস আলভা এডিসনের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য সমাগত হয়েছিল।

নীরব জনতা ও নিঃস্তব্ধ যন্ত্রশালার মধ্যে দাঁড়িয়ে টমাস বাটা পরলোকগত মানবহিতৈষী কর্মবীরের উদ্দেশে নিম্নলিখিত ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন:

সহকর্মিগণ,

আজ আমেরিকায় টমাস আলভা এডিসনের সৎকার দিবস। আমাদের সকলের জীবনে তিনি

স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করেছিলেন, জীবন-যাপন-প্রণালী সহজ করে তুলেছিলেন—এজন্য আমরা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভারের নিকট এই টেলিগ্রামখানি পাঠাতে চাই:—

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

টমাস আলভা এডিসনের জন্মকে সম্ভব করায় মত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আজ বাটার পঁচিশ হাজার সহকর্মী মার্কিন জাতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচে।

তাঁর মত বিরাট কর্মবীর ও মানবের পরম বন্ধুকে দীর্ঘ জীবন ও কর্মশক্তি দান করবার জন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।

কর্ম ও নেতার কর্তব্য সম্বন্ধে বাটার মত ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তিনি তাঁর কারখানার শ্রমিক ও তাঁর মালের খরিদ্দারদের সম্বন্ধে বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলতেন, "পরিচালকের কর্তব্য লোকের কাজ দেখিয়ে দেওয়া, ঠিক কাজের জন্যে ঠিক লোকের নির্বাচন, তাদের উপযুক্ত যন্ত্র ও যন্ত্রশালা যোগাড় করে দেওয়া, যাতে তারা কম খরচে মাল তৈরি করে সস্তায় বেচতে পারে। যে নেতা এ করতে অক্ষম, তিনি নেতৃত্বের অযোগ্য। শ্রমিকদের কর্মে সাহায্যের পরিবর্তে তিনি বাধাই সৃষ্টি করবেন।" নিম্নলিখিত দু'টি পত্রে নিতৃত্ব সম্বন্ধে বাটার ধারণা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

নেতার কর্তব্য

মিঃ ক এর প্রতি

কিছুদিন আগে গোডালির কারখানায় গিয়ে দেখলাম লোকে কারখানা থেকে ভারি চামড়ার বাণ্ডিল পিঠে বয়ে একতালায় আনচে, সেখান থেকে লরিতে উঠে মাল বোঝাই করচে। মিঃ খ এর কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। আমি ট্যানারিতে ঢুকলাম। আমার উদ্দেশ্য আমি মিঃ খ কে এক সপ্তাহ ধরে নিজের পিঠে চামড়া বয়ে ঐভাবে গাড়ি বোঝাই করতে বলবো এবং ওরা যে মজুরি পায় সেই মজুরি তাঁকে দেব। তাহ'লে তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর নিজের পরিচালনার অযোগ্যতা বশত শ্রমিকেরা কিরকম অনর্থক খাটুনি খাটচে।

মিঃ খ সে সময় সেখানে ছিলেন না, সুতরাং সে যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। কিন্তু আমি একটা ভুল করেচি। আপনি মিঃ খ-এর ওপরওয়ালা কর্মচারী, সুতরাং তাঁর অকর্মণ্যতার বা অবহেলার মূলে আপনার অবহেলা বিদ্যমান। এ কথা তখন আমার স্মরণ হয় নি নতুবা আপনাকেও আমি মিঃ খ-এর সঙ্গে লরিতে চামড়া বোঝাই করতে আদেশ দিতাম।

আমার অনুরোধক্রমে মিঃ গ এক মতলব খাড়া করেচেন যার দ্বারা ট্যানারিতে চামড়া বোঝাইয়ের কাজ সহজ হতে পারে। কিন্তু এই কাজের জন্যে আমরা আপনাকে বেতন দিই।

তাঁর প্রস্তাব ভাল, কিন্তু আপনি আমাদের মাইনে খেয়ে অলসভাবে আপিসের চেয়ারে বসে থাকবেন এবং আমি ও মিঃ গ আপনার কাজ করে দেব, এ ব্যবস্থা কি সংগত?

এই সমস্যার সমাধান আপনাকে করতে হবে। মিঃ গ এ বিষয়ে আমার মত আপনার নিকট ব্যক্ত করবেন। আরও যা যা করলে কাজের সুবিধা হয়, সব করে আপনি আমায় জানাবেন। এ ধরণের বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি আর যেন না ঘটে। —১৩ই মে, ১৯৩১।

বিচার পদ্ধতি

[নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি একটি গ্রামের অধিবাসীবর্গের উদ্দেশে লেখা। এর মধ্যে কয়েকটি কৌতূহলজনক কথা আছে। মানুষের চরিত্রের দুর্বল দিক বাটা কি চোখে দেখতেন, তাঁর ন্যায় অন্যায় বোধশক্তি কত সূক্ষ্ম ছিল এ থেকে তা বোঝা যাবে। শুধু মানুষকে দোষ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না - তাদের সব সময়ে বোঝাবার চেষ্টা পেতেন, তাদের নিজেদের স্বার্থের নিমিত্ত তাদের সাধু ও সৎ হওয়া কত আবশ্যক]

নাগরিকগণ,

গতকল্য তোমাদের গ্রামে পুনরায় অগ্নিকাণ্ড হয়, আমি সে সময় সেখানে সর্বাগ্রে উপস্থিত হই।

আমি ফায়ার ব্রিগেডের লোক নই, তবুও অগ্নিনির্বাপন আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি—অনেকবার অনেক স্থানে এ কাজে সাহায্য করেচি। কিন্তু গত কল্যকার অগ্নিকাণ্ড একটি ধ্বংসকর ব্যাপার না হয়ে যেন থিয়েটার বলে মনে হ'তে লাগল। বাড়ি পুড়চে, লোকে সিগারেট মুখে দিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দিব্যি মজা করে দেখচে, কারো মুখে ভয়ের বা হতাশার চিহ্নও নেই দেখলাম। এমন কি ছেলেরাও ভয় খায় নি বরং আগুন যখন খুব জ্বলে উঠেচে তখন তারা বলাবলি করতে লাগল তোমাদের নতুন ঘরবাড়ির জন্যে জায়গা ঠিক হয়েচে ইত্যাদি। এ কথা তোমাদের গ্রামের গত অগ্নিকাণ্ডের সময়েও শোনা গিয়েছিল। আমি চলে আসবার পরে তোমরা তোমাদের আসবাবপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলে শুনতে পাই।

গত তিন বৎসরে তোমাদের গ্রামে নয়টি অগ্নিকাণ্ড হয়ে ১১৫টি বাড়ির মধ্যে ২১টি ধ্বংস হয়ে যায়।

ফায়ার ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানীর বায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে তোমাদের বাড়ির ফায়ার ইন্‌সিওরেন্সের জন্যে ১২ পার্সেণ্ট্ প্রিমিয়াম দেওয়া উচিত। তোমাদের বাড়ির প্রত্যেকখানি ৬০—১০০,০০০ ক্রাউনের জন্যে ইন্‌সিওর করা, বর্তমান প্রিমিয়াম ২—৩০০ ক্রাউন অপেক্ষাও তোমাদের ৬—১০,০০০ ক্রাউন বেশি দেওয়া উচিত।

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টারদের উচিত তোমাদের কাছে বেশি প্রিমিয়াম আদায় করে নিয়ে তোমাদের চুক্তিপত্র বাতিল করা।

জিল্‌ন্ জেলায় অনেক গ্রাম আছে, যেখানে গত শতাব্দীতে একবার অগ্নিকাণ্ডও হয় নি। সে সব গ্রামের লোকে সত্যই আগুন নেবাতে চায়, অথচ তারা মাত্র ২০০ ক্রাউন প্রিমিয়াম দেয়। আমার মনে হয় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী যদি তোমাদের গ্রামের ইন্‌সিওরেন্স ২০০ ক্রাউন থেকে ৫০০০ ক্রাউন করে, তবে সুবিচার করা হয়। নীতিগর্ভ বক্তৃতার চেয়ে এ কার্য অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীরা দুর্বল চরিত্রের মানুষদের অপরাধী করে তোলে টাকার লোভ দেখিয়ে। তাদের উচিত অসাধু লোকের পকেট থেকে টাকা নিয়ে সাধু লোককে দেওয়া।

নাগরিক বন্ধুগণ, এ সব কার্যের দ্বারা তোমরা নিজেদের পরিবার ও গ্রামের নৈতিক সর্বনাশ সাধন করচ—দুর্নীতি ক্রমে সংক্রামিত হয় তোমাদের প্রতিবেশিদের মধ্যে।

আমেরিকানিজ্‌ম্

অনেকে বাটাকে দোষ দিত, তিনি কারখানার সব কিছু আমেরিকার নকল করেছেন। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, আমেরিকানিজ্‌ম্ শুধু ফাঁকা কথা মাত্র। আমি ইজ্‌ম্ টিজ্‌ম্ বুঝি না। প্রথমে দরকার সাহস, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অর্থনৈতিক নেতাদের আশাবাদ। কার দুঃখ কে ঘোচাতে পারে? নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের ওপর নির্ভর কর।

যন্ত্র ও মানুষ

আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সবল, সুস্থ ও ধনী হওয়া। লোকে ভাবে, ধনী হওয়ার দরকার আগে—অন্য দু'টি জিনিস পরে হবে। এক হিসেবে এ কথা সত্য, কারণ ধনী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বর্ধিত হয়, অর্থ ভিন্ন এ দু'টি জিনিস হওয়া কঠিন।

আমি একবার লিখেছিলাম আমাদের চেকোশ্লোভাক রিপাবলিকে এককোটি তিনলক্ষ কোটিপতির স্থান আছে। আমি এখন বলচি এ দেশে দু'কোটি কোটিপতির স্থান আছে। ইংলণ্ডে ৫ কোটি ব্যক্তি কোটিপতি হতে পারে।

ধনী প্রত্যেকেই হতে চায়- আমাদের পক্ষে এ ইচ্ছা যথেষ্ট কল্যাণকর। ঐশ্বর্যবৃদ্ধির মূলে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার বিদ্যমান। ওয়াট তাঁর আবিষ্কারের দ্বারা বিনা পরিশ্রমে কাজ করার পথ সুগম করেছেন—খনিগর্ভ থেকে পাথুরে কয়লা ওপরে উঠে আমাদের ধনসম্পদ সৃষ্টি করচে।

তারপর মানবের কল্যাণকর নতুন জিনিসের আবিষ্কার হয়েচে পৃথিবীতে টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, রেলওয়ে, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন এবং সহস্র রকমের কলকারখানা। এদের দ্বারা আমাদের জীবনযাত্রার পথ যথেষ্ট সহজ ও সুগম হয়েচে। তবু অনেকে খুঁৎ খুঁৎ করে। তাদের মত—কলকারখানা আমাদের সর্বনাশ সাধন করচে। তারা নাকি সত্যযুগে ফিরে আসবার অপেক্ষায় আছে।

অনেকে মনে করেন যন্ত্রের আবিষ্কার মানুষের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্চে অল্প মূলধনের শিল্পী বা মিস্ত্রিদের সর্বনাশ করেচে। অনেকে বিশ্বাস করেন, জগতের যত কিছু খারাপ, তার মূলেই এই আধুনিক যুগের কলকারখানা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবস্থিত।

এর কারণ এই যে যন্ত্রদৈত্য সকলের উপকার সমানভাবে করে না। এই বৈষম্য হিংসা ও দ্বেষ আনয়ন করে, যন্ত্রকে ভাল চোখে দেখা অসম্ভব করে তোলে। যে মুচী হাতে জুতো গড়ে, সে যন্ত্রের শত্রু হবেই—কারণ যন্ত্রের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা সম্ভব নয়। সে সত্যযুগের জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারে না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই সত্যযুগের অর্থ কি?

যখন জুতো কলে তৈরি হ'ত না তখন, না যখন কেউ জুতোই পরতো না তখন?

মানুষের স্বার্থে যেখানে আঘাত পড়চে, যেখানে মানুষ যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পেরে উঠচে না—সেখানে তাদের আঘাত লাগবে এটা বুঝতে পারি—কিন্তু বিনা কারণে যন্ত্রের বিরোধিতা অসংগত ছাড়া আর কি? যন্ত্রযুগের পূর্বে যেতে হ'লে আমাদের বহুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়। যখন স্টীম ইঞ্জিন ছিল না, বাষ্পচালিত তাঁত ছিল না; কাঠের তাঁতও ছিল না—কারণ কাঠের তাঁত কল ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ ভাল্লুকের চামড়া গায়ে দিত এবং গুহায় বাস করত। কিন্তু দুঃখের

বিষয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁরা এটা ভালই জানেন, গুহা ও ভাল্লুকের চামড়ার পরিমাণ জগতে কম—এতগুলি লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

অতএব যন্ত্রযুগের মধ্যেই আবার ফিরে আসা যাক এবং যে যন্ত্র আমাদের সব চেয়ে নিকট, জিলন্ জুতো কারখানা সেখানেই থাকা যায়।

আমরা যেন মনে রাখি, আমাদের পিতৃপিতামহগণ ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে কাজ আরম্ভ করতেন এবং রাতদুপুর পর্যন্ত খেটে একজোড়া কৃষকের উপযুক্ত পাদুকা তৈরি করতেন। পিঠের শিরদাঁড়া টনটন করতো সারাদিনের খাটুনির পরে দু'বার আলুসিদ্ধ ভোজন করে দিনের খাওয়া শেষ করতেন।

বাল্যকাল থেকে তাঁদের কারখানায় কাটাতে হ'ত—সেই কারখানাতেই রান্নাঘর, শয়নগৃহ ও বৈঠকখানা। যেদিন জুতো সেলাইয়ের কলের আবিষ্কার হ'ল সেদিন নিশ্চয়ই তাঁরা সে যন্ত্রকে মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন গ্রহণ করেছিলেন রেলগাড়িকে। কেননা রেলগাড়ির যুগের পূর্বে তাঁদের নিজেদের পিঠে চামড়ার বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে হ'ত।

সে যুগে কেউ ফিরে যেতে চান? আমার মনে হয় কেউই সে যুগে ফিরতে চায় না—তবে যন্ত্রের বিরুদ্ধে অযথা বিদ্বেষভাব পোষণের অর্থ কি?

যাঁরা শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা বলবেন আজকাল তাঁরা প্রাচীন দিনের চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখালে পারেন—এর জন্যে তো কই যন্ত্রের সাহায্যের দরকার হয় না? তাদের কথা আংশিক সত্য—যন্ত্রের সাহায্য তাদেরও দরকার হয়—তবে অন্যভাবে। শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি এজন্যে আংশিকভাবে দায়ী বটে কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের যত বেশি সুবিধে করে দিয়েচে, শিক্ষার উন্নতির এত সাহায্য আর কিসে করেচে আমি জানি না। স্কুল পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

যদি শিক্ষককে আজও পার্চমেন্ট, কি বল্কল, কি বলদের চামড়ায় লিখতে হ'ত তবে তার বর্তমান শিক্ষাদান প্রণালীর উন্নতি কি সম্ভব হ'ত? ছেলেরা বাল্যকাল থেকে অপরকে বই পড়তে দেখে নিজেরা পড়তে শেখে—আজকাল তারা খাওয়ার চেয়ে লোকের বইপড়াটাই বেশি দেখতে পায়। পড়ার বাতিক আজকাল কোন্ ঘরে নেই?

অতএব দেখা যাচ্চে যে আমরা গুহার যুগে ফিরে যেতে চাই না, আমাদের পিতারা যে যুগে বাস করতেন, সে যুগেও ফিরতে চাই না।

তবে কি আমরা চাই যে যন্ত্র প্রত্যেককে সমানভাবে ঐশ্বর্য বিতরণ করুক? কিন্তু এ ব্যাপার সম্ভব হয় না এই জন্যে, যে—যন্ত্রকে চালিত করে তা থেকে ধন উৎপাদন অতীব কঠিন। আনাড়ি লোক যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অধিকার প্রাপ্ত হ'লে গুহাযুগের সভ্যতা পুনরায় ফিরে আসত।

অতএব যন্ত্রের সুযুক্তিসংগত ব্যবহার আমরা যেন শিখি। সমাজের কল্যাণে যেন তার প্রয়োগ করি। সকলকে সমানভাবে ধনী না করলেও যন্ত্র সমাজকে সমষ্টিগত ভাবে ধনী করে তোলে—ধনের উৎপাদন দ্বারা।

যন্ত্র ব্যবহারের দুরূহতা

বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র তৈরি হয়েচে ছোট ছোট যন্ত্র দ্বারা। পাথরের কুঠার দ্বারা সেই ছোট যন্ত্র তৈরি করা চলত—কিন্তু বৃহৎ যন্ত্রের তৈরি সম্ভব ছিল না।

প্রথমে লোহার যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল—যেমন, কুঠার ও করাত। তা দ্বারা কাঠের তাঁত ও চরকা গড়া সম্ভব।

মানুষের দশলক্ষ বৎসর লেগেচে পাথরের কুঠার গড়তে, তারপর আরও হাজার হাজার বছর লেগেচে ব্রোঞ্জ, লোহা ও পরিশেষে ইস্পাতের কুঠার তৈরি করতে।

লোহার কুঠার ও বর্শা দিয়ে মানুষে আগে গুহায় ও বনে বন্য জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করতো—তারপর তাই দিয়ে তৈরি হ'ত বাড়িঘর। ইস্পাতের কুঠারের সাহায্যে তৈরি হ'ল কাঠের তৈরি যন্ত্র তারপর এল ধাতব যন্ত্র, তারপর প্রথম বাষ্প যন্ত্র। প্রথম ব্রোঞ্জ বা লোহার কুঠারের মালিক নিজেকে অত্যন্ত ধনী বলে মনে করতো, যেমন আজকাল ভূস্বামী বা কারখানার মালিকেরা নিজেদের মনে করে। যন্ত্র দ্বারা লোকে ভাল্লুক শিকার করত কিংবা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি নির্মাণ করত।

কিন্তু কল জিনিসটা বৃহৎ যন্ত্র। অনেক লোকের দরকার হয় কল চালাতে। এ ভাবে মানুষ কখনো জীবনযাত্রার উপযোগী দরকারী জিনিসপত্র তৈরী করে নি। ঝগড়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এ ভাবে সুরু হ'ল। কিন্তু প্রাচীন দিনে মানুষের একতা দৃষ্ট হ'ত শুধু যুদ্ধবিগ্রহের কার্যে বা ক্রীতদাসের পরিশ্রমে। যন্ত্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মঙ্গলার্থে পরিশ্রম করতে শিখিয়েচে।

স্টীম ইঞ্জিন বা কারখানা চালানো একজন লোকের কর্ম নয়। অনেকগুলি সুযোগ্য ও কর্ম-কুশল ব্যক্তির আবশ্যক বিভিন্ন বিভাগের তদারক করবার জন্যে।

যন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করবে যন্ত্রচালকের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ওপর। সেই বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ নির্ভর করবে সেই সেই শ্রমিক কিভাবে কোন পরিবেশের মধ্যে বাস করে তার ওপর।

প্রাচীন দিনে ক্রীতদাস প্রথার সময়ে কলকারখানা সম্ভব হ'ত না। ক্রীতদাসেরা শ্রম করতে পারত বটে কিন্তু তাদের বুদ্ধিবৃত্তি তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না। সাম্যবাদ প্রচারের পূর্বে শ্রমিকগণের দলবদ্ধ হয়ে পরস্পরের উন্নতির জন্য পরস্পরের পরিশ্রম সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

ধর্মের উন্নতি দ্বারা ও সামাজিক উন্নতির দ্বারা বর্তমান যন্ত্রযুগের আবির্ভাব সম্ভব হয়েচে। কারণ এই প্রগতির মূলে রয়েচে স্ত্রীস্বাধীনতা, ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষ আনয়ন।

উন্নততর সমাজ ও যুগ ভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হ'ত না। ওয়াট প্রাচীন গ্রীসে স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করতে পারতেন কি? কখনই নয়। সে যুগে লক্ষ লক্ষ লোক ছিল প্রাচীন গ্রীসে কোন দরকারী জিনিস তারা বার করে নি।

বড় বড় আবিষ্কারকের আবির্ভাবকে সম্ভব করবার মূলে যেমন রয়েচে সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি, তেমনি মানুষের আবিষ্কৃত ঐ সব মহদুপকারী যন্ত্রকে ঠিকমত ব্যবহারের জন্য কুশলী ও কর্মদক্ষ মানুষের সৃষ্টি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভব।

মানুষকে শারীরিক শ্রম থেকে মুক্তি দিতে হবে তবেই তার মানসিক বৃত্তির তীক্ষ্ণতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে। মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে যান্ত্রিক উৎকর্ষ অস্থায়ীভাবে জড়িত।

কলকারখানার যাঁরা পরিচালক, তাঁরা যেন সাধারণ শ্রমিকের বিশ্বাসভাজন হন। সংঘবদ্ধ কর্ম পরস্পরের ওপর বিশ্বাস না থাকলে সম্ভবপর হয় না। শুধু ভাল লোক বা হৃদয়বান লোক হ'লে চলবে না। কর্মকুশলতা নিতান্ত আবশ্যক। সস্তায় জিনিস তৈরি করতে হবে, মজুরির হার বাড়াতে হবে, বেকার সমস্যার সুসমাধান করতে হবে। এ তিনটি যিনি পারবেন, তিনিই কলকারখানার

পরিচালক হওয়ার যোগ্য। ফাঁকা কথায় লোকের বিশ্বাস আকর্ষণ করা যায় না, চাই ধনের উৎপাদন, চাই সমাজ সেবা।

ভাল জিনিস সস্তায় তৈরি করা অসম্ভবকে হাতের মুঠোয় আনার মত কঠিন। দাম কমাও, অথচ জিনিসটা ভাল কর, সঙ্গে সঙ্গে মজুরির হার বাড়াও। যন্ত্রের সুযোগ্য ও সুদক্ষ পরিচালনা ভিন্ন এ অসম্ভব ব্যাপার কখনো—কোন মতেই সম্ভব হয় না। সমাজের কল্যাণ বর্ধনের জন্যে উন্নততর যন্ত্রের আবশ্যক।

অনেকে বলেন শ্রমিকগণ কলকারখানার লভ্যাংশের সবটাই পাবার অধিকারী। কথাটা উদার অন্তকরণপ্রসূত বটে—কিন্তু নির্বোধের মত কথা। মানুষ যেমন যন্ত্রের চেয়ে বড়, তেমনি কারখানা একজন মানুষের চেয়ে বড়। কেন বড়, না কারখানা হ'ল শ্রমিকদের সংঘ বা সমাজ দ্বারা পরিচালিত। যে কারখানার শ্রমিকগণ যন্ত্রোৎপালিত সকল ঐশ্বর্য ভোগ করতে পায়—তার অবস্থা অমিতব্যয়ী ব্যক্তির মত। সে আজ যা পায়, সব খরচ করে ফেলে, পরের দিন ক্ষুধায় কষ্ট পায়।

কৃষকের নিকট যেমন জমি, কলকারখানার মালিকের কাছে তেমনি যন্ত্র। কৃষক জমি থেকে কতটা ফসল পাবে, তা নির্ভর করে সে জমিতে কি দিতে পারে তার ওপর। তেমনি কলকারখানার মালিক কলকারখানার পেছনে কত ব্যয় করতে পারে, তার ওপর জনসাধারণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করচে। কৃষিকার্য সম্বন্ধে লোকে এ সত্য উপলব্ধি করেচে বহুদিন, কারণ প্রাচীনকাল থেকে সে কৃষিকার্য করে আসচে। কিন্তু কলকারখানার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ সত্য তারা সম্প্রতি বুঝতে সুরু করেচে মাত্র।

উত্তরাধিকার সমস্যা

[টমাস বাটার জীবদ্দশাতে এ প্রশ্ন অনেকবার উত্থাপিত হয়েচে যে তাঁর সৃষ্ট বিশাল প্রতিষ্ঠানটি তাঁর অবর্তমানে চলবে কি না বা তাঁর উত্তরাধিকারী তিনি নির্বাচন করেচেন কিনা। ১৯৩১ সালে একটি সংবাদপত্র এ প্রশ্নটি সরাসরি জিজ্ঞাসা করাতে বাটা তার জবাব দেন। এ জবাবে তখন এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি বাটার সমাধিফলকে খোদিত নিম্নলিখিত বাক্যটির সত্যতা সপ্রমান করেচেঃ "এই ব্যক্তি তাঁর কাজকর্ম এমনভাবে সুব্যবস্থার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন যে তিনি যে কোন সময় সব কিছু চুকিয়ে চলে যেতে পারতেন"]

আমার ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার সমস্যার মীমাংসা আমি করেছিলাম ৩৬ বছর পূর্বে, যখন আমি আমার জুতো সেলাইয়ের দোকানে একজন সাহায্যকারী ভৃত্য নিযুক্ত করি। আমি কখনোই সাহায্য-কারী নিযুক্ত করতাম না, যদি আমি এমনভাবে কারখানার ব্যবস্থা করতাম যে আমি না হ'লে চলে না।

আমার কারখানায় এমন লোক নেই যে না থাকলে চলবে না। এমন লোকও আমরা চাই না যে চিরকাল মজুর থাকতে চায়। কয়েক বছর পূর্বে আমি একজন মজুরকে পদচ্যুত করি। সে এলিভেটরের সাহায্যে জুতোর বাণ্ডিল নিয়ে যেত না, নিজের পিঠে বোঝা বহন করত। আমি তাকে যখন একথা বলি, সে জবাব দিলে—সে সৎপথে থেকে চিরকাল খাটতে চায়, উন্নততর ব্যবস্থা করা ডিরেক্টারের কর্তব্য, তার নয়।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য রকম। আজ যে মজুর কাল সে ডিরেক্টার হতে পারে। নতুবা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয় না। এ ব্যবস্থা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে থাকা চাই। যে দিন আমরা এ সমস্যার সুসমাধান করতে সমর্থ হব, সেদিন আমাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে প্রসারিত করবার সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গেই হবে।

টমাস বাটার শেষ উইল

[নিম্নোধৃত কয়েকটি ছত্রে টমাস বাটার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও জনসেবায় নিয়োজিত তাঁর বিরাট জীবনের উচ্চ আদর্শ সুপরিস্ফুট হয়েছে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, জনসাধারণের ও সমাজের সেবাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। নিম্নলিখিত ছত্র কয়টিতে তাঁর জীবনের সে আদর্শ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে]

আমাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ এই যে, তুমি কখনো ভেব না এই ব্যবসায় তোমার একার, বা তোমার একার উপকারের জন্য এর সৃষ্টি। যারা এর প্রতিষ্ঠাতা, শুধু তাদেরই সচ্ছল জীবিকা নির্বাহের সুবিধা করে দেবার জন্যে এ প্রতিষ্ঠান নয়। এর উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে বলেই যখন দেখি আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা হৃদয়াবেগ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন করছে, তখন সেগুলিকে আমাদের সংযত করতে হয়।

একাধিকবার আমরা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য আত্মস্বার্থ বলি দিয়েছি এবং একাধিকবার আমাদের পরিবারের কোন না কোন লোককে তার মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু ধন উপার্জনের উদ্দেশে এ কাজ করা হয় নি।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সঙ্গে সারা জেলার কল্যাণ নির্ভর করছে—এ সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের উৎসাহ ও গর্বের বিষয় এই দাঁড়িয়েছে যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের প্রতিষ্ঠান দেশে নবজীবনের সঞ্চার করেছে—যে জীবন ছিল এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যে সচ্ছলতা ছিল অভাবনীয়। প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশের অধিবাসীর শিক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমাদের ইচ্ছা এই সুখ-সাচ্ছন্দ্যের অংশ আমরা আরও বেশি লোকের মধ্যে বিতরণ করবো—আমাদের ক্রেতাদের মধ্যে, আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে। যতদিন এই আদর্শ নিয়ে তুমি কাজ করবে, ততদিন দেশের ও দশের কল্যাণ হবে তোমার দ্বারা।

কিন্তু যে মুহূর্তে তোমরা নিজের স্বার্থ খুঁজতে চেষ্টা করবে, যে মুহূর্তে তোমরা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের সেবা করতে বিস্মৃত হবে—সেই মুহূর্তে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা ডেকে আনবে।

বাটা পরিবারের ইতিহাস

টমাস বাটার মৃত্যুর পরে সযত্ন অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয় যে বাটা বংশ জিলন্ সহরে গত তিনশত বৎসর অর্থাৎ দশপুরুষ ধরে পাদুকাশিল্পের কার্যে নিযুক্ত আছে।

এ বংশের আদিপুরুষ লুকাস্ জিলন্ সহরেব তিনমাইল দূববর্তী জেলেকোভিচ্ গ্রাম থেকে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে জিলনে আসেন এবং পিভোডভস্কি পরিবাবের পরিত্যক্ত ভদ্রাসন ক্রয় করেন। ব্রনোস্থ মোরেভিযা প্রদেশের ভূমিসংক্রান্ত দলিলে এই ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নোধৃত লিখন দৃষ্ট হয়ঃ—

'পিভোডভস্কির পুরাতন ও পরিত্যক্ত ভদ্রাসন লুকাস বাটা নামে জনৈক জুতা ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রীত হইল (১৬৬৭)।" লুকাস বাটিয়ু (বাটা পবিবারেব নামের এই বানান অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল) জেলেকোভিচ্ গ্রামের ভাক্লাভ্ বাটিয়ুর পুত্র, ঐ গ্রামে তাঁর ক্ষুদ্র আবাস বাটি ও কৃষিক্ষেত্র ছিল-বাটা পবিবার এই জমি পরে মোতিল্ পরিবারেব কাছে বিক্রয় করে। এখনও উক্ত জমি সেই বংশের অধিকারেই আছে—কৃষিক্ষেত্রেব নাম পর্যন্ত অপরিবর্তিত।

বাটা পরিবার

(ঐতিহাসিক গবেষণাব এ বংশের নিম্নলিখিত পবিচয় পাওযা যায়)

ভাক্লাভ্ বাটিয়ু	১৫৮০—১৬৬২	জেলেকোভিচ্	
লুকাস বাটিয়ু	১৬১০—১৬৮৩	জিলন্	মুচী
লুকাস বাটিয়ু	১৬৬০—১৭২১	"	"
মার্টিন বাটিযা	১৬৯১—১৭৬১	"	"
মার্টিন বাটিযা	১৭১৫—১৭৭৭	"	"
সাইমন বাটিযা	১৭৫৫—১৮৩৩	,	"
আন্তোনিন বাটিয়া	১৮০২—১৮৫০	"	"
আন্তোনিন বাটা	১৮৪৪—১৯০৫		পাদুকা নির্মাতা
টমাস বাটা (কাবখানার মালিক)	১৮৭৬—১৯৩২	"	"

জান বাটা—টমাস বাটার বৈমাত্রেয ভ্রাতা, জন্ম ১৮৯৬, জিলন্ সহবের জুতো ব্যবসায়ী।
টমাস বাটা (পুত্র), জন্ম—১৯১৪—পাদুকা নির্মাতা

